বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা

এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০১৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনায়
মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রেজি. নং- ৬৪/২০১১-১২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই, ২০১৫

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, এম.ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের নিমিত্ত উপস্থাপিত "বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করিয়াছে। আমি ইহার পা ুলিপিটি আদ্যোপান্ড় পাঠ করিয়াছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা ইহার অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপেণ্ঢামা লাভের কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতেছি।

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, নির্দেশক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপেণ্ঢামা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন কিংবা প্রকাশ করিনি।

(মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন)
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম কর্ণনাময় অসীম দয়ালু আলণ্ঢাহ তা'আলার অপার কৃপায় **"বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করে উপস্থাপন করতে পেরে তাঁর দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

মানব জাতির মহান শিক্ষক, মানবতার মুক্তির দূত, নবীকূল শিরোমনি, সর্বশেষ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা (সা.)-এর প্রতি হাজার দুরূদ ও সালাম যিনি মানবজাতির জন্য দ্বীন ও শারী'আত নিয়ে আগমণ করেছেন। আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে আনীত বিধিবিধান দিয়ে মানবজাতীর সকল সমস্যার সমাধান ও মানবতার কল্যাণের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ম (শারী'আ) বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি। শত কর্মব্যস্ড়তা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এ ত্যাগের প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তাঁর নিরন্ড্র উৎসাহ-উদ্দীপনা, অকৃপণ অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। তার মূল্যবান পরামর্শ ও সুন্দর দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর যে কোন ভুলত্রুটি তিনি পরম স্নেহে একান্ড় সান্নিধ্যে ও আন্ড়রিকতার সাথে সংশোধন করে দিয়েছেন। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় সুবিন্যস্ড় করণ এবং এর পরিধি, অবয়ব, ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি ও এর প্রতিটি দিক অলংকৃতকরণ সম্ভব হয়েছে তাঁর ক্লান্ড়হীন শ্রম ও আন্ড়রিক সহযোগিতার জন্য। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। পরম কর্ণনাময়ের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত কামনা করছি।

আজ এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্নেহময়ী জননী আম্মা খায়র্ন নেছাকে যিনি শৈশব থেকে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হয়ে এখনো আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। সার্টিফিকেট বিদ্যার বাহিরে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, উর্দু ও ফারসি সাহিত্যে তার অসাধারণ পান্ডিত্য আমার শিক্ষা জীবনের পথে বড় একটি প্রেরণা। আজো তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দু'চারটি জ্ঞানের আলোচনা করতে গেলে হৃদয় অজানা ভয়ে দুর্ দুর্ করে কাঁপতে থাকে। আমার পিতার দীর্ঘ অসুস্থতা জীবনে তিনি সংসারের কান্ডারী হয়ে এখনো আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছেন। সন্ড়ানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তার নিরন্ড্র প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁর অপরিসীম ত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবন নদীর বিক্ষুদ্ধ তরঙ্গমালা অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে পেরেছি। পরম কর্ণনাময়ের কাছে আমি তাঁর সুস্থ্য জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমায় পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা এবি এম আছাদ উলণ্ঢাহ (সহ অধ্যাপক, অব)-কে যিনি জীবনের এক দীর্ঘ সময় ইলমে দীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে আজ এক যুগ অবধি বাকর্দ্ধ ও বিকলঙ্গ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। নিজের চিন্ড্র না করে যিনি শত সহস্র কষ্টে আমার লেখাপড়ার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছেন। তার সেসব

Dhaka University Institutional Repository

দিনগুলোর স্মৃতি আজ বার বার আমাকে পীড়া দেয়। মহান প্রভূ রাব্বুল আলামিনের দরবারে তাঁর সুস্থতা ও নেক হায়াত কামনা করছি।

আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমার মেঝভাই মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছারকে। আরো ধন্যবাদ জানাই ছোট ভাই তারেক, জাবের, মুয়াজ, তামিম ও নাইমকে। বড় বোন ছায়েমা ও দূরপ্রবাস জীবনের ছোট বোন ফাহিমাকেও ধন্যবাদ জানাই। তাদের সাথে তাদের জীবনসঙ্গী জনাব এরশাদ উলণ্ঢাহ চৌধুরী ও জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াছ ভাইদ্বয়কেও ধন্যবাদ। বিভিন্নভাবে তারা আমাকে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন। আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাও. নূর মোহাম্মদ যিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে উক্ত গবেষণাকর্মে বুদ্ধিমত্তা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁর প্রতি রইল আমার আন্ড়রিক মোবারকবাদ।

শত কষ্ট, পরিশ্রম ও ক্লান্ড়িহীন সংসার জীবনে যে আমাকে এ গবেষণা কর্মে সর্বক্ষণ ছায়ারমত থেকে প্রেরণা, সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছে সেই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীণী শাহিদা আক্তারকে এ আনন্দঘন মুহূর্তে জানাই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। মহান আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দু'আ করি তিনি যেন তাকে এ নশ্বর দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে কল্যাণ ও মহিমা দান করেন। গবেষণাকালীন মুহূর্তগুলোতে স্নেহ বঞ্চিত অতি আদরের মেয়ে রাইসাতুল জান্নাত নুহার জন্য রইল দু'আ ও একরাশ ভালোবাসা।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যেসব গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি সেই সব বিদগ্ধ লেখদের প্রতি জানাই আন্ড়রিক মোবারকবাদ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণার্থে আমি যথাস্থানে 'পাদটীকা' 'উদ্ধৃতিতে' সেই সব লেখকদের নাম, তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উলেণ্ঢখ করেছি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যারা আমাকে এ গবেষণা কর্মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর মত অতি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ড়েশন লাইব্রেরীর মত সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পেরে আমি এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ড়েশন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে যারা গবেষণার পরিবেশ বান্ধব এমন একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় যেসব প্রতিষ্ঠান ও শুভাকাঙ্খী আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা।

কম্পিউটারে টাইপ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য ফকিরাপুলস্থ মাল্টি লিংককে কর্মরত জনাব বেলায়েত ভাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পুরো গবেষণা কর্মে সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই গ্রাজুয়েট পাবলিকেশন্স-এর নির্বাহি সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন ভাইকে।

তারিখ, ঢাকা **(মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন)**

১১ জুলাই, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

أ - অ	ط - ত	---ِ---ি
ب - ব	ظ - য	---ُ--ু
ت - ত	ع - ‘	يى - ী
ث - ছ/স	غ - গ	و - ‘ঊ/ূ
ج - জ	ف - ফ	
ح - হ	ق - ক/ক্ব	
خ - খ	ك - ক	
د - দ	ل - ল	
ذ - জ	م - ম	
ر - র	ن - ন	
ز - ঝ	و - ওয়া / অ	
س - স	هـ - হ	
ش - শ	ء - ’	
ص - স	ي - য়	
ض - দ/য	----َ---া	

বি. দ্র.

→ উলিণ্ঢখিত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কোন কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উলিণ্ঢখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

→ যে সব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলাভাষার অংশবিশেষ পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম সম্ভব অনুযায়ী রক্ষা করা হয়েছে।’

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

(আ.)	: আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম
ইমাম বুখারী	: আবু আবদুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী
ইমাম আহমদ	: ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম মুসলিম	: ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	: আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	: আবূ দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী
ইব্ন মাজাহ	: আবু আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ
ইবনে কাসীর	: আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর
ইব্ন মানযূর	: জামালউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানযূর আল-আফ্রিকী
ইব্ন তাইমিয়াহ	: তকী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাইমিয়াহ
ইমাম আবু হানিফা	: আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত ইবন যুতা ইবনে মারযুবান
ইমাম শাফি'ঈ	: মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ
ইমাম আহমাদ	: ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল
ইমাম বায়হাকী	: ইমাম আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী
ইফাবা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	: মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ফারাহ
খ্রি.	: খ্রিস্টাব্দ
ড.	: ডক্টর
তাবি	: তারিখ বিহীন
পৃ.	: পৃষ্ঠা
প্রাগুক্ত	: পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বিআইআইটি	: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
মুফতী শাফী	: হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.)
(রা.)	: রাদিআলণ্ঢাহু তা'আলা 'আনহু/আনহা
(রহ.)	: রাহমাতুলণ্ঢাহি 'আলাইহি
(সা.)	: সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম
হি.	: হিজরী

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয় বিন্যাস	পৃষ্ঠা নং-
ভূমিকা	**১**
প্রথম অধ্যায় : শারী'আ আইনের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৪
১.১ শারী'আ আইনের পরিচয়	৪
শারী'আ আইনে বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা	৭
আইন	৮
ইসলামী আইনের পরিচয়	৯
ইসলামী আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১০
কানুন	১১
ফিক্‌হ	১৩
কুর'আনে ফিকহের অর্থ	১৩
ফিকহশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা	১৫
১.২ শারী'আ আইনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	**১৮**
১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে শারী'আ আইন	১৮
২. খিলাফত যুগে শারী'আ আইন	১৯
৩. পরবর্তী খিলাফত ব্যবস্থায় শারী'আ আইন	২০
৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্যক্তিগত শারী'আ আইনের প্রয়োগ	২৩
উপমহাদেশে শারী'আ আইন	**২৪**
১. সালতানাত যুগে শারী'আ আইন	২৪
২. মোঘল আমলে শারী'আ আইন	২৫
৩. বাংলাদেশে শারী'আ আইন	২৬
১.৩ শারী'আ আইনের উৎস	**২৭**
১. আল কুর'আন	**২৯**
আল কুর'আন পরিচিতি	২৯

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আনের বিভিন্ন আইন ৩৪
ঐতিহাসিক মানদন্ডে কুর'আনের আইন ৩৮
২. সুন্নাহ ৪০
সুন্নাহ পরিচিতি ৪০
শারী'আতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ ৪৩
সুন্নাহ্য় আইনের পরিধি ৪৭
সুন্নাহর বিচার কার্যক্রমের শ্রেণি বিন্যাস ৪৭
সুন্নাহর বিচার পক্রিয়া ৪৯
৩. ইজমা ৫০
৪. কিয়াস ৫৫
৫. ইসতিহসান ৫৮
৬. ইসতিদলাল ৬১
৭. মুসলিহাত ৬২
৮. উরফ বা সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজ ৬৩
৯. সাদ্দুয যারায়ে ৬৫
১০. দেশজ আইন ৬৮
১১. মাসালিহে মুরসালা ৬৯
১২. আল ইস্ড়িসহাব ৭০
১৩. শার'উ মান কাবলানা (পূর্ববর্তী নবীদের শারী'আত) ৭১
১.৪ বিভিন্ন মাযহাবে আইনের উৎস নির্ধারণে ভিন্নতা ৭৫
১.৫ ইসলামী আইনের উৎসসংখ্যা নির্ধারণে ইমামদের মতানৈক্য নিরসন ৭৭
১.৬ শারী'আ আইন প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ ৭৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : শারী'আ আইনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ৭৮
২.১ শারী'আ আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৭৮
১. ইসলামী শারী'আত আলণ্ডাহ প্রদত্ত ৭৮
২. ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৩. ব্যক্তি ও সমষ্টির সমভাবে মূল্যায়ন ৮১

৪. স্থায়িত্ব ও কোমলতার সমন্বয় ৮১

৫. নৈতিকতার লালন ক্ষেত্র ৮২

৬. ইসলামী শারী'আত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ৮৫

৭. কঠিন ও কঠোরতার পরিহার ৮৫

৮. মানব কল্যাণ শারী'আতের অন্যতম উৎস ৮৬

৯. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ৮৭

১০. বিচার-বুদ্ধি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে এগিয়ে চলা ৮৭

২.২ শারী'আ আইনের জনকল্যাণমূলক মূলনীতি ৯১

২.৩ মানব রচিত আইনের উপর শারী'আ আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ৯৩

তৃতীয় অধ্যায় : নতুন সৃষ্ট সমস্যায় ইজতিহাদের মূল্যায়ন ৯৫

১. ইজতিহাদের সংজ্ঞা ৯৫

২. ইজতিহাদের প্রকারভেদ ৯৬

৩. ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা ১০১

৪. ইজতিহাদের শর্তাবলি ১০৫

৫. ইজতিহাদি মতের সাথে দ্বিমত করার অধিকার ১১০

৬. ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করে কিভাবে? ১১১

৭. ইজতিহাদের গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১১২

৮. ইজতিহাদ অপরিহার্য ১১৫

৯. সমসাময়িক বিষয়ে ইজতিহাদের আবশ্যকতা ১১৬

১০. সামষ্টিক ইজতিহাদের গুর"ত্ব ১১৭

১১. অমুসলিম দেশে শারী'আ পালনে মুসলমানদের সমস্যা ও ইজতিহাদ ১১৮

১২. যেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ আবশ্যক ১১৯

১৩. ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও কার্যাবলি ১২০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : শারী'আ আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা, কারণ অনুসন্ধান ও সমাধান ১২২

৪.১ শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ১২২

ক. স্বেচ্ছাচিন্তার যুগ ১২২

খ. উপনিবেশিক শক্তির প্রভাব ১২৩

গ. রাজনৈতিক অসাধুতা ১২৩

ঘ. শারী'আ আইনকে ধর্মীয় আইন মনে করার প্রবণতা ১২৪

ঙ. ইউরোপীয় আইনের প্রভাব ১২৫

চ. তাকলীদের অনুসরণ ১২৫

ছ. প্রগতিবাদের প্রোপাগান্ডা ১২৬

জ. অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ ১২৭

বাংলাদেশে শারী'আ আইন বাস্ড়বায়নের পথে মৌলিক সমস্যা ১২৭

ক. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্র"টি ১২৭

খ. ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য ১২৮

গ. শারী'আ আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব ১২৮

ঘ. শারী'আ আইনের কার্যকারিতা উপস্থাপনে ব্যর্থতা ১২৯

ঙ. দেশি-বিদেশি মিডিয়ার অপপ্রচার ১২৯

৪.২ শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় ১২৯

ক. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন ১২৯

খ. ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা ১৩০

গ. ইজতিহাদের পুনর"জ্জীবিত করা ১৩০

ঘ. জনমত তৈরি ১৩২

ঙ. শিক্ষাব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন ১৩২

চ. অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্য যাচাই ১৩৪
৫.১ বাংলাদেশে শারী'আ আইনের বিবর্তন ১৩৪
ইসলামী দণ্ডবিধির পরিবর্তন ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতিতে সংস্কার ১৩৪
কোম্পানি আমলে বিচার প্রক্রিয়া ১৩৭
লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক ইসলামী দণ্ডবিধিতে সংস্কার ১৩৮
ব্রিটিশ শাসনামলে ইসলামী বিচার ১৩৯
ব্রিটিশ কর্তৃক ইসলামী শারী'আ আইন বিধিবদ্ধকরণ ১৩৯
ইঙ্গ মুসলিম আইন ১৪১
পাকিস্তানি শাসনামলে শারী'আ আইনে বিচার ১৪১
স্বাধীন বাংলাদেশে শারী'আ আইন ১৪৩
৫.২ বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম ও শারী'আ আইনের তুলনামূলক আলোচনা ১৪৩
৫.২.১ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ ১৪৪
৫.২.২ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শারী'আত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ ১৪৮
৫.২.৩ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ ১৫০
৫.২.৪ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ১৫৪
৪ নং ধারার পর্যালোচনা ১৫৬
৬ নং ধারার পর্যালোচনা ১৬২
৭ নং ধারার পর্যালোচনা ১৬৮
৮ নং ধারার পর্যালোচনা ১৭৪
৯ নং ধারার পর্যালোচনা ১৭৮
১০ নং ধারার পর্যালোচনা ১৮৪
১২ নং ধারার পর্যালোচনা ১৮৭
৫.২.৫ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪ ১৮৯
মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ১৯৭৫ ১৯৩
মুসলিম বিবাহ ও তালাক [নিবন্ধন] বিধিমালা, ২০০৯ ১৯৪
পর্যালোচনা ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৬ অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ ১৯৬
পর্যালোচনা ১৯৬
৫.২.৭ হিবা বা দান (সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র আইন ১৮৮২) ১৯৭
পর্যলোচনা ১৯৯
৯. ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ ২০০
পর্যালোচনা ২০৩
৫.৩ শারী'আ আইন বাস্ড়বায়নের সম্ভাব্য যাচাই ২০৪
১. আন্ড়র্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য ২০৪
২. ইসলামী শারী'আর বিষয়ে পাশ্চাত্যের ন্যায়পরায়ণ চিন্ড়াবিদ ও গবেষকদের মুল্যায়ন ২০৫
৩. আন্ড়র্জাতিক আইন সম্মেলনের সাক্ষ্য ২০৬
৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব ও শারী'আ আইন ২০৮
৫. বিশ্বব্যাপী শারী'আ আইনের পুণর্জাগরণ ২০৮
৬. ব্রিটেনে শারী'আ আইন ২১০
৭. ব্রিটেনে শারী'আ আইনের অগ্রগতি ২১১
৮. ব্রিটেনে শারী'আহ আদালতের প্রতি অমুসলিমদের আগ্রহ ২১১
উপসংহার ২১২
গ্রন্থপঞ্জী ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

Abstract (সারসংক্ষেপ)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। শারী'আ আইন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল কুরআন ও সুন্নাহ শরী'আ আইনের প্রধান ও মৌল উৎস। ইসলাম গতানুগতিক কোন ধর্মের নাম নয়। এতে রয়েছে মানব জীবনের শারী'আত বিধি-বিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পার্থিব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের রূপ রেখা ও মানব জাতীর ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ইসলামে সুস্পষ্টভাবে অংকিত হয়েছে। শারী'আ আইন হলো ইসলামী আইনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। আধুনিক পরিভাষায় শারী'আকে আইন নামে অভিহিত করা হয়। বিচার ব্যবস্থায় আইন এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হয়ে থাকে। মানুষের সামাজিক জীবনের ন্যায় আইন ও বিচার সুপ্রাচীন। আইনের সংজ্ঞায় বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান বলেন আইন হচ্ছে, "মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয় সেকালের ধারণানুযায়ী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সেই সময়কার সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা।"

মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের কারো কারো কাছে আসমানী কিতাব দিয়ে শারী'আত নাযিল করেছেন। সর্বশেষ নবী-রাসূল হিসেবে ৬১০ খ্রি. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমে সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শারী'আ আইনের উদ্ভব ঘটে। ৬৩২ খ্রি. মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াত জীবনে শারী'আ পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে কুর'আন ও হাদীস দ্বারা সমাধান করতেন নতুবা ইজতিহাদ দ্বারা সমাধান করতেন। যুগ প্রেক্ষাপটে ইসলামের সার্বজনীনতার বিবেচনায় নতুন সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদের ব্যবহার আজও চালু আছে। এভাবে ইসলামী শারী'আ যুগ সমস্যা মোকাবিলায় সমর্থ।

ইসলামী শারী'আ একটি পূর্ণাঙ্গ (Complete) ও চিরন্তন (Universal) আইন ব্যবস্থা। যেহেতু এ আইন মানব বিবেকলব্ধ নয় তাই এটি চিরন্তন, যেহেতু এটি পরিবর্তনশীল নয়, তাই এটি প্রগতিশীল; যেহেতু এটি কালের ঊর্ধ্বে তাই এটি কালজয়ী, যেহেতু এটি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ প্রদত্ত, তাই এটি পূর্ণাঙ্গ; যেহেতু এটি ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত সেহেতু এটি বিজ্ঞানসম্মত; যেহেতু এটি ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সেহেতু এটি সার্বজনীন; যেহেতু এটি বিশ্বমানবতার জন্য নিবেদিত সেহেতু এটি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, ব্যক্তি, সম্প্রদায়, দেশ ও জাতির সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে।

বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ হলেও এর জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। ২০১০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী শতকরা ৯০.৪ জন মুসলিম। ইসলাম সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম। শারী'আ আইন প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। সে হিসেবে শারী'আ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় কল্যাণমুখী বিচার ব্যবস্থা হিসেবে পুনরায় চালু হতে পারে। কারণ এটি ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ গ্যারান্টি। বাংলায় প্রায় আটশত বছরের মুসলিম শাসনব্যবস্থা তারই সাক্ষ্য বহন করে। আবার প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা ঠিক রেখেও সমান্তরালভাবে শারী'আ বিচার ব্যবস্থা চালু হতে পারে। সর্বোপরি, ইসলামী শারী'আ সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সত্য, ন্যায়, মানবিকতা, শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সর্বাঙ্গীন শৃংখলা আনয়নে সমর্থ। তাই এদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগই হবে সর্বাধিক কল্যাণধর্মী ও যুগপোযোগী।

অত্র **বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা, ৫টি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়টি **শারী'আ আইনের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ** শিরোনামে আলোচিত। এ অধ্যায়ে শারী'আ আইনের পরিচয়, শারী'আ আইনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, শারী'আ আইনের উৎস, বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাবে আইনের উৎস নির্ধারণে ভিন্নতা, ইসলামী আইনের উৎসসংখ্যা নির্ধারণে ইমামদের মতানৈক্য নিরসন, শারী'আ আইন প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়টি **শারী'আ আইনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব** শিরোনামে আলোচিত। এ অধ্যায়ে শারী'আ আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, শারী'আ আইনের জনকল্যাণমূলক মূলনীতি, মানব রচিত আইনের উপর শারী'আ আইনের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়টি **নতুন সৃষ্ট সমস্যায় ইজতিহাদের মূল্যায়ন** শিরোনামে আলোচিত। এ অধ্যায়ে ইজতিহাদের পরিচয়, প্রকারভেদ, ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা, ইজতিহাদের শর্তাবলি, ইজতিহাদি মতের সাথে দ্বিমত করার অধিকার, ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করে কিভাবে?, ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইজতিহাদ অপরিহার্য, সমসাময়িক বিষয়ে ইজতিহাদের আবশ্যকতা, সামষ্টিক ইজতিহাদের গুরুত্ব, অমুসলিম দেশে শারী'আ পালনে মুসলমানদের সমস্যা ও ইজতিহাদ, যেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ আবশ্যক, ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও কার্যাবলি বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়টি **শারী'আ আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা, কারণ অনুসন্ধান ও সমাধান** শিরোনামে আলোচিত। এ অধ্যায়ে 'শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়' এ দুটি অনুচ্ছেদে শারী'আ আইনের সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়টি থিসিসের মূল বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। **বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্য যাচাই** শিরোনামে আলোচিত। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে শারী'আ আইনের বিবর্তন, বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম ও শারী'আ আইনের তুলনামূলক আলোচনা, বিশেষত দেশে প্রচলিত ৯টি শারী'আ আইনের পর্যালোচনায় ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২ নং আইন শারী'আ আইনের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে শারী'আ আইনের সম্ভাব্য যাচাই ও যথার্থতা প্রমাণে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় শারী'আ আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলামিক জীবনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হলো শারী'আ। আধুনিক পরিভাষায় শারী'আকে আইন নামে অভিহিত করা হয়। বিচার ব্যবস্থায় আইন এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হয়ে থাকে। মানুষের সামাজিক জীবনের ন্যায় আইন ও বিচার সুপ্রাচীন। আইনের সংজ্ঞায় বলা হয়, আইন হচ্ছে মানুষের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি সামাজিক পক্রিয়া। এ এস ডায়ামন্ড-এর মতে, "একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি নির্যাস হচ্ছে আইন।" সি কে এ্যালেনের মতে, "আইন জাতীয় পদ্যের মতো বিকশিত হয় ও ছড়িয়ে পড়ে; ধর্মীয় নৈতিকতা এবং ছন্দোবদ্ধ উপাদানসমূহ আইনের অত্যাবশ্যক শক্তিকে সহায়তা করে।" আইন মূলত বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞান তা-ই যা যুক্তিসঙ্গত। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই আইন মানুষের জন্য অপরিহার্য ও বিধিবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীগুলো তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আর ধর্মগ্রন্থগুলো ছিল আইন, নীতি-নৈতিকতা ও উপদেশে সমৃদ্ধ। সুতরাং বর্তমান আইন ও বিচার ব্যবস্থায় শারী'আর প্রয়োগ নতুন অভিযোজন নয়।

৬১০ সালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমে শারী'আ আইনের উদ্ভব ঘটে। ৬৩২ সালে মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াত জীবনে শারী'আ পূর্ণতা লাভ করে। সে হিসেবে শারী'আ আইনের মূল উৎস আল কুর'আন। মহানবি (সা.)-এর অগণিত হাদীস শারী'আর দ্বিতীয় প্রধান উৎস। যা সুন্নাহ নামে পরিচিত। তাই শারী'আ আইন বিতর্ক, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের ঊর্ধ্বে।

শারী'আত প্রণেতা মহান আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের মাধ্যমে মানুষের জীবন চলার সকল আইন-কানূনের বর্ণনা দিয়েছেন, বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে এ আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সকল বিধিবিধান বাস্তবে প্রয়োগ করে পৃথিবীবাসীর কাছে মডেল উপস্থাপন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হলে তিনি কুর'আন নাযিলের অপেক্ষা করতেন অথবা

Dhaka University Institutional Repository

নিজে তার সমাধান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে কুর'আন ও হাদীস দ্বারা সমাধান করতেন নতুবা ইজতিহাদ দ্বারা সমাধান করতেন। পরবর্তীতে দিকে-দিকে ইসলামের বিস্তৃতি, নানা-মত ও নানা-দলের সাথে ইসলামের সংমিশ্রণে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। সৃষ্টি হলো– খারেজী, শী'আ, মুতাযিলার ন্যায় ইত্যাদি রাজনৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। এ সকল নানামুখি বিভাজনে ইসলামের বিধিবিধান তথা মাসআলা নিরূপণে কুর'আন-সুন্নাহর পাশাপশি অন্যান্য উৎস গ্রহণ ও মাসআলা নির্ধারণের মূলনীতি নিয়ে মতপার্থক্য তৈরী হয়। সৃষ্টি হয় ইসলামী শারী'আর চারটি মাযহাব। অবশেষে এ চার মাযহাবে সকলের ঐকমত্য প্রকাশ। এভাবে এক ও অবিভাজ্য ইসলাম অক্ষত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলে আসে তাকলীদের যুগ। তাকলীদের যুগ আসলেও ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। বর্তমান যুগ প্রেক্ষাপটে ইসলামের সার্বজনীনতার বিবেচনায় নতুন সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদে ব্যবহার আজও বর্তমান। এভাবে ইসলামী শারী'আ যুগ সমস্যা মোকাবিলায় সমর্থ।

ইসলামী শারী'আ একটি পূর্ণাঙ্গ (Complete) ও চিরন্তন (Universal) আইন ব্যবস্থা। যেহেতু এ আইন মানব বিবেকলব্ধ নয় তাই এটি চিরন্তন, যেহেতু এটি পরিবর্তনশীল নয়, তাই এটি প্রগতিশীল; যেহেতু এটি কালের ঊর্ধ্বে তাই এটি কালজয়ী, যেহেতু এটি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ প্রদত্ত, তাই এটি পূর্ণাঙ্গ; যেহেতু এটি ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত সেহেতু এটি বিজ্ঞানসম্মত; যেহেতু এটি ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সেহেতু এটি সার্বজনীন; যেহেতু এটি বিশ্বমানবতার জন্য নিবেদিত সেহেতু এটি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, ব্যক্তি, সম্প্রদায়, দেশ ও জাতির সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে।

বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ হলেও এর জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। ২০১০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী শতকরা ৯০.৪ জন মানুষ মুসলিম। ইসলাম সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১২০৩খ্রি./৬০০ হি. বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইতোপূর্বে এ অঞ্চলে মুসলিম আরব ব্যবসায়ী, ওলী ও সুফীসাধকগণ ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রি. পলাশী প্রান্তরে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের পতনের পর থেকে ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম ও তৎপরবর্তিতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এক যুগান্তকারি ঘটনা। ব্রিটিশ আমলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ খ্রি. থেকে ১৭৯৩ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে সংশোধনীতে আনার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে শারী'আ আইনে বিচার করা হতো। তারপর থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত বিচারকার্যে শারী'আ আইন কম-বেশি বিদ্যমান ছিল। এভাবে কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ইসলামের ফৌজধারি দণ্ডবিধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সর্বশেষ আইয়ুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে শারী'আ আইনে ব্যাপক সংস্কার আনায়ন করেন। ইসলামের দেওয়ানি ও পারিবারিক আইনগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে সংশোধিত আকারে বিদ্যমান রয়েছে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৮নং আইন ও পূর্বে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আইন সংশোধন হওয়া অনেকটাই জরুরি। কারণ এ আইনগুলোকে ব্যক্তিগত শারী'আ আইন বলা হলেও তা মূলত শারী'আ আইন নয়। শারী'আ আইনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ফৌজদারি দণ্ডবিধির কোনো প্রয়োগ বর্তমানে বাংলাদেশে চালু নেই।

বাংলাদেশের প্রচলিত বিচারব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রেই জনকল্যাণমুখী নয়; তাই এক্ষেত্রে শারী'আ আইন বিকল্প বিচারব্যবস্থা হিসেবে পুনরায় চালু হতে পারে। শারী'আ আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাংলাদেশের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, একথা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলা চলে। বাংলায় প্রায় আটশত বছরের মুসলিম শাসনব্যবস্থা তারই সাক্ষ্য বহন করে। আবার প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা ঠিক রেখেও সমান্তরালভাবে শারী'আ বিচারব্যবস্থা চালু হতে পারে। নব্বই শতাংশের মুসলিম দেশে সাংবিধানিকভাবে শারী'আ আইনে ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারব্যবস্থা চালু করা এখন সময়ের দাবি।

সর্বোপরি, ইসলামী শারী'আ সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সত্য, ন্যায়, মানবিকতা, শান্তি ও সর্বাঙ্গিন শৃংখলা আনয়নে সমর্থ। তাই বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় শারী'আ আইনের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ এখন সময়ের দাবী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শারী'আ আইনের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১.১ শারী'আ আইনের পরিচয়

আভিধানিক দৃষ্টিকোণে শারী'আত শব্দটি একটি আরবী (الشريعة) পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ– জলাশয় কিংবা কূপে যাবার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ বা সেই পানি, যাকে কেন্দ্র করে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং তা পান করে, আইনানুগতা, বৈধতা, আইনসম্মত ইত্যাদি।[১]

ইমাম রাগিব আল ইস্পাহানী বলেন, শারী'আতকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে শারী'আত গ্রহণ করবে সে বিশুদ্ধ পানির ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়।[২]

আল কুর'আনের সূরা আল জাসিয়ার ১৮ নং আয়াত, সূরা আশ শূরার ১৩ ও ২১ নং আয়াতদ্বয়ে এবং সূরা আল মায়িদাহ এর ৪৮ নং আয়াতে শারী'আ/শারী'আত শব্দের প্রয়োগ এসেছে।

(ক) পারিভাষায়, শারী'আত বলতে বুঝায় ইসলামের আইন-কানুন।[৩]

(খ) ইমাম কাতাদাহ (রহ.) বলেন, "শারী'আত হচ্ছে আদেশ-নিষেধ এবং হুদুদ (শাস্তি) ও ফরজসংক্রান্ত বিধান। কারণ শারী'আত একটি পথ, যা সত্যের দিকে চলে।"[৪]

(গ) ইমাম শাতিবি (রহ.) বলেন, "ইসলামী শারী'আহ্ হচ্ছে সেই বিধান, যা দায়িত্বশীল মানুষের কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে একটা সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে।"[৫]

---

১. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, *আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : দারুল হিকমা বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ৪৮৪।

২. আবুল কাসেম হুসাইন বিন মুহাম্মদ মা'রুফ বির রাগেব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুর'আন,* (দামেশক : দারুল কালাম, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৫০।

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), খ. ২, পৃ. ৪০৯।

৪. ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম, *ইসলামী শরীয়তের তাৎপর্য ও উৎস* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫), পৃ. ১১।

৫. ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি* (ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম বলেন, "ইসলামী শারী'আহ্ হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্গণের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ওপর তা অপরিহার্য করেছেন।"[৬]

(ঙ) পরিভাষায় শারী'আতের সংজ্ঞা প্রদানে মওলানা আবদুর রহীম বলেন :

الطريقة المستقيمة التى يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا-

"এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারে।"[৭]

(চ) ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধিবিধান জারি করেছেন তাকে শারী'আত বলা হয়। সে বিধান কুর'আন অথবা মহানবী (সা.)-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।"[৮]

(ছ) মান্না-আল-কাত্তান বলেন :

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات ونظم الحياة فى شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم فى الدنيا والاخرة- ـ

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের প্রভুর ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধান নির্ধারণ করেছেন তাই শারী'আত।"[৯]

---

৬. ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, *আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ : আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, ১৪১৫ হি.), পৃ. ১৯-২১।

৭. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৯।

৮. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ* (আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ ইং), পৃ. ৩৯।

৯. মান্না বিন খলীল আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী* (দামেশক : মাকতাবাতু ওহবিয়্যাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) শারী'আত বা ইসলামী শারী'আত বলতে ঐ সকল বিধিবিধানকে বুঝায় যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যবান হওয়ার লক্ষ্যে তাতে ঈমান আনয়ন করে এবং তদনুযায়ী 'আমল করে।[১০]

(ঝ) কখনো কখনো শারী'আত দ্বারা দ্বীনকে বুঝায়। তখন তার অর্থ দাঁড়ায় মানবতাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) আনীত জীবন বিধান, যাতে তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস, 'ইবাদাত ও মু'আমালাতসংক্রান্ত সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে।[১১]

(ঞ) কারো কারো মতে– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সকল আদেশ-নিষেধ প্রবর্তন করেছেন, খুলাফায়ে রাশেদীন যা প্রচলন করেছেন এবং মুসলিম 'আলিম ও মুজতাহিদগণ যা কিছু ইজতাহিদ করেছেন ও যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা-ই ইসলামী শারী'আত।[১২]

(ট) শায়খ মাহমুদ শালতুতের ভাষায় ইসলামী শারী'আত বলতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রবর্তিত ঐ সকল বিধিবিধান ও তার মূলনীতিসমূহকে বুঝায় যাতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের সম্পর্ক, মুসলিম ভাইয়ের সাথে তার সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের সাথে তার সম্পর্ক এবং জীবন ও জগতের সাথে তার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।[১৩]

সর্বোপরি শারী'আত বলতে মহান আল্লাহ ও রাসূল (সা.) প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থাকে বুঝায়। আর এ শারী'আত হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার কল্যাণের জন্য আকীদা, ইবাদাত, মু'আমালাত, হুদুদ, কিসাসসহ মানবজীবনের সকল বিষয়ের বর্ণনাসম্বলিত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

---

১০. মুহাম্মাদ রশীদ রেদা, *তাফসীর‍ুল মানার* (বৈর‍ুত : দার‍ুল মা'রিফা, তাবি), খ. ৬, পৃ. ৪১৪।

১১. মুহাম্মাদ ফখর‍ুদ্দীন রাযী, *আত-তাফসীর আল কাবীর* (তেহরান : দার‍ুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি), খ. ৭, পৃ. ৩৩৩।

১২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন* (বৈরূত : দার‍ু ইহয়িয়ায়িত্ তুরাছ আল-আরবী, তাবি), খ. ১৬, পৃ. ১৬৩।

১৩. মাহমুদ শালতুত, *আত-তাফসীর আল ওয়াদেহ্* (মিশর : মাতবা'আতুল ইন্ড়িকলাল আল-কুবরা, তাবি), খ. ৪, পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

শারী'আ আইনে বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

শারী'আ আইন আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদত্ত বিধায় এ আইন অনুযায়ী সকল বিচার ফয়সালা করা বিশ্ববাসীর উপর কর্তব্য। বিশেষত মুসলিম জাতি ও তাদের দেশগুলোর উপর এ আইন বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

আল কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَنْ اَقِيمُوا الدِّينَ -

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর।"[১৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

"আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা নারী সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার রাখে না।"[১৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

"কিন্তু না! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।"[১৬]

---

১৪. আল কুর'আন, ৪২ : ১৩।

১৫. আল কুর'আন, ৩৩ : ৩৬।

১৬. আল কুর'আন, ৪ : ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বিধান তথা শারী'আ আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা না করার পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফির, তারা জালিম, তারা ফাসিক।"[১৭]

উল্লেখ্য যে, শারী'আ আইন ও ইসলামী আইন এক ও অভিন্ন। শুধু শব্দগত পার্থক্য।

এছাড়াও শারী'আহ বুঝাতে আইন, কানূন ও ফিক্হ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

আইন

আইন শব্দটি মূলতঃ ফারসী ভাষার শব্দ। আব্বাসীয় যুগে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটি কানুন, প্রথা, নিয়ম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতো। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইবনুল মুকাফ্ফা কর্তৃক সংকলিত পাহলবী হতে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থসমূহের তালিকায় 'আঈননামাহ' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] আইন শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হলো, Law, Act, Order, Ordinance, Ethic. ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় Law এবং Act এই দুটি শব্দের জন্যই সাধারণত আইন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আইনের বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন :

(i) **ওহীভিত্তিক আইন (Divine Law)** : এ আইন হচ্ছে ঐসব আইন যে সকল বিধিবিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

(ii) **নৈতিক আইন (Moral Law) :** ব্যক্তিগত বিবেক ও জনসমাজের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আদর্শ মানবিক আচরণ নির্দেশ করে এমন বিধিবিধান হলো নৈতিক আইন (Moral Law)।

(iii) **প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) :** প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত নিয়ম-কানুনকে প্রাকৃতিক আইন বলে।

(iv) **বৈজ্ঞানিক আইন (Scientific Law) :** প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী ও কার্যকারণের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিচারে কাজ করে এমন নিয়ম-কানুনকে বৈজ্ঞানিক আইন (Scientific Law) বলা হয়।[১৯]

---

১৭. আল কুর'আন, ৫ : ৪৪-৪৫, ৪৭।

১৮. ইবনে খালিণ্ঢকান, *ওয়াফাতুল আইয়ান* (আল-কাহেরা : ১৮৮১), খ. ১, পৃ. ১৯৭।

১৯. গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ.৩২।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) বিশিষ্ট আইনজ্ঞ **গাজী শামছুর রহমান** বলেন, "আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয়ে সেকালের ধারণানুযায়ী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সেই সময়কার সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা।"[২০]

(খ) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, "আইন বলতে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও প্রয়োগকৃত বিধিসমূহ বুঝায়।"[২১]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের প্রথম বছরই সর্বপ্রথম ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হয়েছিল। কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এটাই ছিল বিধিবদ্ধ ও জারীকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইসলামী আইন।[২২]

ইসলামী আইনের পরিচয়

(ক) ইসলামী চিন্তাবিদ **আবূ বকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী** বলেন, "ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবনব্যবস্থা; যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শারী'আতে যে সকল নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তা-ই ইসলামী আইন।"[২৩]

(খ) প্রখ্যাত আইনজ্ঞ **মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান** বলেন, "ইসলামী আইন হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর নির্দেশ। যা স্বর্গীয়ভাবে বিন্যস্ত আকারে অগ্রগামী হয়ে ইসলামী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কখনই ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র অগ্রগামী হয়ে উক্ত আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।"[২৪]

(গ) বিশিষ্ট আইনবিদ **আলিমুজ্জামান চৌধুরী** বলেন, "ইসলামী আইন হলো, পবিত্র কুর'আনে বিধিবদ্ধ, হাদীসে নির্দেশিত, আলিমগণের ঐকমত্যের (ইজমা) উপর প্রতিষ্ঠিত

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২১. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : আমিন ল' বুক সেন্টার, ২০১০), পৃ. ২৩।

২২. লেখকমন্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা : ইফাবা, ২০১১), খ. ১, পৃ. ২১।

২৩. ইমাম আলাউদ্দিন আবূবকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারাঈ* (কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৩৭৮ হি), খ. ৬, পৃ. ৪৮১।

২৪. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তুলনামূলক অবরোহন প্রক্রিয়ায় (কিয়াস) সুসংহত বিধানাবলি, যার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্ববিষয় আবর্তিত।"[২৫]

(গ) বিশিষ্ট আইনজ্ঞ **আলহাজ বদিউল আলম** বলেন, "আরবী 'ফিক্হ' শব্দের প্রায়োগিক অর্থ 'আইন'। কাজেই ইসলামী আইন হচ্ছে মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত বিধান।"[২৬]

ইসলামী আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী আইন মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক যা কুর'আনের বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার দ্বারা সমুজ্জ্বল। নৈতিকতাবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত এবং কুর'আনের বাণী ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

কুর'আনই হলো ইসলামী আইনের প্রধান মূল উৎস এবং কুর'আনের বাণীতেই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাবলি বর্ণিত রয়েছে। কুর'আনের বাণী যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত, তাই সকল মুসলামানদের কুর'আনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে এবং ইহার প্রতি ঈমান আনতে হবে। ঈমান হলো ইসলামী আইনের ভিত্তি। কুর'আনের অনুশাসন ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষায় উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **ডি. এফ. মোল্লার** ভাষায় বলা যায়, The prophet`s percepts and usages were like wise guided by God and in the same way as the text of Quran, furnished and index of what was right and what was wrong.

অর্থাৎ কুর'আনের বাণী এবং হযরতের শিক্ষা হলো ইসলামী আইনের মূলমন্ত্র, যাতে ধর্মীয় তত্ত্ব এং নৈতিকতাবোধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন আদালত বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন মুসলিম ব্যাখ্যাদানকারী কোনভাবেই পবিত্র কুর'আনের বাণীর পরিপন্থী কোন ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করিতে পারেন না। ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত প্রিভি-কাউন্সিল এই মর্মে রায় প্রদান করেছেন যে, কুর'আনের বাণী

---

২৫. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : কুমিলণ্ডা ল' বুক হাউজ, ২০০৫), পৃ. ২৬।

২৬. আলহাজ বদিউল আলম, *ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫), পৃ. ৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান সেক্ষেত্রে অন্যভাবে কিংবা পৃথকভাবে এর ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে আদালতের কোন এখতিয়ার নেই।[২৭]

সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুর'আন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনের মূল কাঠামো রচিত হয়েছে।

ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানব রচিত আইনের উপর ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা।[২৮]

ইসলামী আইন তথা শারী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন, "বিশ্বমানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সচ্ছ, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বে দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর হতে পারে।"[২৯]

কানুন

আরবী কানূন শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হিসেবে আইন, নিয়ম, সূত্র, বিধিবিধান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : قانون الاخلاق هو الخير "চরিত্রের মূলনীতি হলো উত্তম হওয়া"

পরিভাষায় 'কানূন' শব্দটির ব্যাপক ও বিশেষ দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। ব্যাপকার্থে কানূন বলা হয়, অবশ্য পালনীয় সাধারণ আচরণবিধিকে যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং এ আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি নিরূপণ করে। তদুপরি রাষ্ট্র যে নীতি পালন করতে জনগণকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে, তাকেও আইন বলা হয়। পক্ষান্তরে বিশেষ অর্থে কানূন বলা হয় ঐসব নীতি বা নীতি সমষ্টিকে, যা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা

---

২৭. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২৮. এম মনির-উজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ২০১২), পৃ. ২।

২৯. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যেমন : বলা হয় القانون التجارة (বাণিজ্যিক আইন), القانون الشراكة (কোম্পানি আইন) ইত্যাদি।[৩০]

'কানূন' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মান্না-আল-কাত্তান বলেন, "কানূন বলা হয় ঐসব নীতি, বিধি ও নিয়মের সমষ্টিকে, যা কোনো জাতির চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন পারিচালনার জন্য প্রণয়ন করেন।"[৩১]

সাধারণভাবে আরবী কানূন শব্দটির সাথে কোন দেশকে সংযুক্ত করলে তা দ্বারা উক্ত দেশের জাতীয় আইন বুঝায়। যেমন যদি বলা হয় القانون البنغلاديشي (বাংলাদেশি আইন), তখন এর দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ও বাংলাদেশে প্রচলিত আইনকেই বুঝানো হয়।

সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রে এ গ্রিক শব্দটির অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রথম অবস্থায় শব্দটি রাষ্ট্রীয় নীতির মানদণ্ড বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। কালপরিক্রমায় এটি বিচ্ছিন্নভাবে আইনের বিভিন্ন দিক বুঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। উসমানী খলীফাগণের আমলে 'কানূন' শব্দটি প্রধানত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক আইন এবং দণ্ডবিধি আইনের আওতাভুক্ত বিধিসমূহ নির্দেশ করত। পরবর্তীতে ইস্তাম্বুলের গ্র্যান্ড মুফতী আবূ সাউদের তৎপরতায় রাষ্ট্রীয় 'কানূননামা' রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল দেশেই কানূন শব্দটি কেবল পাশ্চাত্য আইন-পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত আইন ও বিধিসমূহ যথা, দেওয়ানী ও বাণিজ্যিক আইন, প্রশাসনিক ও দণ্ডবিধি আইন ইত্যাদি বুঝায় না; বরং এর সাথে সাথে যেসব আইন ও বিধানাবলী সরলীকরণকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোও বুঝায়। যেমন, ব্যক্তিগত মর্যাদাসংক্রান্ত সিরীয় বিধান (কানূন) ১৯৫৩ খ্রি., ব্যক্তিগত মর্যাদা সংক্রান্ত ইরাকী আইন (কানূন) ১৯৫৯ খ্রি. এবং মিসরীয় পারিবারিক বিধান (কানূন নামে পরিচিত)। আবার কানূন শব্দটি যেকোনো সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী বিধিবদ্ধ আইনসমূহ নির্দেশ করতেও ব্যবহৃত হয়।[৩২] সর্বোপরি কানূন শব্দটি শারী'আ আইন ও শারী'আ বহির্ভূত আইন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।[৩৩]

---

৩০. ড. গালিব আলী আদ-দাওআদী, *আল-মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন*, (আম্মান : দার ওয়াঈল লিত্ তিবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ২০০৪ ইং), পৃ. ১০।

৩১. মান্না বিন খলীল আল-কাত্তান, *তারীখুত্ তাশরিইল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৩২. লেখকমন্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭-২৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ

কেবল শারী'আ আইনকে বুঝাতে সুপ্রাচীন কাল থেকে মুসলিম আইনবিদগণ কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত ফিক্‌হ শব্দ ব্যবহার করে আসছে। ফিক্‌হ (فقه) শব্দটি আরবী, এর আভিধানিক অর্থ– বুঝা, জানা, অনুধাবন করা, বিচক্ষণতা, শিক্ষালাভ করা, দক্ষতা অর্জন করা ইত্যাদি।[৩৪]

কুর'আনে ফিকহের অর্থ

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে ফিকহ শব্দটি বিভিন্ন প্রকাশার্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো–

কুর'আনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতে ফিকহ فقه শব্দের ব্যবহার

ক্রমিক	মূল শব্দ	আয়াত সংখ্যা	আয়াত নং
১	يَفْقَهُونَ	১৩ টি	৪ : ৭৮, ৬ : ৬৫, ৬ : ৯৮, ৭ : ১৭৯, ৮ : ৬৫, ৯ : ৮১, ৯ : ৮৭, ৯ : ১২৭, ১৮ : ৯৩, ৪৮ : ১৫, ৫৯ : ১৩, ৬৩ : ৩, ৬৩ : ৭
২	يَفْقَهُوهُ	৩ টি	৬ : ২৫, ১৭ : ৪৬, ১৮ : ৫৭
৩	يَفْقَهُوا	১ টি	২০ : ২৮
৪	نَفْقَهُ	১ টি	১১ : ৯১
৫	لَا تَفْقَهُونَ	১ টি	১৭ : ৪৪
৬	لِيَتَفَقَّهُوا	১ টি	৯ : ১২২
	মোট	২০ টি	

কুর'আন মাজীদের উপরিউক্ত আয়াতগুলো হচ্ছে ফিকহের ভিত্তি। আয়াতগুলোতে যে ভাষায় ফিকহের জ্ঞানার্জনের কথা হয়েছে, তাতে মনে হয় ফিকহের জন্য একটি বিশেষ কাঠামো নির্ধারিত রয়েছে। এ কারণে ইমাম গাযালী (রহ.) ফিক্‌হ-এর মধ্যে নিম্ন বর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে বলে মনে করেন :

১. প্রবৃত্তিজাত বিপদগুলোর সূক্ষ্মতা অর্জন

---

৩৪. জামালউদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরূত : দার‍্ ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৯ ইং), খ. ১০, পৃ. ৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. আমল বিধ্বংসী বিষয়গুলো অনুধাবন

৩. আখিরাতের জ্ঞানলাভ

৪. পরকালীন নিয়ামতরাজির প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ

৫. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তভাব ও নিয়ন্ত্রণ লাভের ক্ষমতা

৬. হৃদয়ের মণিকোঠায় আল্লাহ-ভীতির প্রাধান্য।

হাদীসে ফিকহ : বিভিন্ন হাদীসে ফিকহের ব্যবহার পাওয়া যায়। তন্মেধ্যে কয়েকটি হলো–

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তিনি তাকে দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।"[৩৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবা কিরামের উদ্দেশ্যে বলেন:

اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَاِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا۔

"লোকজন তোমাদের অনুসরণকারী হবে। লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য নানা স্থান থেকে তোমাদের কাছে আসবে। যখন তারা তোমাদের কাছে তখন তোমাদের প্রতি আমার এই অসিয়ত থাকবে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।"[৩৬]

পরিভাষায় ফিকহ : পরিভাষায় ফিকহ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা ইসলামী বিধিবিধানকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কালপরিক্রমায় ফিকহ শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ইসলামী জীবনধারায় সকল আইন-কানূন, নিয়ম-নীতির একটি শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফিকহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন,

(ক) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন, "শারী'আতের মূল উৎস থেকে প্রমাণিত বিধিবিধানসংক্রান্ত জ্ঞানকে ফিকহ বলা হয়, যা দ্বীনের বিধান হওয়ার বিষয়টি বিনা চিন্তা-গবেষণায় অর্থাৎ সহজভাবে জানা যায়।"[৩৭]

---

৩৫. আবু আবদুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *আস সহীহ* (দামেশক : দার‍্ তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ.১, পৃ. ২৫, হাদীস নং : ৭১।

৩৬. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুস্ড়ফা আল বাবী আল হালী, ১৩৯৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ৩০, হাদীস নং : ২৬৫০।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে– معرفة النفس مالها وما عليها অর্থাৎ "নাফস ও আত্মার জন্য যেসব কাজ কল্যাণকর এবং যেসব কাজ কল্যাণকর নয়, সেগুলোসহ নাফস সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলে।"[৩৮]

ইমাম সাইফুদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদী বলেন, "যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ণীত শারঈ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে অর্জিত জ্ঞান।"[৩৯]

ফিকহশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেকোনো সমস্যা ওহী নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সমাধান করে দিতেন। কিন্তু মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর কুর'আন নাযিলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তখন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য ফিকহ শাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে।

মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর অহির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন মুজতাহিদ সাহাবিগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করেন, এভাবে ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের দু'মহান খলীফা যথাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহ ছিল ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি। তাঁদের সময় কোন প্রকার মতানৈক্য দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। মতপার্থক্য কোথাও পরিলক্ষিত হলে তা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। বুনিয়াদী কোন বিষয়ে মতপার্থক্যের সূচনা হয়নি। ইসলামের চতুর্থ খলফিা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। এ সময় খারেজী সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। পরিণতিতে খিলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে খারেজী ও শী'আ সম্প্রদায় নামে দুটি উপ-দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। খারেজী সম্প্রদায় শুধু কুর'আন মাজীদ ও প্রধান দুই খলীফার শাসনামলে প্রমাণিত হাদীসসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতো। প্রাথমিক পর্যায়ে শী'আ সম্প্রদায় খারেজীদের কাছাকাছি অবস্থান করলেও

---

৩৭. ফখর‍ুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আর-রাযী, *আল-মাহসূলু ফী উসূলিল ফিকহ* (বৈরূত : মুআসসাসাতুল রিসালাহ, ১৯৯২), খ. ১, পৃ.৭৮।

৩৮. মুহাম্মদ র‍ুহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ১৯।

৩৯. সাইফুদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদী, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম*, (রিয়াদ : দার‍ুল মামীয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযী, ২০০৩), খ. ১, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে তারা একটি চরমপন্থী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই শরী'আতের মাসআলাগুলোকে সঠিকভাবে মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দিতে ফিক্‌হশাস্ত্রের উদ্ভব।

কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে, জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হতে থাকে। এসব সমস্যা সমাধানে কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার প্রয়োজন হয়। হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগে হদীস বর্ণনার আধিক্যের কারণে জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের ফিতনা ভয়াবহরূপ ধারণ করায় বিভিন্ন নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়। এ সময় উমাইয়া খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তত্ত্বাবধানে গ্রন্থকারে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুতে আহলুল হাদীস ও আহলুর রায় এর শাখা-প্রশাখা ও ধারা-উপধারা বিষয়ে দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে ফিকহশাস্ত্রের কতগুলো বিতর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন,

১. পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে প্রাধান্য নির্ণয়ের পদ্ধতি কী?

২. কিয়াস, যুক্তি-তর্ক এবং ইসতিহসান এর মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করা বৈধ কিনা?

৩. ইজমা এ মৌলিকত্ব আছে কিনা?

৪. আমর (নির্দেশ) ও নাহি (নিষেধ) সূচক শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত বিধানের ধরণ বা প্রকৃতি কী হবে?

মোটকথা দ্বিতীয় শতকের সূচনাপর্ব ছিল ইসলামের আইন-বিধান ও মূলনীতির ক্ষেত্রে ফকীহ 'আলিম সমাজের মতপার্থক্যের সময়। এ সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে মীমাংসাদানের লক্ষ্যে কাযীদের বাধ্য করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কাযীদের পরস্পর বিরোধী রায়ের কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়। সে সময় তাদের সামনে সঠিক মাসআলা জানার জন্য কোন সুবিন্যস্ত সংকলন ছিল না। অপরদিকে ইসলামী বিশ্ব ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং বহুবিধ সমস্যার চাপ বাড়তে থাকে। ফলে সুবিন্যস্তরূপে ফিকহ (আইনশাস্ত্র) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে।

ইসলামি শারী'আতের মূল উৎস কুর'আন, সুন্নাহ হলেও এদের সুবিন্যস্ত করতে ফিকহ শাস্ত্রের প্রয়োজন পড়ে। আবার ইসলামি শারী'আতের বিধানগুলোকে সহজে বোঝার জন্য বা সহজ পদ্ধতিতে সমাধান বের করার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য বিষয় : ফিকহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সমূহ হলো-

ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো অর্থাৎ মুকাল্লাফ তথা বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল। অর্থাৎ যেহেতু বালেগ, জ্ঞানবান ও মুকাল্লাফ, মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়ে এই ইলমের মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং তা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মুসতাহসান, মুবাহ, জায়েজ, নাজায়েজ, হালাল, হারাম, মাকরূহ তাহরীমী ও মাকরূহ তানযীহী ইত্যাদির থেকে কোনটির অন্তর্ভুক্ত তা নির্দেশ করা হয়; তাই মুকাল্লাফ মানুষের কর্ম এবং আমলই এ ফিকহশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সর্বোপরি ফিক্‌হশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো–

ক. ইবাদত : যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

খ. পারস্পরিক লেনদেন : এটা হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান। যাতে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথভাবে কাজ করার নীতি পদ্ধতি। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ, ভাড়া, আমানত ইত্যাদি।

গ. বিবাহ সম্পর্কিত : মানবের বংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান। যার মধ্যে রয়েছে বিবাহ, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, অসিয়ত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

ঘ. দণ্ডবিধি : অপরাধ তথা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদি এবং তার শাস্তি যথা মৃত্যুদণ্ড, হাতকাটা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি।

ঙ. মুখাসামাত : এর মধ্যে রয়েছে আদালতি বিষয়সমূহ যথা অভিযোগবিধি, বিচারবিধি, প্রমাণ প্রয়োগবিধি ইত্যাদি।

চ. হুকুমত ও খেলাফত : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সন্ধি, মন্ত্রিত্ব, কর আরোপ ও আদায় ইত্যাদির যেসব বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল।[৪০]

ইলমুল ফিকহের এ আলোচ্য বিষয় সমষ্টি হঠাৎ এক সময় অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বিবর্তনের বহু পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে উপনীত হয়েছে।

১.২ শারী'আ আইনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে শারী'আ আইন

---

৪০. মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ফাতওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), খ. ১, ২য় ভাগ, পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর আইনের অনুমোদনক্রমে আইন প্রণয়ণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে (সা.) শা'রে অর্থাৎ শারী'আত প্রণেতা হিসেবে ক্ষমতা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "রাসূলুল্লাহ তোমাদের জন্য যা নিয়ে আসে তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[৪২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে কুর'আন ও সুন্নাহের সমন্বয়ে আইন ও বিচারকার্য পরিচালনা করেন। মদীনা সনদের ২৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সকল বিরোধ বা বিবাদে একমাত্র ও চূড়ান্ত বিচারক।[৪৩] সনদের ৪২নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যখন লোকদের মধ্যে কোন গোলযোগ বা ঝগড়া লাগে, যা থেকে বিপর্যয়কর কিছু ঘটার আশংকা থাকে, সেসব বিষয় আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পেশ করতে হবে।[৪৪] মদীনা জীবনে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত শারী'আতের সকল আহকাম নাযিল হয়। এতে ফৌজদারি, দেওয়ানি, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক, ধর্মীয়, যুদ্ধনীতি, বিধিবিধান, নৈতিক বিধিবিধান, হালাল-হারাম, সামাজিক আচরণ, লেনদেন, উত্তরাধিকার, সম্পদ বণ্টনসহ মৌলিক বিষয়াবলির বিধান নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কুর'আনের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মদীনার মসজিদে বসে নিজে প্রধান বিচারপতি ও শাসনকর্তার কার্যাদি সম্পন্ন করতেন কুর'আনের বিধিবিধান, সুন্নাহ এবং জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সম্মিলিত মতামত অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্র শাসন করতেন। ঐতিহাসিক বোসওয়ার্থের (Bosworth) মতে, "যদি কেহ ঐশ্বরিক

---

৪১. আল কুর'আন, ৫৩ : ৩, ৪।

৪২. আল কুর'আন, ৫৯ : ৭।

৪৩. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূলুলণ্ডাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুঁইয়া (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ২২-২৩।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিধান সম্মত শাসন বিধি প্রতিষ্ঠার গৌরব করতে পারেন তবে তিনি হযরত (সা.) ছাড়া আর কেহ নহেন।"[৪৫]

আল কুর'আনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচার ব্যবস্থার পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়েছে। আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) হিসেবে মনোনীত করলাম।[৪৬]

২. খিলাফত যুগে শারী'আ আইন

খোলাফায়ে রাশেদীনের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) শাসন ব্যবস্থা ও বিচারনীতি সম্পূর্ণভাবে কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হতো। আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে যেমন সমান, ঠিক তেমনি তাদের শাসনেও সকল নাগরিক ছিল সমান। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন দুনিয়ার বুকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের (Brotherhood of man) যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা ছিল অভূতপূর্ব। সেজন্য ইহুদি, খ্রিস্টান, সেবিয়ান সকলেই মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্রের মিশ্রণ ঘটলে যে সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ইসলামের আইন-কানুনগুলোর স্বাভাবিক প্রবণতা সেদিকেই।"[৪৭] ঐতিহাসিক খুজারীর মতে, The Khilafat was a temporal headship based on religion অর্থাৎ "খলিফা ছিলেন ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পার্থিব শাসনকর্তা।"[৪৮]

হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে বিচার ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন। তিনি সর্বপ্রথম মদীনা মসজিদের বাইরে স্বতন্ত্র দারুল কাজা বা বিচারালয় স্থাপন করেন। কাজিগণ কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ইজমা, কিয়াস বা শারী'আত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

প্রাদেশিক কাজী বা বিচারক তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। উদাহরণ স্বরূপ মদীনায় তিনি আবু দারদা (রা.)-কে, কুফায় আবু মুসা আল আশআরিকে ও বসরায় শুরাইহকে কাজি নিযুক্ত করেন।

---

৪৫. হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ১৯৯৫), পৃ. ৬৫।

৪৬. আল কুর'আন, ৫ : ৩।

৪৭. হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্বিশেষে সামগ্রিক ব্যবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য একটি মৌল ভিত্তি। আবূ মুসা আল আশআরীর প্রতি খলীফা উমরের বিখ্যাত উপদেশবাণীতে বলা হয়েছে, 'তোমরা বিচারে ও বিচারালয়ে তাদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে, অন্যথায় ক্ষমতাবানরা তোমার পক্ষপাতিত্ব আশা করবে এবং দুর্বলরা তোমার বিচারে নৈরাশ্য বোধ করবে।' নির্ভরযোগ্য হোক আর না হোক এসব বিধি প্রত্যেকটি আইন গ্রন্থে দেখা যায় এবং এগুলো ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের ভিত্তি।[৪৯]

৩. পরবর্তী খিলাফত ব্যবস্থায় শারী'আ আইন

ইসলামী জাহানের গৌরবোজ্জ্বল খিলাফত (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। খিলাফতের উদ্ভব, খলিফার নির্বাচন, খিলাফতের গতি ও স্থিতি এবং উৎকর্ষতা এ ত্রিশ বছরে পূর্ণতা পায়। পরবর্তীতে উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.), আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.), মিশরের ফাতেমীয় খিলাফত (৯০৯-১২৭১ খ্রি.), স্পেনের উমাইয়া খিলাফাত (৭১১-১৪৯২ খ্রি.) এবং উসমানীয়া অটোমান বা তুর্কি খিলাফত (১২৯৯-১৯২৪ খ্রি.) রাজতন্ত্রের আচ্ছাদনে লালিত খিলাফত ব্যবস্থা। এতদসত্ত্বেও মুসলিম জাহানের এ দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক এ ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে খিলাফত ব্যবস্থা নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ দীর্ঘ সময়ে শারী'আ আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হতো। কুর'আন ও সুন্নাহর বাইরে এ সময়ের উসূল বা মৌলিক নীতিমালার সমন্বয়ে ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কিয়াসের উদ্ভব ঘটে এবং চার খলিফার সময়ে ইজমার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ হয়। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান চার ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ফিকাহ ও উসূলে ফিকহের সমন্বয়ে আইনের নবতর উৎসের সৃষ্টি করেন। কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বাহিরে ইস্তিহসান, আল্ মুসলিহাত, আয্ যারায়ে, আল ইসতিসহাব, আল ইসতিসলাহ, আল ইসতিদলাল, উরফ, আদাত, মাসাহিলুল মুরাসালাহ ও ফিকহি মাসায়েলের উদ্ভব ঘটে। ৮০ থেকে ১৫০ হিজরী সন পর্যন্ত আইনের প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৬ খ্রি.)। ইসলামী আইনের ফিকহ ও উসূলে ফিকহের তিনিই ছিলেন প্রবর্তক। তিনি ইসলামী আইনের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করে

৪৯. স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফেড গিল্ম, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, অনু. নুর-ল ইসলাম পাটোআরী (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭), পৃ. ২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক একটি সূত্রের প্রবর্তন করেন যাকে বলা হয় ইস্তিহসান। ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে তিনি যে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন তাকে বলা হয় ইলমুল উসূল। উসূলের মাধ্যমে যে অসংখ্য হানাফী আইনের সূত্র বিধিবদ্ধ করেছেন তাকে বলা হয় ইলমুল ফিকহ। ইমাম আবু হানিফা তার ৪০ জন অনুসারীসহ দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে হানাফী মাযহাবের ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ করে গেছেন। তার অন্যতম সহচর পণ্ডিত ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন খলীফা আল মনসুরের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি।"[৫০]

ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টির মতে, "রোমানদের পর মধ্যযুগের মানুষ হিসেবে আরবরাই বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার শাস্ত্রের চর্চা করেছে এবং তার মধ্যদিয়ে সেখানে একটা স্বনির্ভর বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাদের এই বিচার ব্যবস্থাকে আরবরা বলত ফিক্হ। কুর'আন ও সুন্নাহর (হাদীস) উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং উসূল (মূলভিত্তি, মৌলিক নীতিমালা) নিয়ে খ্যাত ছিল। এর উপর গ্রিক ও রোমান বিচার ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইসলামের অনুশাসন নীতি (শারী'আ) কুর'আন উদ্ধৃত ও হাদীসে বিশদভাবে বিশ্লেষিত আল্লাহর উপদেশাবলি ফিকহের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উপাসনা (ইবাদত), সামাজিক ও আইনগত দায়দায়িত্ব (মুয়ামিলাত) এবং শাস্তিসমূহ (উকুবাত) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেই নির্দেশাবলি ছিল ওই সমস্ত উপদেশগুলোতে।[৫১]

ফিলিপ. কে. হিট্টি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইয়ামেনে তার নিযুক্ত কাজী মুআজ-ইবন-জাবালের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে যে আলোচনা করেছিলেন, তাকে এক কথায় ইসলামী মৌলিক আইনের ম্যাগনাকার্টা (মহাসনদ) আখ্যা দেওয়া যায়।[৫২]

---

৫০. মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০), পৃ. ১৮-১৯।

৫১. ফিলিফ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলিকাতা : মলিণ্ঢক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৪৩৯।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

কথোপকথনটি নিম্নরূপ

كَيْفَ تَقْضِي اِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ ، قَالَ: اَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ ، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: اَجْتَهِدُ رَاْيِي -

মুহাম্মদ (সা.) : "কোন বিষয়ে বিচার করার ক্ষেত্রে তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে?"

মু'আজ (রা.) : "আল্লাহর কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী।"

মুহাম্মদ (সা.) : সেখানে যদি কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?

মু'আজ (রা.) : আল্লাহর দূতের সুন্নাহ অনুযায়ী।

মুহাম্মদ (সা.) : সেখানে যদি কোন নির্দেশ খুঁজে না পাও?"

মু'আজ (রা.) : তা হলে আমি আমার নিজের বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগাব।[৫৩]

মধ্যযুগে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সারাবিশ্বকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল তুরস্কের ওসমানী (Ottoman Empiar) খিলাফতের আমলে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গাজী ওসমান। পারস্য উপসাগর থেকে ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সমগ্র মিশর, ইউরোপের কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে অড্রিয়েটিক সাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনর আনাতোলিয়া এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, সমগ্র বলকান উপদ্বীপ, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়াসহ বিশাল অঞ্চল ছিল ওসমানী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত।[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও চার খলিফা মদীনায় এবং তাদের পর উমাইয়া খলিফাগণ দামেস্কে, তাঁদের পতনের পর আব্বাসীয় খলিফাগণ বাগদাদে ও তাঁদের পতনের পর অটোম্যান তুর্কি খলিফাগণ তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপল রাজত্ব করতেন। শিয়া মতাবলম্বী ফাতেমীয়

---

৫৩. আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৩০৩, হাদীস নং : ৩৫৯২।

৫৪. মোহাম্মদ আলী মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফাগণ মিসরের কায়রোতে এবং আব্বাসীয়দের নিকট পরাজিত হওয়ার পর উমাইয়া বংশের একটি অংশ স্পেনে রাজত্ব করতেন। তাছাড়া খলিফাদের ক্ষমতা হ্রাস পেলে অনেক স্থানীয় মুসলমান শাসক স্বাধীন রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। ওই সকল খলিফাদের এবং মুসলমান রাজা বাদশাহদের আমলে ইসলামী আইনের বিধানমতো বিচার করা হতো।[৫৫]

প্রথম চার খলীফার সময়ে খলিফাগণ ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। এ সময় প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করে প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক জেলার জন্য একজন করে কাজী নিযুক্ত করা হতো। সততা, বংশ মর্যাদা, আইনে পারদর্শিতা ইত্যাদি বিবেচনা করে শূরার পরামর্শানুযায়ী কাজীগণ খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তারা মোটা বেতন পেতেন। তাদের উপাধি ছিল হাকিম। উমাইয়া শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা অনেকটা পূর্বের মতোই ছিল। এ সময়ে কাজীগণ পূর্বের ন্যায় প্রভাবমুক্ত ছিলেন না।

আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বিচার বিভাগকে দরুল আদল বলা হতো এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন দারুল আদলের প্রধান এবং তখন বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা ও স্বাধীন ছিল।

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্যক্তিগত শারী'আ আইনের প্রয়োগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের অবসান হলো, ইসলামী শারী'আ আইন সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে ইজতিহাদের দ্বাররুদ্ধ হওয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নবইজতিহাদের অভ্যুদয় ঘটে। মিশরের প্রখ্যাত আইনবেত্তা মুহাম্মদ আবদুহ্ আইনের আধুনিক সংস্কারের নিমিত্ত আল কুর'আনের প্রত্যাদেশসমূহকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে আয়াত সমূহের পূণব্যাখার পক্ষে সুপারিশ করেন। আল্লামা ইকবালও তার 'ইসলাম পূনঃর্গঠন' সম্পর্কিত গ্রন্থে শারী'আ আইন মুসলমানদের অধিকার এ বিষয়ে সোচ্চার হন। তার প্রভাবে আধুনিক যুগের আর্থ-সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী আইনে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। এই ভাবধারা সর্বপ্রথম বাস্তবায়িত হয় ১৯৫৩ সালে সিরিয়ায় ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্পর্কে প্রণীত আইনে। অতঃপর ১৯৫৭ সালে তিউনিসিয়ায় ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্পর্কিত আইনে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়, ১৯৫৮ সালের মরক্কোর আইন, পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালের আলজেরীয় আইনে, ১৯৫৯ সালে ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্পর্কিত ইরাকী আইনে ব্যক্তিগত শারী'আ আইন প্রণীত হয়।

---

৫৫. মোহাম্মদ আলী মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে শারী'আ আইন

১. সালতানাত যুগে শারী'আ আইন

৭১২ খিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে ৯৯১ খিস্টাব্দে সবুক্তগীনের ভারত অভিযান পর্যন্ত ভারতে মুসলিম শাসন ও বিচার ব্যবস্থার কোন সুযোগ ঘটেনি। মোহাম্মদ ঘুরী ভারত জয় করে এদেশে স্থায়ী ইসলামী শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভারতে মুসলিম শাসন আরম্ভ হলে বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ এদেশে আসতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ধর্মশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁদের মুসলমান সুলতানগণ বিভিন্ন সরকারি পদে বিশেষ করে বিচারকদের পদে নিযুক্ত করতেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের, স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের ও মিশরের ফাতেমী খলিফাদের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতের মুসলিম সুলতানগণ এদেশে ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

১২০৬ সালে কুতুব উদ্দীন আইবেকের রাজত্বকাল থেকে ১৫২৬ সালে মোগল বাদশাহ বাবর কর্তৃক ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করা পর্যন্ত সময়কে সুলতানী আমল বলা হয়। সুলতানি আমলে রাজধানী দিল্লীতে বাদশাহ স্বয়ং আইন সম্পর্কে খুব জ্ঞানী ও খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন মুফতির সাহায্যে আদি ও আপিল মামলা বিচার করতেন। দেওয়ান-ই-মুজালিম নামক আদালত ছিল রাজ্যের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত এবং দেওয়ান-ই-রিসালত ছিল রাজ্যের সর্বোচ্চ দেওয়ান-ই-আপিল আদালত। বাদশাহর পর কাজী-উল-কুজাত বা প্রধান বিচারপতির পদটি ছিল সর্বোচ্চ পদ। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিন কাজি-উল-কুজ্জাত এর পরিবর্তে সদর-ই-জাহানের পদ সৃষ্টি করেন। সালতানাতের সময়ে মুফতি (মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ), পণ্ডিত (হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ), মুহতাসিব (সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী) ও দাদবাকের (আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা) সাহায্যে মামলা পরিচালনা করতেন। বাদশাহ সিকান্দার লোদী কাজি-উল-কুজ্জাতের পদকে পরিবর্তন করে মীর-ই-আদিল করেছিলেন। এভাবে সুলতানী আমলে বাংলাদেশেও শারী'আতি আইন প্রয়োগ করা হতো। সুলতানরা জ্ঞানী ও ন্যায়বিচারক ছিলেন। সুলতানী আমলে দৈনন্দিন বিচারের ভার কাজির উপর ন্যস্ত ছিল। শহর এবং গ্রামে কাজী নিযুক্ত হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. মোঘল আমলে শারী'আ আইন

১৫২৬ সালে থেকে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে মোগল আমল বলা হয়। মোঘল সম্রাটদের শাসনামলে শারী'আর অধিকাংশ ধারা কার্যকর ছিল। সম্রাট আকবর ছাড়া অন্য সম্রাটগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারী'আ আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এক্ষেত্রে বাদশাহ আওরঙ্গজেব (আলমগীর) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। শেরশাহের সময়ে ধর্মীয় আদালতে বা কাজীর আদালতে ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি আইনসংক্রান্ত মামলার বিচার হতো। ধর্মীয় আইন কোন মুসলমান ভঙ্গ করলে কাজী তার বিচারও করতেন। কাজী মুফতিদের সহায়তায় ধর্মীয় আদালতে বিচার করতেন। সাধারণ আদালতে সকল ধর্মের প্রজাদের ইহজাগতিক বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার বিচার করা হতো। শের শাহ পূর্ণাঙ্গভাবে শারী'আ আইনে বিচার প্রতিষ্ঠিত করেননি।

১৭শ শতকে সর্বপ্রথম মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পর একটি রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে ইসলামী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রণয়নের নির্দেশ জারি করেন। এ কাজ সফলভাবে সমাধানের জন্য তৎকালীন প্রখ্যাত ভারতীয় ফকীহগণের সমন্বয়ে এবং স্বনামধন্য আলেম নিজামুদ্দীন বোরহানপুরীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আইনের একটি সুবৃহত সংকলন প্রণয়ন করেন; এর নামকরণ করা হয় ফাতওয়া-ই-আলমগীরী। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত এটিই ইসলামী আইনের সর্বপ্রথম সংকলন। বিচারকার্যে কাজীগণ মুফতী এবং মীর আদিল কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হতেন। কুর'আন, ফতোয়া-ই-আলমগীরী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রণীত দ্বাদশ আইন ইত্যাদি ছিল মোগল যুগের আইনের উৎস। সদর-উস-সুদূর ছিলেন ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারাদি এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ঐতিহাসিক ভি.ডি মহাজন বলেন–

æThis office was filled by persons Who had a very lofty character. Sadar-us-sudur the connecting link between the King and the people. He was the guardian of Islamie law and the spokesman of Ulema".

অর্থাৎ "যাহাদের চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত তাহাদের দ্বারা এই পদ পূরণ করা হইত। সুদর-উস-সুদুর সম্রাট এবং জনগণের মধ্যে ছিলেন সংযোগ সেতু। তিনি ছিলেন ইসলামী আইনের অভিভাবক এবং ওলামা শ্রেণির প্রবক্তা।[৫৬]

---

৫৬. হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলাদেশে শারী'আ আইন

হিজরী প্রথম বর্ষ থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ধরে এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় মুসলিম স্পেন ও বর্তমান পর্তুগালসহ অনেক দেশ দীর্ঘ আটশ বছর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত (১৭৫৭ খ্রি.) ইসলামী আইন কার্যকর ছিল। গত শতকের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুর্কী খিলাফতের অবসান হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমসহ মধ্য প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর-অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সাল মোতাবেক ১২০৩ খ্রি.। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের (৬০২হি./১২০৬খ্রি.) সময় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রি. বাংলায় অলৌকিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ করেন।[৫৭] এ সময় থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব, তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলিম বাংলায় আগমন করেন। তখন বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন। মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন এবং শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খ্রি. মুহাম্মদ তুঘলক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ে যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রি. পলাশী প্রান্তরে মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত (১২০৩-১৭৫৭খ্রি.) ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৫৮] উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা ইসলামী আইন বলবৎ রাখে। অতঃপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন প্রণয়নের পর ধীরে ধীরে প্রতিটি বিভাগ থেকে ইসলামী আইনের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। তবে আইন প্রণয়নে তারা ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের সহায়তা গ্রহণ করে। এ কারণেই তাদের প্রণীত আইনের মধ্যে ইসলামী আইনের উপাদান ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। মুসলিম পার্সোনাল ল' আকারে ইসলামী আইনের কয়েকটি অধ্যায় তারা বলবৎ রাখে। এমনকি ব্যক্তিগত আইনও পরিবর্তন করে সরাসরি

---

৫৭. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৪।

৫৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করার ঝুঁকি নেয়নি। তবে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামী আইনের যে ভিত রচিত হয়েছিল তা এতই মজবুত ও বাস্তবসম্মত ছিল যে, বিশ্বমানবতা হাজার বছরেরও বেশি সময় এই আইনের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এজন্য বিগত প্রায় দুশো বছরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ব্রিটিশ ল' এর একচ্ছত্র আধিপত্য সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আইনের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা কোন না কোন পর্যায়ে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু আজকের মুসলমানদের সমস্যা ভিন্নতর। কেননা ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে এক শ্রেণির লোকদের তাদের শিক্ষা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার পর এদের হাতে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করে যায়। এই নব্য শাসকশ্রেণি চিন্তা-চেতনায়, মন-মননে ও ভাবাদর্শে কার্যত সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অনুগামী। ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও এদেশীয় শাসক শ্রেণি তাদের প্রণীত আইন কাঠামো বলবৎ রাখে। তাদের ধারনা হলো ইসলামে একটি আধুনিক দেশ ও জাতিকে শাসন করার মতো উপযুক্ত কোনো আইন নেই।[৫৯] মুসলিম জাতি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। এজন্য দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এই উপমহাদেশে পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান শাসনামলেও বাংলাদেশে প্রত্যাশিতভাবে না হলেও বিভিন্ন আইনে ইসলামী শারী'আত অনুসরণ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অব্যবহিত পর থেকে আজ অবধি ইসলামী শারী'আত অনুসরণের এ ধারা অব্যাহত।

১.৩ শারী'আ আইনের উৎস

শারী'আ আইনের উৎস মূলত চারটি। কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এগুলোকে মুত্তাফাকুন আলাইহি মূলনীতি বলা হয়।[৬০] সমগ্র ফকীহ এ ব্যাপরে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা যেসব হুকুম প্রমাণিত তা মেনে চলা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

---

৫৯. ড. মো. মাসুদ আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, বর্ষ ৬, সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ১১৩-১১৪।

৬০. সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْل اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا۔

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূল (সা.)-এর এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর দিকে অর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[৬১]

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর আনুগত্য মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব আল কুর'আনের আনুগত্য। রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য মানে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত বা হাদীসের আনুগত্য। আর اُوْلِي الْاَمْرِ বলতে মুসলমানদের মধ্যে মুজতাহিদদের ঐকমত্য বা ইজমাকে বুঝানো হয়েছে। আর বিতর্কিত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর দিকে প্রত্যাগমনের অর্থ হলো যেখানে নস ও ইজমা নেই সেখানে কিয়াস করার প্রতি আদেশ করা হয়েছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই এ চারটি বিষয় শারী'আতের উৎস হওয়ার ব্যাপারে কারো মত দ্বিমত হয়নি।

মৌলিক এ চারটি উৎসের বাইরে আরো কয়েকটি উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো ইসতিহসান (অনুমোদিত আইন), ইসতিসলাহ (জনকল্যাণমূলক), ইসতিসহাব, ইসতিদলাল, আল মুসলিহাত, মাসালিহুল মুরসালাহ, আয যরায়ে, উরফ, পূর্ববর্তী নবীগণের শারী'আত। এগুলোকে মুখতালাফ কীহ মূলনীতি বলা হয়।[৬২]

এ উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

---

৬১. আল কুর'আন, ৪ : ৫৯।

৬২. সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. আল কুর'আন

আল কুর'আন বলতে আল্লাহ তা'আলার সে কালামকে বুঝানো হয় যা জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে অর্থসম্বলিত আরবী শব্দাবলীসহ অবতীর্ণ করেছেন। এ কুর'আন মাসহাফ আকারে সংকলিত। সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু আর সূরা নাস দ্বারা শেষ। এ কুর'আন আমাদের কাছে মুতাওয়াতির সনদে মৌখিকভাবে ও লিখিত আকারে এক প্রজন্ম হতে অপর প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন বা বিকৃতি ঘটেনি। এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে না। কারণ তার হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকই নিয়েছেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ -

"নিশ্চয় আমি কুর'আন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।"[৬৩]

আল কুর'আন পরিচিতি

আল-কুর'আন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি قَرَءَ - يَقْرَأُ- ক্রিয়ার বাব فَتَحَ - يَفْتَحُ- এর قَرْنٌ মূলধাতু থেকে উৎকলিত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : পড়া, অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা, পঠিত বা আবৃত্ত, একত্রিত করা, মিলিত হওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করা, অধিক পঠিত ইত্যাদি।[৬৪]

ইমাম শাফি'ঈ, ফাররা ও আবুল হাসান (রহ.) বলেন, قُرْاٰنٌ (কুর'আন) শব্দটি হামযা-বিহীন পড়তেন। ইমাম শাফি'ঈ قُرْاٰنٌ (কুর'আন) কোনো শব্দ থেকে গঠিত নয় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অপর এক বর্ণনা মতে قُرْاٰنٌ (কুর'আন) শব্দটি قراة (কিরআতুন) থেকে উদ্ভূত, যা مَقْرُوْءٌ (মাকরুউন) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পঠিত বিষয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল লিখিত কিতাব; কিন্তু তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় পঠিত কিতাব। আর তা হলো এভাবে- জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রত্যাদেশ পড়ে শুনাতেন।

ঘোষণা করা হয়েছে,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ -

"মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।"[৬৫]

---

৬৩. আল কুর'আন, ১৫ : ৯।

৬৪. ড. আহমাদ সান্‌বাতী, *তরজুমাতুল মা'আনিল কুর'আনিয়্যাহ* (কাতার : মাতাবি'আদ দা'ওয়াতুল হাদীছাহ, তাবি), পৃ. ৩৮।

৬৫. আল কুর'আন, ৪০ : ২।

Dhaka University Institutional Repository

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ـ

"তারা কি আল কুর'আন নিয়ে গবেষণা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।"[৬৬]

আল-কুর'আনের পরিচয় হচ্ছে, "এটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে নাযিলকৃত কিতাব যা বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাঈল আ.-এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ . عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ـ

"নিশ্চয় এ কুর'আন রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত; বিশ্বস্ত ফিরেশ্তা জিব্রাঈল একে নিয়ে এসেছেন-আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন, (তা নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[৬৭]

এ মহাগ্রন্থ বিশ্ববাসীর আত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের একমাত্র উৎস। আল-কুর'আনের ভাব, ভাষা, মর্ম ও বিষয়বস্তু সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিজের। পূর্বের সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতি এবং সকল আসমানি গ্রন্থের সারনির্যাস এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন–

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَن يُفْتَرٰى مِن دُونِ اللهِ وَلٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ـ

"এ কুর'আন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো রচনা নয়। এর পূর্বে যেসব আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সমর্থনকারী। এটা বিধিবিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যাদানকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থ।"[৬৮]

---

৬৬. আল কুর'আন, ৪ : ৮২।

৬৭. আল কুর'আন, ২৬ : ১৯২-১৯৫।

৬৮. আল কুর'আন, ১০ : ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনের আবির্ভাব ও নাজিলের পর অন্য কোনো আসমানি গ্রন্থের কার্যকারিতা আর নেই। পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। আল-কুর'আন বিশ্ব মানবের প্রয়োজনীয় বিধানাবলি, দিকনির্দেশনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ ـ

"আমি আপনার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাকারী এবং মুসলিমদের জন্য পথপ্রদর্শক, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।"[৬৯]

কুর'আনের বাহক মহানবী (সা.) বলেন–

اِنَّ هَذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللهِ، وَالنُّوْرُ الْمُبِينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ ـ

"আল-কুর'আন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, কল্যাণময় প্রতিষেধক। যে সাদরে সযত্নে কুর'আনকে আঁকড়ে ধরবে সে সম্মান পাবে এবং যে অনুসরণ করবে, সে মুক্তির রাজপথ পাবে।"[৭০]

আল-কুর'আনের পরিচয় প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন :

كتاب الله فِيهِ نبا مَا كَانَ قبلكُمْ وَخبر مَا بعدكم وَحكم مَا بَيْنكُم وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْل مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَن ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلِقُ على كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا (اِنَّا

৬৯. আল কুর'আন, ১৬ : ৮৯।

৭০. ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, (হিন্দ : দারে সালাফিয়্যা, ১৪২৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং : ১৭৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنا بِهِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

"আল্লাহর কিতাব যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। এটা এমন এক চূড়ান্ত পার্থক্যকারী (হক ও বাতিলের মধ্যে) এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থ যাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কিছুই নেই। অহংকারবশত যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। যে এটা ব্যতীত অন্যত্র হিদায়াত কামনা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু বা রশি। এটি বিজ্ঞানপূর্ণ স্মারক। এটি সিরাতুল মুসতাকীম তথা সহজ-সরল পথ। এটি এমন এক গ্রন্থ যাকে প্রবৃত্তির অনুসারীরা পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। এমন কি অন্য কোনো ভাষা অথবা কোনো কিছুর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।..."[৭১]

বিভিন্ন মনীষীগণ কুর'আনের পরিচয় বিভিন্ন ভাষায় প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ড. সুবহী সালিহ বলেন :

هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته -

"এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত এমন এক মু'জিজাপূর্ণ বাণী যা মাসাহিফে লিপিবদ্ধ, তাঁর থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।"[৭২]

---

৭১. ইমাম বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫, হাদীস নং-১৭৮৮।

৭২. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুর'আন* (মিশর : দার ুর ইলম, ২০০০), খ. ১, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত উসূলবিদ মান্না-আল-কাত্তান বলেন :

هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته ـ

"কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এটা অবতীর্ণ হয়েছে। এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত হিসেবে গণ্য।"[৭৩]

আল-কুর'আন এর সংজ্ঞা সম্পর্কে ফিক্হ ও উসূলবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো:

انه اللفظ المنزل على النبى صلى الله عليه من اول الفاتحة الى اخر سورة الناس ـ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ প্রথম সূরা "ফাতিহা" থেকে শেষ সূরা "নাস" পর্যন্ত সকল বাণীই হলো আল-কুর'আন।"[৭৪]

আল্লামা যারকানী বলেন :

ان القران علم اى كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الالهى ـ

"আল-কুর'আন হলো আল্লাহর অন্যান্য কালাম বা বাণী থেকে পৃথক অনন্য উৎকৃষ্ট এক ধরনের বাণী যা তার পূর্ববর্তী সকল অহি থেকে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।"[৭৫]

আল্লামা নাসাফী (রহ.) কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে :

اما الكتاب فالقران المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة ـ

"কিতাব হলো কুর'আন, যা রাসূল (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, এটি মাসাহিফের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর এটি রাসূল (সা.) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।"[৭৬]

---

৭৩. মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুর'আন* (মিশর : মাকতাবাতুল মাআরেফ, ১৪২১ হি), খ.১, পৃ. ১৭।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৭৫. মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন* (হালব : মাতবাআতু ইশা আলবালী, তাবি), খ. ১, পৃ. ১৭।

৭৬. আলী ইবন আহমদ আল-জুরজানী, *আত-তা'আরিফাত* (ইস্ড়াম্বুল : মাতবা'আহ আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি.), পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন, "কুর'আন' শব্দটি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবের নামের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন 'তাওরাত' শব্দটি মূসা (আ.) এবং 'ইনজীল' শব্দটি ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থদ্বয়ের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৭৭]

ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী বলেন–

هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربى , المنقول الينا بالتواتر , المكتوب بالمصاحف , المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس- -

"কুর'আন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য; সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা আন-নাস দ্বারা যা সমাপ্ত।"[৭৮]

আল কুর'আনের বিভিন্ন আইন

আল কুর'আন মানবজাতির সংবিধান। ইসলামী শারী'আতের প্রধান উৎস। বিশুদ্ধ মতে, আল কুর'আনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬। তন্মধ্যে পাঁচশত আয়াত বিধিবিধান সম্পর্কিত।[৭৯] অবশিষ্টাংশ ঘটনা, উপমা-উদাহরণ, উপদেশ নৈতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াত। এ পাঁচশত আয়াতের মধ্যে কোনটি ফৌজদারি সম্পর্কিত, কোনটি দেওয়ানি সম্পর্কিত, কোনটি পারিবারিক বিষয়ক, আবার কোনটি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত। তাছাড়া রয়েছে হালাল-হারাম সম্পর্কিত বিধিবিধান।

---

৭৭. ইমাম রাগিব ইসফাহানী, *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১-০২।

৭৮. ড. মুহাম্মদ মুস্ত্ফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩ ইং), পৃ. ১৩৯।

৭৯. এ তথ্যটি প্রথম উপস্থাপণ করেন তাফসীরবিদ মুকাতিল ইবন সুলায়মান। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর মতে আহকামের আয়াত ১৫০টি, ইবনুল আরবীর মতে, ৮৬৪টি। তবে ইমাম গাযালী (রহ.)সহ অধিকাংশের মতে আহকামের আয়াত ৫০০টি।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধ সম্পর্কিত আল কুর'আনের দণ্ডবিধি (পান্যাল কোড) নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ফৌজদারি অপরাধ	দণ্ডবিধি সম্পর্কিত আয়াত ও সাধারণ বিধিবিধান
কতল (হত্যা), কিসাস	সূরা বাকারা : ১৭৮; নিসা : ২৯, ৯২, ৯৩; মায়িদা : ৩২,৪৫; সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৩
কিসাস কার্যকর করা	সূরা বাকারা : ১৭৯
কিসাসের ক্ষমা	সূরা বাকারা : ১৭৮
চুরি	সূরা মায়িদা : ৩৮
যিনা (ব্যভিচার)	সূরা নূর : ২, ৩, সূরা নিসা : ১৫, ১৬, ২৫
মদ ও জুয়া	সূরা বাকারা : ২১৯, সূরা মায়িদা : ৯০, ৯১,
সন্ত্রাস	সূরা বাকারা-১৯০, ১৯১
বিশৃঙ্খলা, ডাকাতি, ছিনতাই জবর দখল	সূরা মায়িদা : ৩৩, সূরা আল বাকারা : ১৯৩
মিথ্যা সাক্ষ্য	সূরা নূর : ১৩
লিআনের (নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ)	অপরাধ সূরা নূর : ৬-৯
সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ	সূরা নূর : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১ ও ২৩
আত্মহত্যা	নিসা : ২৯
অশ্লীলতা	সূরা আরাফ : ৩৩
যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে	সূরা মুহাম্মদ : ৪
অন্যায়ভাবে সম্পদের মালিক হওয়া	সূরা বাকারা : ১৮৮

দেওয়ানি ও পারিবারিক সম্পর্কিত বিধিবিধান

দেওয়ানি ও পারিবারিক	বিধান সম্পর্কিত আয়াত
উত্তরাধিকার আইন	সূরা নিসা : ৭, ৮, ১১, ১২
উত্তরাধিকার বণ্টননীতি	সূরা নিসা : ১১, ১২
মীরাছের বণ্টন ও অংশ	সূরা নিসা : ১১, ১২, ১৭৬
উত্তরাধিকারী কারা	সূরা নিসা : ১১
বিবাহ	সূরা নিসা : ৩, ২২, ২৫
দেন মোহর	সূরা নিসা : ৪, ২৪, ২৫, ২০, ২১, ২৩৬, ২৩৭, ১৯
বিবাহের সীমা	সূরা নিসা ৩ : ১২৯
পারিবারিক সালিশী মিমাংসা	সূরা নিসা : ৩৪, ৩৫
তালাক	সূরা বাকারা : ২৩৬, নিসা : ১৩০, তালাক;

Dhaka University Institutional Repository

তালাকের ইদ্দত	সূরা বাকারা : ২২৬-২২৭, ২২৮, ২৩৪, সূরা তালাক : ৪, সূরা আহযাব : ৪৯, সূরা তালাক : ১
যিহারের বিধান	সূরা আহযাব : ৪, মুজাদালাহ : ২, ৩, ৪
লিআনের বিধান	সূরা নূর : ৬-৭, ৮-৯,
খুলা তালাকের ধরণ	সূরা বাকারা : ২২৯।
স্ত্রীর ও সন্তানের ভরণপোষণ	সূরা নিসা : ১৯, ৩৪
দুগ্ধপান সম্পর্কিত	সূরা বাকারা : ২৩৩, তালাক : ৬
পোষ্যপুত্র	সূরা আহযাব : ৫
ইয়াতিমের সম্পদ ও অভিভাবকত্ব	সূরা নিসা : ৩৬, ৯, ১০, ২, ১২৭, ৬, ৫, ৩, সূরা বাকারা : ২১৫, ২২০, সূরা আনআম : ১৫৩
অসিয়তের বিধান	সূরা নিসা : ১১, ১২
মুহাররামাত তথা নিষিদ্ধ বিবাহ	সূরা নিসা : ২২, ২৩ ও ২৪
পর্দার বিধান	সূরা আহযাব : ৫৩, ৩৩, ৫৯, ৩২, ৩৫, সূরা নূর : ৩০, ৩১, ৬০, ৬১, ৫৮, ৫৯, ২৭, ২৮, ২৯।
সাক্ষ্য আইন সম্পর্কিত বিধান	সূরা আল বাকারা : ২৮২, ২৮৩, নিসা : ১৫, সূরা আন নূর : ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১৩, সূরা তালাক : ২

মুআমালাত (সামাজিক বিধিবিধান)

দাস-দাসীর বিধান : সূরা নিসা : ৩, ২৪, ২৫, ৩৬; সূরা নূর : ৩৩, ৫৮; সূরা রূম : ২৮।

যুদ্ধের বিধান : সূরা বাকারা : ১৯০, সূরা তওবা ৫, ২৯, সূরা মুমতাহিনা : ৮, সূরা নিসা : ১০২।

ন্যায়বিচার ও বিচারক সম্পর্কে বিধান : সূরা নাহল : ৯০, সূরা আনআম : ১৫২, সূরা মায়িদা : ৪৪, সূরা আহযাব : ৩৬, সূরা আরাফ : ২৯, সূরা বাকারা-২৮২, সূরা নিসা : ৫৮।

সত্যের আদেশ ও মিথ্যার নিষেধ সম্পর্কিত : সূরা আলে ইমরান : ১১০, সূরা লোকমান : ১৭, সূরা হুজুরাত : ৯, সূরা মায়িদা : ৭৮, ৭৯।

অর্থনৈতিক বিষয়ক বিধানাবলী

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কুর'আনের বিধান : ব্যবসা হালাল : সূরা বাকারা : ২৭৫, সূরা নিসা : ২৯, সূরা মুজ্জাম্মিল : ২ , সূরা ফাতির : ১২, সূরা রুম : ৪৬, সূরা বাকারা : ১৯৮, সূরা নূর : ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুদ হারাম : সূরা বাকারা : ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, আলে ইমরান : ১৩০, ১৩১, নিসা : ১৬১, মায়িদা : ৬২, ৬৩, রুম : ৩৯।

সুদখোরের পরিণতি : সূরা বাকারা ২৭৫, ২৭৮, ২৭৯

ঋণ সম্পর্কিত নিয়ম : সূরা বাকারা : ২৮০, ২৮২

বন্ধকের নিয়ম : সূরা বাকারা : ২৮৩

আমানত সম্পর্কিত : সূরা নিসা : ৫৮

উপার্জন ও পেশা সম্পর্কিত বিধান : সূরা জুমুআ : ১০, সূরা নূহ : ১৯-২০, সূরা আর রহমান : ১০-১৩, সূরা আনআম : ৯৯, সূরা আবাসা : ২৪-২৬, সূরা হিজর : ১৯-২২, সূরা শূরা : ৩২, সূরা কালাম : ২৬, সূরা নূর : ৩৩, সূরা বনী-ইসরাঈল : ৩২, সূরা বাকারা : ১৯৮, সূরা মুজ্জাম্মিল : ২০, সূরা রুম : ৪৬।

হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কিত

হারাম প্রাণী ও খাদ্যের বিবরণ সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আনআম : ১৪৫, সূরা মায়েদা : ৩, সূরা আরাফ : ১৫৭।

হালাল প্রাণী ও খাদ্য সম্পর্কিত আয়াত : সূরা বাকারা : ১৬৮, সূরা আনআম : ১৪৫, সূরা মায়েদা : ৩, ৪, ৫, সূরা মায়েদা : ৯৪, ৯৫, ৯৬।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত বিধান : সূরা আরাফ : ২৬, ২৭, ৩১।

ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান : আল কুর'আনের আয়াতগুলোতে ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভ তথা কালেমা (ঈমান), সালাত, সাওম, হজ ও যাকাতের বিষয়ে বিস্তারিত বিধিবিধান প্রতিফলিত হয়েছে। নৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিধান, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, যুদ্ধে, যুদ্ধনীতি, যুদ্ধের বিধান, মুসলমানদের পারস্পরিক লেনদেন, জিহাদের বিধানসহ মৌলিক বিধিবিধান আল কুর'আনে বিবৃত হয়েছে। ধর্মীয় অন্যান্য বিধিবিধান যেমন : ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, কুফর, শিরক, নবী-রাসূল, ফেরেস্তা, নবুওয়াত রিসালাত খাতমে নবুওয়াত, আসমানী কিতাব, আখিরাত, কিয়ামত, মিযান, শাফায়াত, জান্নাত ও জাহান্নামের মৌলিক বিষয়ের বিধান কুর'আনের বিভিন্ন সূরায় উল্লিখিত হয়েছে।

যাদুকর সম্পর্কে বিধান : তহা : ৬৯।

আল কুর'আনে পারিবারিক আইন সম্পর্কিত আয়াত ৭০টি, দেওয়ানি আইন সম্পর্কিত আয়াত ৭০টি, ফৌজদারি আইন সম্পর্কিত আয়াত ৩০টি, আইন ও বিচার, সাক্ষ্যদান,

Dhaka University Institutional Repository

শপথ ইত্যাদি সম্পর্কিত আয়াত ৯৩ টি। সাংবিধানিক আইন ও শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা সম্পর্কিত আয়াত ১০টি, আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কিত আয়াত ২৫টি, রাষ্ট্রীয় অর্থ আইন সম্পর্কিত আয়াত ১০টি।[৮০]

ঐতিহাসিক মানদণ্ডে কুর'আনের আইন

ঐতিহাসিক ফিলিপ কে হিট্টি আল কুর'আনের আইনগুলোকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "কুর'আনের সূরাহগুলো (অধ্যায়) দৈর্ঘ্যের নিরিখে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী বিন্যস্ত নয়। মক্কার দ্বন্দ্বপূর্ণ সময়ের প্রায় ৯০টি সূরাহর অধিকাংশ ছোট, মর্মভেদী, অগ্নিবর্ষী, আবেগময় ও দিব্য প্রেরণায় পরিপূর্ণ। আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ক্ষমতা, মানুষের নৈতিক কর্তব্য এবং আসন্ন শাস্তির সম্ভাবনা সেগুলোর মূল বিষয়বস্তু। মদিনীয় সূরাহগুলো, বাকি ২৪টি (কুর'আনের সমগ্র বিষয়বস্তুর এক তৃতীয়াংশ) বিজয়ের অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে 'নেমে এসেছিল' (উনজিলাত)। এই সূরাহগুলো ছিল দীর্ঘ ও আইনি উপাদানে সমৃদ্ধ। যেগুলোর মধ্যে প্রার্থনা, উপবাস, তীর্থযাত্রা ও পবিত্রমাসগুলো সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদ ও আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। মদ, শুয়োরের মাংস ও জুয়া নিষিদ্ধকারী আইন, ভিক্ষাদান (জাকাহ) ও পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) সংক্রান্ত আর্থিক ও সামরিক নির্দেশ, নরহত্যা, প্রতিহিংসা, চুরি, তেজারতি, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ব্যভিচার, উত্তরাধিকার ও ক্রীতদাসদের মুক্তিদানসংক্রান্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনসমূহ নিয়েই ওই সমস্ত নিয়মাবলি তৈরি হয়েছে। ২, ৪ ও ৫ নং সূরাহতে এই সমস্ত আইনগত নির্দেশাবলির অধিকাংশ লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহসংক্রান্ত যে নির্দেশটি (সূরাহ ৪ : ৩) প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়, তা বহু বিবাহ চালু করার পরিবর্তে সীমিত করেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদসংক্রান্ত ধারাগুলোকে (৪ : ২৪, ৩৩ : ৪৮, ২ : ২২৯) সবচেয়ে আপত্তিজনক এবং ক্রীতদাস, অনাথ ও আগন্তুক ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, সে সংক্রান্ত নির্দেশনাবলিকে (৪ : ২, ৩, ৪০, ১৬:৭৩; ২৪ : ৩৩) সমালোচকরা ইসলামী আইনের সবচেয়ে মানবিক উপাদান বলে গণ্য করেছেন। ক্রীতদাসের মুক্তিদান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি সন্তোষজনক বলে প্রচার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তা অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে গণ্য করা হয়। সূরাহ ২৪ : ৬ এর মতো

৮০. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য মদিনীয় সূরাহর এখানে-সেখানে অতীতের বাগ্মিতার ও দিব্যচেতনার স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। সূরাহ ২ : ১৭২, ২৫৬ কুর'আনের মহত্তর আয়াতগুলির অন্যতম।[৮১]

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন কুর'আনের আইনি মানদণ্ড সম্পর্ক বলেন, "আটলান্টিক মহাসাগর হতে গঙ্গা পর্যন্ত কুর'আন শুধুই ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্যেই নহে বরং ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের মূল ভিত্তি বলে স্বীকৃত হয় এবং যে আইন মানবজাতির কার্য ও সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাও আল্লাহর ইচ্ছায় অলঙ্ঘনীয় অনুমোদন দ্বারা শাসিত হয়।"[৮২] তিনি আরো বলেন, "জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের কার্যকর বিধান কুর'আনে মজুদ আছে।"[৮৩]

ফ্রান্সের জাতীয় বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কুর'আন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, æI hope the time is not far of when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of the Quran which alone are true and which alone can lead men to happiness."

অর্থাৎ, "আমি আশা করি সে সময় খুব দূরে নয়, যখন সবকটি দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকদের একতাবদ্ধ করতে এবং কুর'আনের নীতিসমূহই যে একমাত্র সত্য ও একমাত্র মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে পারে এবং সেসব নীতির উপর ভিত্তি করে এক সমরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো।"[৮৪]

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার ডায়মন্ডবার্স কুর'আন সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন, কুর'আনের বিধানগুলো শাহানশাহ থেকে আরম্ভ করে জীর্ণ-শীর্ণ কুটিরের অধিবাসী পর্যন্ত সকলের জন্য সমান উপযোগী, কল্যাণকর এবং এতই যুক্তিযুক্ত যে, পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যবস্থায় এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।[৮৫]

---

৮১. ফিলিফ কে হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৮২. মুহাম্মদ সিদ্দিক, *নাস্তিক্যের যুক্তি খন্ডন*, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০২ইং), পৃ. ১১৭।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০ ।

৮৫. Mouluvi Nur Ahmed, captain k. M. A. Rab. *Islam and is holy prophet as judged by the non Muslim world*, (Dhaka : Islami foundation, 1994). p. 29.

Dhaka University Institutional Repository

Mr. Hartwing Hirschfield Ph.D, তার Researches into the Composition and Exegesis of the Quran নামক গ্রন্থের ৯ পৃ. উল্লেখ করেন, æWe must not be surprised to find the Quran, the fountain head of the sciences. Every subject connected with haven or earth, human life, commerce, various trades are occationally touched upon, and this gave rise to the production of numerous monographs forming Commentaries on parts of the holy book. In this way the Quran was responsible for great discussion and to it indirectly is due the marvellous development of all branches of sciece in the Muslim World"

অর্থাৎ "আল-কুর'আনকে সমস্ত বিজ্ঞানের উৎসমূল হিসেবে পেয়ে আমাদের আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই। ইহলৌকিক অথবা পরলৌকিক, মানবজীবন, বাণিজ্য ও নানাবিধ ব্যবসাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে এতে মাঝে মধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে এবং ইহা বিভিন্ন প্রকার বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ জুগিয়েছে, যার মাধ্যমে পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন শাখার ভাষ্যগ্রন্থ উৎপত্তি লাভ করেছে। এভাবে আল কুর'আন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রতি দায়িত্বপূর্ণ ছিল। মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানের সকল শাখার অভূতপূর্ব উন্নতির এটাই পরোক্ষ কারণ।"[৮৬]

২. সুন্নাহ

নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌন অনুমোদনকে সন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহ ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস। ইসলামী শারী'আতে কুর'আনের পরেই সুন্নাহ এর স্থান। শারী'আতের মাসআলা নির্ধারণে সুন্নাতের গুরত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর নবুওয়তী জীবন সম্পর্কে জানা, বুঝা এবং সে অনুযায়ী কার্য পরিচালনার জন্য হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্নাহ পরিচিতি

সুন্নাহ শব্দটি কর্মপন্থা, পদ্ধতি, রীতি- নীতি, পদ্ধতি, স্বভাব, আচরণ, পরিণতি, বিধান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮৭]

---

৮৬. আবু নাঈম মোঃ মফিদুল ইসলাম, *মানব রচিত আইন বনাম ইসলামী শরীয়াত*, (ঢাকা : ইফাবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০২), পৃ. ২৯-৩০।

৮৭. ইব্ন মানযূর, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ.৩৯৫-৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল মুফরাদাত গ্রন্থের প্রণেতা গরীবুল কুর'আনে উল্লেখ করেন, السنن শব্দটি سنة শব্দের বহুবচন। আর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, এ কথার অর্থ রাসূল আদর্শ যা তিনি পালন করতেন। আল্লাহর সুন্নাত এ কথার অর্থ, আল্লাহর পথ ও পদ্ধতি, তার হিকমত এবং তার আনুগত্যের নিয়ম ও পদ্ধতি। "সুন্নাহ' এ অর্থেই কুর'আন ও হাদীসে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَن فَسِيرُوْا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ـ

"তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে অনেক ধরনের জীবন পদ্ধতি, রীতি ও নীতি। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ- যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে।[৮৮]

অত্র আয়াতে سُنَنٌ শব্দটি سنة সুন্নাহ এর বহুবচন, এ শব্দটি এখানে জীবন পদ্ধতি ও রীতি-নীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নাহ سنة শব্দটি একই অর্থে হাদীসেও বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রীতি-নীতি বিঘতে-বিঘত, হাতে-হাত অর্থাৎ হুবহু অনুসরণ করবে, এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে একই গর্তে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা? তিনি বললে, তাহলে আবার কারা?"[৮৯]

এ হাদীসে لتتبعن سنن এর মধ্যে سنن শব্দটি সুন্নাহ [سنة] অর্থাৎ রীতি-নীতি ও জীবন পদ্ধতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ আরও বহু হাদীসে এসেছে। "উসূলবিদদের

---

৮৮. আল কুর'আন, ৩ : ১৩৭।

৮৯. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী, *আস সহিহ* (বৈরূত : দারে এহইয়া আত তুরাস আল আরাবী, তাবি), খ. ৪, পৃ. ২০৫৪, হাদীস নং : ২৬৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষায়, সুন্নাহ হলো ঐ সকল উক্তি, কাজ বা স্বীকৃতি যা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত। অর্থাৎ যা দ্বারা কোন শারী'আ হুকুম প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯০]

মুহাদ্দিসগণের মতে, তাই হলো সুন্নাত যা শারী'আতের দলীলরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। হয় তা কুর'আনে থাকুক, অথবা নবী করীম (সা.) হতে বর্ণিত হয়ে থাকুক, কিংবা তা সাহাবা কেরামের ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকুক।[৯১]

মহানবী (সা.)-এর ইশারা, ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি অথবা তিনি যেসব কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন, সবকিছুই উসূলবিদগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আবূ বকর (রা.) ইমামতি অব্যাহত রাখার জন্য মহানবী (সা.)-এর ইশারা, বিভিন্ন সম্রাটের কাছে লেখা তাঁর পত্র।

সুন্নাহ ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে দু'টি মত বিদ্যমান। জমহুরের মতে, হাদীস বলতে শুধু মহানবী (সা.)-এর বাণীকে বুঝায়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের চেয়ে সুন্নাহ ব্যাপক এবং হাদীস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। অন্য মত অনুযায়ী হাদীস দ্বারা মহানবী (সা.), সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি বুঝায়। এ দৃষ্টিতে হাদীস ব্যাপক অর্থবোধক এবং সুন্নাহ হাদীসের একটি অংশবিশেষ।[৯২]

সুন্নাহ শব্দটি বিদআতের বিপরীত। সুন্নাহ শারী'আত অনুমোদিত আর বিদআত শারী'আতনিষিদ্ধ পদ্ধতি।[৯৩]

সুন্নাহর সংজ্ঞায় কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন, কুর'আন ব্যতীত মহানবী (সা.) থেকে প্রকাশিত বাণী, কর্ম ও মেন সম্মতিই সুন্নাহ। অর্থাৎ তারা 'কুর'আন ব্যতীত' শব্দটি যোগ করেছেন এই যুক্তিতে যে, কুর'আন রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রকাশিত নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি জিরাইল থেকে তা গ্রহণ করে উম্মতের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন।

---

৯০. ড. মুসতাফা হুসনী আস্-সুবায়ী, *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, অনু. এ,এম,এম সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ১।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৯২. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-মুআফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ* (মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, তাবি), খ. ৪, পৃ. ৪।

৯৩. ইবন বাদরান হাম্বালী, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ* (মিসর : আল-মাতবাআতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৯২৭), পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহগণের পরিভাষায় ফরজ ও ওয়াজিব ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে যে শারয়ী হুকুম প্রমাণিত তা হলো সুন্নাহ। শারী'আতের পাঁচটি হুকুমের মধ্যে সুন্নাহ ফরজ ও ওয়াজিব এর মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়।[৯৪]

শারী'আতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ

প্রথমত : এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের ঘোষণা নিম্নরূপ :

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا--

(১) "এবং রাসূলুল্লাহ তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।"[৯৫]

وَاَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- -

(২) তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য কর, নিশ্চয়ই তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।[৯৬]

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ ۖ وَمَن تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا- -

(৩) যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করল বস্তুত সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[৯৭]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمْ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ--

(৪) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা একান্তই আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।[৯৮]

এছাড়াও যে সকল আয়াতে সুন্নাহকে শারী'আতের উৎস হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো : সূরা আলে ইমরান : ৩২, সূরা আনফাল : ২৪, সূরা নূর : (৪৭-৫৪), ৬২, আল আহযাব : ৩৬। সূরা নূর : ৬২ ও ৬৩।

---

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৯৫. আল কুর'আন ৫৯ : ৭।

৯৬. আল কুর'আন ৩ : ১৩২।

৯৭. আল কুর'আন ৪ : ৮০।

৯৮. আল কুর'আন ৩ : ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

একথা মুসলিম উম্মাহর আকিদা যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্ব প্রকারের ভুল-ত্রুটি ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত। তার প্রতিটি কথা, কাজ ও অনুমোদন শারী'আতের অকাট্য দলীল। এটি ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তিনি [মুহাম্মদ (সা.)] খেয়ালের ছলে কথা বলেন না। বরং তা ওহী যা নাযিল করা হয়।" আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যে পদ্ধতিতেই হোক মানুষের নিকট তার আহকাম পৌঁছানোর অধিকার দিয়েছেন। চাই তা ওহীয়ে মাতলু দিয়ে হোক কিংবা ওহীয়ে গায়রে মাতলু দিয়েই হোক।

দ্বিতীয়ত : এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শারী'আতের বুনিয়াদ দুটি বস্তুর দ্বারাই গঠিত। প্রতমত: কিতাবুল্লাহ; দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ। সুন্নাহতে এমন আহকাম রয়েছে যা কুর'আনে বর্ণিত হয়নি, তাছাড়া সুন্নাহ দ্বারা যে সব আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তা কুর'আনের প্রতিষ্ঠিত আহকামের ন্যায় গ্রহণ করা ওয়াজিব। তন্মধ্যে একটি হাদীস এই যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিকটবর্তীকালে তোমাদের মধ্যে কতক লোক এ বলবে যে, আল্লাহর এ কিতাব এতে যা কিছু হালাল আমরা তা হালাল মানব, যা কিছু হারাম আছে তা আমরা হারাম বলব। তোমরা স্মরণ রাখবে, যে কারো নিকট আমার কোন হাদীস পৌঁছল আর সে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং যে ব্যক্তি তার নিকট হাদীস পৌঁছাল তাঁকেও মিথ্যা সাব্যস্ত করল।[৯৯]

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদিছে বর্ণিত হয়েছে যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়ামেনে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মু'আজ বিন জাবাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَايِىْ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِه بِمَا يَرْضٰى بِه رَسُوْلُه -

মু'আজ তুমি কী দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? তিনি (মু'আজ) বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব দিয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু'আজ (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ দিয়ে। মহানবী (সা.) বললেন, যদি আল্লাহর

৯৯. ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতেও না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, আমি আমার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পূর্ণ চেষ্টা করব এবং মোটেই অবহেলা করব না। মহানবী (সা.) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফিক দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর পছন্দনীয়।[১০০]

তৃতীয়ত : আল কুর'আনের ন্যায় সুন্নাহের অনুসরণকে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ -

"আমি তোমাদের কাছে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ বিষয় দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। বিষয় দু'টি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"[১০১]

চতুর্থত : ওলামায়ে কেরামের মতে, সুন্নাহ শারী'আতের উৎস। এক্ষেত্রে পদ্ধতি হল, কুর'আনের আয়াত সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আর সুন্নাহ তা বিশ্লেষণ করে। কুর'আনের মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত আহকাম কিভাবে কার্যকর হবে, সুন্নাহ সে অবস্থা বর্ণনা করেছে। সুতরাং সালাত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়, রুকু সাজদা এবং সালাতে অন্যান্য আহকাম সুন্নাহর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। এমনিভাবে যাকাত সম্পর্কিত আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন মালে যাকাত দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, যাকাতের পরিমাণ কত, কোন সময় দিতে হবে, কেন যাকাত দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে সাওম সম্পর্কিত বিধিবিধান, হাজ্জের নিয়ম-কানুন, কুরবানীর নিয়মাবলী, বিবাহ-তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, অপরাধের শাস্তি, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি সম্পর্কিত কুর'আনের মুজমাল আয়াতের বিস্তারিত সমাধান সুন্নাহর মাধ্যমে

---

১০০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬০৮, হাদীস নং : ১৩২৭।

১০১. মালেক বিন মালেক বিন আনাস বিন আমের মাদানী, *আল মুয়াত্তা* (বৈরূত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, তাবি), খ. ৫, পৃ. ১৩২৩, হাদীস নং-৩৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাব্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুন্নাহের এ সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক আহকাম কুর'আনের সাথে সম্পৃক্ত যার প্রমাণ আল-কুর'আনের এই আয়াত।

وَاَنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ "আমরা আপনার প্রতি এই কুর'আন নাযিল করেছি যাতে আপনি লোকদের নিকট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে পারেন, যা তাদের জন্যই নাযিল হয়েছে।"[১০২]

ইমাম আওযায়ী বলেছেন, الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب-

অর্থাৎ "কুর'আন সুন্নাহর প্রতি তার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী যতটুকু সুন্নাহ কুর'আনের প্রতি মুখাপেক্ষী।"[১০৩] ইমাম আওযায়ীর উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে আব্দুল বার মালেকী বলেন, সুন্নাহ কুর'আনের অর্থ ও মর্মের ফয়সালা এবং তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে।

ইমাম আহমদ (রা.) কে ان السنة قاضة على الكتاب হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি এসব কথা বলার সাহস করতে পারি না, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, সুন্নাহ কুর'আনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, "সুন্নাহ না হলে আমাদের কেউ কুর'আন বুঝতো না।"

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, "মুসলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যখন কারো কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয় তখন তার জন্য অপর কারো কথার ভিত্তিতে সে সুন্নাহ পরিহার করা জায়েয নয়।"[১০৪]

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "যা কিছু কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তা গ্রহণ কর আর যা কিছু এ দুইয়ের বিরোধী হয় তা বর্জন করো।"[১০৫]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, সে যেন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ায়।"[১০৬]

---

১০২. আল কুর'আন, ১৬ : ৪৪।

১০৩. ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

১০৪. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন* (আল কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০১), খ. ১, পৃ. ৬৩।

১০৫. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯।

১০৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নাহ্য় আইনের পরিধি

মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কুর'আনের পাশাপাশি সুন্নাহয় সন্নিবেশিত হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের সমাধান সুন্নাহয় আলোচিত হয়েছে। ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ফৌজদারি, দেওয়ানি ও পারিবারিক, যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিধিবিধান, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, মুআমালাত (সামাজিক আচরণ), হালাল-হারামের বিধান, আদত (অভ্যাস) ও আখলাক (চরিত্র) সম্পর্কিত বিধিবিধান আল কুর'আনের পাশাপাশি সুন্নাহ তথা হাদীসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। এরূপ হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ এবং এ হাদীসগুলো প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় আচরণ এবং আইন বিজ্ঞানের উপাদান সম্বলিত।

আল কুর'আনের বিচার ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ও ব্যবহারিক রূপরেখা সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিচার ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিচারালয় ও এর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বিচারক নিয়োগ, বিচারকের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ, জবাবদিহিমূলক বিচারালয়, প্রক্রিয়া অনুসরণ, যেমন– অভিযোগ দায়ের, সমনজারী, সাক্ষ্য গ্রহণ, শপথ, আপোষ রফা, পারিপার্শ্বিক বিবেচনা, রায় ঘোষণা ও কার্যকরণ, বন্দী বা আটকাদেশ জারী, বিচারকার্যে জবাবদিহিতা ও তদারকি এসব বিষয়ের সমাধান সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুন্নাহর বিচার কার্যক্রমের শ্রেণি বিন্যাস

বর্তমানে বিচার কার্যক্রম বা আদালতকে বিভিন্ন আঙ্গিকে শ্রেণি বিন্যাস করা হয়। যেমন: কারো অধিকার আদায়ে দেওয়ানি আদালত, অপরাধের শাস্তি বিধানে ফৌজদারি আদালত, সামরিক কোন বিষয় সমাধানের জন্য সামরিক আদালত, আন্তর্জাতিক কোন বিষয় সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত। বিশেষ কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, তাৎক্ষণিক বিভিন্ন বিচার ফয়সালার জন্য মোবাইল কোর্ট আদালত ইত্যাদি বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় প্রচলিত। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার এসব নীতি পদ্ধতির অনেকটাই সুন্নাহর নিকট দায়বদ্ধ।

সুন্নাহর মাধ্যমে আইনের প্রায় সকল ধারা অনুসৃত হয়েছে। ফৌজদারি বিচার কার্যক্রম যেমন : মানব হত্যার শাস্তি বিধান, অঙ্গহানির কিসাস, ব্যভিচারের শাস্তি বিধান, ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি বিধান, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির শাস্তি বিধান, মুরতাদ বা ইসলাম ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যাগকারীর শাস্তি বিধান, মাহরাম মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার শাস্তি বিধান, সাক্ষী সম্পর্কিত বিধানসহ মৌলিক ফৌজদারি দণ্ডবিধি কুর'আনের পাশাপাশি হাদীস দ্বারা বিস্তারিতভাবে সাব্যস্থ হয়েছে।

দেওয়ানি বিচার কার্যক্রমের আওতাধীন যেমন, সমাজের নাগরিকদের পারিবারিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও জমিজমা, ওয়াকফ, ওসীয়ত উত্তরাধিকার নীতিসংক্রান্ত বিষয়ের বিবাদসমূহের সমাধান সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের বিধানের উল্লেখ করা হলো :

ক. ফৌজদারি বিচার কার্যক্রম

	অপরাধের ধরণ	**বিধানের উল্লেখ**
১	ইচ্ছাকৃত হত্যা	সহীহ বুখারীর দিয়াত অধ্যায় ও সুনানে তিরমিযীর দিয়াত অধ্যায়
২	অনিচ্ছাকৃত হত্যা	সুনানে তিরমিযি, দিয়াত অধ্যায়
৩	অঙ্গহানি	সহীহ বুখারী, দিয়াত অধ্যায় ও সুনান তিরমিযি, দিয়াত অধ্যায়
৪	ব্যভিচার	সুনান তিরমিযি, কিতাবুল হুদূদ, সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদূদ
৫	ব্যভিচারের অপবাদ (কাযফ)	ইমাম কুরতবী, আকদিয়াতুর রাসূল (সা.) নামক কিতাব
৬	চুরির	সহীহ মুসলিম কিতাবুল হুদূদ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল হুদূদ
৭	নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি	সুনান তিরমিযি, কিতাবুল হুদূদ সহীহ বুখারী কিতাবুল হুদূদ
৮	মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী)	সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কাসামাহওয়ালা মুহারিবীন, ইমাম কুরতুবী, আকদিয়াতুর রাসূল (সা.)
৯	মাহরাম মহিলার সাথে বিবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী	সুনানে নাসায়ী, কিতাবুন নিকাহ
	খ. দেওয়ানি বিচার	
	বিবাদ	**বিধানের উল্লেখ**
১	বিবাহের আকদ সম্পর্কিত মামলা	সহীহ বুখারী, কিতাবুল নিকাহ
২	নাফাকা (খোরপোষ) সম্পর্কিত বিবাদ	সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কাদা ওয়াল আহকাম, সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম।
৩	সন্তানের মালিকানা সম্পর্কিত বিবাদ	সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু।

Dhaka University Institutional Repository

৪	স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত যিনার অভিযোগ সম্পর্কিত মামলা	সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, পরিচ্ছেদ : লিআন ও লিআনের পর তালাক দেয়া। সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ : লিআন।
৫	সন্তান লালন-পালন সম্পর্কিত মামলা	আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ : মান আহাক্কু বিল- ওয়ালাদ।
৬	খুলা বা স্ত্রীর পক্ষ দায়েরকৃত বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা	মুওয়াত্তা, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ : বাব মা জাআ ফিল খুল। নাসঈ, কিতাবুন নিকাহ।
৭	জমিজমা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি	সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল আহকাম। আবু দাউদ, কিতাবুল কাদা।
৮	ক্রয়-বিক্রয় তথা বাণিজ্যিক মামলা সংক্রান্ত	সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু।
৯	ফারাইজ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান	সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফারায়েজ।
১০	সামরিক বিষয়সংক্রান্ত নিষ্পত্তি	সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজী।
১১	যুদ্ধের গোপনীয়তা ফাঁস সংক্রান্ত নিষ্পত্তি	সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাতিল মুআনিদান ওয়াল মুরতাদ্দান।
১২	গনিমাতের মাল বণ্টনের বিরোধ নিষ্পত্তি	সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব

সুন্নাহর বিচার পক্রিয়া

বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহানবী (সা.) বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করতেন এবং অন্যদেরকেও সে নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। মহানবী (সা.)-এর বিচার কার্যক্রমের একটি পক্রিয়া নিম্নরূপ :

(১) অভিযোগ দায়ের বা আরজি পেশ বা চার্জশিট দাখিল

(২) সমন জারি

(৩) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান

(৪) সাক্ষী গ্রহণ ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন

(৫) হলফ বা শপথ করানো

(৬) স্বীকারোক্তি আদায়

(৭) পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা ও মাঠ পর্যায়ে খোঁজ-খবর নেয়া

(৮) সন্দেহের সুযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তি ভোগ করবে

Dhaka University Institutional Repository

(৯) রায় পুনর্বিবেচনার অনুমতি ও রায় কার্যকরণ এ সকল পক্রিয়া সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ড, চুরির অপরাধে হস্ত কর্তন, বেত্রাঘাত ও নির্বাসন, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, আটকাদেশ ও বন্দী করা, শাস্তি প্রয়োগ না করার সুপারিশ নিষিদ্ধকরণ, বিচারকের প্রশিক্ষণ, বিচারকার্যে জবাবদিহিতা ও তদারকি, বিচারকের আচরণবিধি, শাস্তি কার্যকর করার মত মৌলিক ধাপগুলো সুন্নাহয় প্রমাণিত।[১০৭]

হাদীসের অনন্য সাধারণ ও মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বজন স্বীকৃত, বিশুদ্ধ, গ্রহণযোগ্য ও ইজমায়ে উম্মার দ্বারা সত্যায়িত গ্রন্থগুলো হলো সিহাহ সিত্তাহ। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, জামেউত তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহর মত গ্রন্থগুলোকে আইনের অন্যতম উৎস বলে বিবেচনা করা হয়।

৩. ইজমা

ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের চারটি শাশ্বত মৌল উৎসের মধ্যে ইজমার স্থান তৃতীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন ইসলামী আইনের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলিম উম্মাহ নতুন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ উক্ত পরিস্থিতির সমাধান দিতেন, নতুবা মহানবী (সা.) তাঁর বিধান নির্ধারণ করতেন। এ কারণে তাঁর যুগে ইজমার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তাঁর ইন্তিকালের পর নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা সামনে রেখে সামষ্টিক ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার সূচনা হয়। ইসলামী শারী'আতের এ উৎসমালা মানবজীবনের সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। কেননা, এটা যুগে যুগে নতুন সত্যের জন্ম দিয়েছে। অভিনব সত্যের সন্ধান দিতে সমর্থ হয়েছে। কুর'আন ও হাদীস দ্বারা ইজমার গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রমাণিত। এটি আইনের এমন একটি উৎস যা উম্মাহর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মত যা উম্মাহ দ্বারা স্বীকৃত ও সমন্বিত। এ ধরনের আইন সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইসলামী আইনের এ উৎসমালা মানবজীবনের সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। কুর'আন মজিদে ইজমার ইরশাদ হয়েছে–

---

১০৭. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩), খ. ৫, পৃ. ৫৮১-৫৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরিকদের জমায়েত কর।"[১০৮]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতের প্রতি অগাধ আস্থা স্থাপনের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন-

اِنَّ اُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلٰى ضَلَالَةٍ، فَاِذَا رَاَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ ـ

"আমার উম্মাত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর ঐকমত্য ঘোষণা করবে না। যখন তোমরা উম্মতের মাঝে মতপার্থক্য দেখবে তখন বড় জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।"[১০৯]

ইজমার পরিচয়

اِجْمَاعٌ (ইজমা) শব্দটির অর্থ, সাধারণকরণ, সার্বজনীনকরণ, ব্যাপককরণ, সংকল্প, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।[১১০] পবিত্র কুর'আনে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।

মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন–

اَلْاِجْمَاعُ فِيْ الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ص) فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰى اَمْرٍ قَوْلِيٍّ اَوْ فِعْلِيٍّ-

অর্থাৎ কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মদীর সৎকর্মশীল মুজতাহিদগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে শারী'আতের পরিভাষায় ইজমা বলে।

আল্লামা মোল্লাজিউন বলেন,

هو اتفاق مجتهدين صالحين من امة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر واحد على امر قول او فعل ـ

"একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো বাচনিক অথবা কর্মসূচক ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।"[১১১]

---

১০৮. আল কুর'আন, ১০ : ৭১।

১০৯. আবু আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৩০৩, হাদীস নং : ৩৯৫০।

১১০. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১১১. আহমদ মোলণ্ডাজিউন, *নুর"ল আনওয়ার* (দিলণ্ডী : রশিদীয়া কুতুবখানা, তাবি), পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ তাকী আমীনী বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মাহর মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার নাম ইজমা।[১১২]

ইমাম শাওকানী বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর উম্মাতের প্রতি যে অগাধ আস্থা স্থাপনের কথা ব্যক্ত করেছেন, উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে তাই প্রমাণিত হয়। তবে আস্থা সার্বজনীন হতে পারে না। এ কথাই ফকীহগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "ইজমার ক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে সাধারণ মানুষের বক্তব্য মূল্যহীন-গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সবাই শারী'আতের ব্যাপারে গভীর দূরদৃষ্টির অধিকারী নয়, তাদের দলীল-প্রমাণ অনুধাবনের ক্ষমতাও সবার থাকার কথা নয়।"[১১৩]

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন "কেবল মদীনাবাসী ফিকহবিদগণের ইজমাই গ্রহণযোগ্য, অপর কারো ইজমা নয়।"

ইমাম দাউদ যাহিরী (রহ.) বলেন, "কেবল সাহাবা কিরামের ইজমা-ই ইসলামী শারী'আতের উৎস, অপর কারো ইজমা নয়।"

সর্বোপরি, রাসূলে কারীম (সা.)-এর পর কোনো এক সময়কার মুসলিম উম্মাতের সমস্ত মুজতাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শারী'আতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, পরিভাষায় তা-ই হলো ইজমা।

ইজমার ভিত্তি

আল কুর'আনের প্রমাণ : আল কুর'আনে ইজমা শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে :

فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ -

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদের জামায়েত করে।"[১১৪]

নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ইজমার ভিত্তি :

---

১১২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৫০।

১১৩. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল লি তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল* (রিয়াদ : দারুল ফাদীলাহ, তা.বি.), পৃ. ৯৭।

১১৪. আল কুর'আন, ১০ : ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَاِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূল (সা.)-এর এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর নিকট সোপর্দ কর।"[১১৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেক মুফাসসিরের মতে, اولى الامر দ্বারা উলামা ও মাশায়েখ উদ্দেশ্য। আল কুর'আনের সূরা নিসার ৮৩, ১১৫ ও সূরা আল-বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে ইজমার ইঙ্গিত রয়েছে।

সুন্নাহয় ইজমার প্রমাণ : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اِنَّ اُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَاِذَا رَاَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ -

"আমার উম্মাত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর ঐকমত্য ঘোষণা করবে না। যখন তোমরা উম্মতের মাঝে মতপার্থক্য দেখবে তখন বড় জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।"[১১৬]

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম উম্মাহ কখনো ভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে না; বরং তারা সামগ্রিকভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

কুর'আন নির্ভর ইজমার উদাহরণ

১. আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত ইজমার ঐতিহাসিক দলীল।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ।"[১১৭]

এ আয়াত দ্বারা মায়ের মা (নানী) পিতার মা (দাদী) স্ত্রীর মা (শাশুড়ি)-কেও শামিল করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী নানী দাদী ও শাশুড়ি বিয়ে করা হারাম প্রমাণিত হয়।

সুন্নাহনির্ভর ইজমার উদাহরণ

---

১১৫. আল কুর'আন, ৪ : ৫৯।

১১৬. ইবনে মাজাহ, *আস সুনান*, প্রাগুক্ত, ৩৯৫০।

১১৭. আল কুর'আন, ৪ : ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বেচাকেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক পণ্য গ্রহণ না করে পুনরায় তা বিক্রি করা জায়েয না হওয়া সংক্রান্ত ইজমা। এ ইজমার ভিত্তি হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী : "যে ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করল, সে তা হস্তগত না করা পর্যন্ত যেন বিক্রি না করে।"[১১৮]

কিয়াসনির্ভর ইজমার উদাহরণ

মহানবী (সা.) -এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রা.) এর ইমামতি করার উপর কিয়াস করে তাকে খলীফা বানানোর ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা।

সাহাবীদের ইজমার উদাহরণ

তারাবীহের সালাত জামাআতে আদায়ের বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবে সাহাবা কিরামের সম্মতি ইজমার ঐতিহাসিক দলীল।

ইজমার রুকন

ইজমার রুকন দুই প্রকার। যথা :

ক. আযীমাত : আযীমাত হচ্ছে এমন এক ধরনের ইজমা যাতে মুজতাহিদগণ এমন শব্দ ব্যবহার করবেন যার দ্বারা তাদের সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রমাণিত হয়। যেমন বিষয়টি যদি বাচনিক হয় তাহলে তারা এরূপ বলবেন, "আমরা সবাই এর উপর একমত অথবা তারা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজটি শুরু করে দেবেন, যদি তা একই শ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি ঐ কাজটি কার্য সম্পর্কিত হয়। যেমন, মুজতাহিদগণ যখন মুশারাকাত, মুযারাআত ও অংশীদারী কারবার নিজেরা শুরু করে দেবেন তখন, এটাই প্রমাণ করবে যে, এই কাজগুলো শারী'আতসম্মত ও বৈধ হওয়ার বাপারে ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে।[১১৯]

খ. রুখসাত : ইজমায়ে রুখসাত হচ্ছে এরূপ যে, মুজতাহিদগণের মধ্য থেকে কারো কারো কথা ও কাজ দ্বারা ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে এবং কারো দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ কোন কথা কিংবা কাজের উপর ঐকমত্য হবেন এবং অন্যান্য মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি প্রকাশ না করে নীরব থাকবেন। একে

---

১১৮. ড. হাসান আলী আশ-শায়বানী, *আল-মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী*, তাবি, পৃ. ৪৪৭।

১১৯. লেখকম"লী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইজমায়ে সুকুতী বা নীরব ইজমা বলা হয়।[১২০] ইজমা মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত। ইজমার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া উম্মাহর জন্য ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে ইজমাকে কোন কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। যে কোন কালে পূর্বতন ইজমার অনুরূপ কোন সমস্যার উদ্ভব হলে পরবর্তী যুগেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।[১২১]

৪. কিয়াস

ইসলামী শারী'আতই মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব সমস্যার সমাধান কল্পে কুর'আন হাদীস ও ইজমার কোনো নির্দেশনাই নেই, সেসব সমস্যার সমাধান কল্পেই ইসলামে কিয়াসের প্রবর্তন করেছে। কিয়াস এর উপর ভিত্তি করে শারী'আতের বহু মাসয়ালার সমাধান করা হয়েছে।

কিয়াসের পরিচয়

কিয়াস অর্থ অনুমান করা, সামঞ্জস্য করা, সমন্বিত করা, যুক্ত করা, মাপ, পরিমাপ, অনুপাত, নমুনা, সাদৃশ্য, নিয়ম ইত্যাদি।[১২২] সুতরাং কিয়াস (القياس) শব্দের বাংলা অর্থ হলো- অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় কুর'আন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। কিয়াসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **ড. আব্দুল করীম যায়দান** বলেন : "যে বিষয়ের বিধানে কোনো নস (نص) বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে 'নস' (نص) বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের ইল্লাতের (কার্যকারণ) ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।"[১২৩]

---

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

১২১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), খ. ১, পৃ. ৪৩।

১২২. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুত, পৃ. ৮২০।

১২৩. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ*, (বৈর"ত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, তাবি), পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইবনুল হাজিব সংক্ষেপে বলেছেন, "বিধানের ইল্লাতের দিক থেকে শাখা-প্রশাখা মূলের অনুরূপ হওয়া।"[১২৪]

বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ (রহ.) বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শারী'আতের 'নস' (نص) বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা, যার সম্পর্কে শারী'আতের 'নস' (نص) ভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে তাকে কিয়াস বলা হয়।[১২৫]

উসুলূল ফিকহির অনুসারে, হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলে।[১২৬] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কিত বিধান শারী'আতের বিদ্যমান নেই কিন্তু উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় সম্পর্কিত আইন আছে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলীর কারণসমূহ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর উক্ত কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয়সমূহের মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ঐ একই দিকে বিধান প্রযোজ্য হবে।[১২৭]

কিয়াসের উদাহরণ

ক. আল কুর'আনের সূরা আল মায়েদার ৯০-৯১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মদকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে 'খামর' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। খামর (خمر) শব্দের অর্থ আঙুরের রস থেকে তৈরি করা মদ, যা নেশা সৃষ্টি করে। সুতরাং এ শব্দের কিয়াস করে নেশা বা মাতলামি সৃষ্টিকারী অন্যান্য বস্তুগুলোকেও খামার-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন মুজতাহিদগণ। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে জুয়াকেও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। জুয়া হারাম ঘোষিত হওয়ার কারণ হলো, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়া। ঠিক একই কারণ লটারির মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই জুয়ার উপর কিয়াস করে

---

১২৪. শামসুদ্দীন মাহমুদ ইবন আবদুর রমান ইবন আহমদ আল-ইস্পাহানী, *বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখতাসারি ইবনুল হাজিব*, (মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি), খ. ৩, পৃ. ৫।

১২৫. বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী* (বৈরুত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ১৮২।

১২৬. লেখকমন্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮।

১২৭. আহমদ মুলণ্ঢাজিউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

লটারি ও এ ধরনের প্রতারণামূলক আর্থিক পদ্ধতি শারী'আতে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে ভাগ্য নির্ণয়ক শরকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ শব্দ থেকে কিয়াস করে ভাগ্য গণনা, রাশি দেখা, রাশিফল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডও হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে গণকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

খ. জুমুআর দিন আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা কুর'আনের সূরা জুমু'আর আয়াত দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এ আয়াতের উপর কিয়াস করে ইজারা ধার-কর্জসহ যত কাজ মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখবে, সব কাজই আযানের পর মাকরূহ বলে একই কারণে গণ্য হবে।

গ. ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য শারী'আতের নির্দিষ্ট শাস্তি মদ্যপায়ীর প্রতি কিয়াস করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে কিয়াস নির্ভর এ আইনটি ছিল নিম্নরূপ :

نُطْبِقُ عَلٰى شَارِبِ الْخَمْرِ حُكْمُ الْمُفْتَرِىْ لانَّه اِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَاِذَا هَذٰى اِفْتَرَاى وَعَلَى الْمُفْتَرِىْ ثَمَانُوْنَ جِلْدَةً ـ

"মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য নির্দিষ্টদণ্ড মদ্যপায়ীর উপরও আমরা আরোপ করব, কেননা যখন কেউ মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়। আর নেশাগ্রস্ত হলে সে বাজে বা অশালীন কথা বলে। আর যখন বাজে কথা বলে তখন সে মিথ্যা কথাও বলে। আর মিথ্যা দোষারোপকারীর জন্য শারী'আতের দলীল অনুযায়ী আশিটি বেত্রাঘাত দেয়ার শাস্তি।"[১২৮]

ইসলামী শারী'আতে তাই মদ্যপ ব্যক্তির শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত যা এক কিয়াসনির্ভর দলীল। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু মুসা আল আশয়ারী (রা.)-কে বলেছিলেন–

اَعْرِفِ الاَمْثَالَ وَالاَشْبَاهَ وَقِسِ الأُمُوْرَ عِنْدَكَ- ـ

"সাদৃশ্যপূর্ণ ও পরস্পর তুলনাযোগ্য বিষয়াদি চিনতে ও জানতে চেষ্টা কর এবং তোমার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়াদি তার উপর রেখে বিবেচনা (কিয়াস) কর।"[১২৯]

শারী'আ আইনের লক্ষ্যও কিয়াস

---

১২৮. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সকল বিধানই মানব কল্যাণে প্রণীত। যদি কখনো এমন অবস্থা হয় যে, এমন কোন মাসয়ালা যার ব্যাপারে নস (কুর’আন-হাদীস) নেই, সে মাসআলাটি যদি যে মাসআলার ব্যাপারে নস আছে তার সমকক্ষ হয় এবং উভয় মাসআলায় একই কার্যকরণ বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় ইনসাফের দাবি হচ্ছে, মানব কল্যাণের স্বার্থে উভয় মাসআলার একই হুকুম হওয়া, যা ইসলামী শারী‘আতের মূল লক্ষ্য।

কুর’আন ও হাদীসে ইসলামের মূলনীতি আলোচিত হয়েছে কিন্তু মানুষের সার্বিক সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা স্থান পায়নি। অথচ মানুষের সকল সমস্যার বিস্তারিত সমাধান একান্ত আবশ্যক। এ কারণে অসংখ্য সমস্যার সমাধানের উৎস হিসেবে কিয়াসকে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, যাতে ভবিষ্যতে যত সমস্যাই মানুষের সামনে আসবে সব সময়ই শারী‘আতসম্মত সমাধান দেয়া অনায়াসে সম্ভব হয়। আর তখনই ইসলামী শারী‘আত সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সার্বজনীন আদর্শ হিসেবে গণ্য হবে।[১৩০]

৫. ইসতিহ্সান

ইসলামী শারী‘আতের মৌলিক চারটি উৎসের পরের ধাপগুলোর অন্যতম ইসতিহ্সান।

‘ইসতিহ্সান’-এর অর্থ কোনো বস্তুকে উত্তম ও ভালো মনে করা। **মুহাম্মদ তাকী আমীনী** বলেন, “ইসতিহ্সান হলো কোনো বিষয়ের হুকুমকে তার নযীরসমূহ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির কারণে পৃথক করে নেয়া।”[১৩১]

মওলানা আবদুর রহীম (রহ.) বলেন, “একটি সামগ্রিক হুকুম বাদ দিয়ে এমন কোনো দলীলের ভিত্তিতে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী হুকুমের দিকে মুজতাহিদের প্রত্যাবর্তন করা, যা এই প্রত্যাবর্তনকে তার নিকট অগ্রাধিকারী বানিয়ে দিয়েছে তাকে ইসতিহ্সান বলা হয়।[১৩২]

ফকীহগণের পরিভাষায় কোন বিষয়ের দুটো দিকের মধ্য থেকে একটি দিককে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়ার নাম ইসতিহ্সান।[১৩৩]

---

১৩০. সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

১৩১. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৪৯।

১৩২. মওলানা আবদুর রহীম (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১৩৩. লেখকমন্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

নূরুল আনোয়ার গ্রন্থকার বলেন : "যদি প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুকুম কামনা করে, আর হাদীস বা ইজমা অথবা গোপন কিয়াস এই কথার বিপরীত কামনা করে, এমতাবস্থায় কিয়াস ত্যাগ করে বিপরীত হুকুমের উপর আমল করাকে ইসতিহসান বলা হয়।"[১৩৪]

ইসতিহসানের ভিত্তি

ইসতিহসান কুর'আন ও হাদীসের পরোক্ষ ইঙ্গিতে ইমামদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শারী'আতের একটি উৎস। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) ইস্তিহসানের বিষয় দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি এটিকে শারী'আতের উৎস মনে করেন না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) ও আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) ইসতিহসানকে শারী'আতের দলীল মনে করেন। অধিকন্তু ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, 'ইসতিহসান জ্ঞানের উনিশভাগের একভাগ। ইসতিহসানের সমর্থনে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিতবাহী আয়াত আল কুর'আনে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَبَشِّرْ عِبَادِ- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ ۚ اُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ ۖ وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ- ـ

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। ওরাই তারা যাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এরাই বোধশক্তিসম্পন্ন।"[১৩৫]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি।"[১৩৬] কুর'আন মাজীদের উপরিউক্ত আয়াত থেকে ইসতিহসান শারী'আতের দলীল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

১৩৪. আহমদ মুলণ্ডাজিউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৪।

১৩৫. আল কুর'আন ৩৯ : ১৭-১৮।

১৩৬. আল কুর'আন ২২ : ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসতিহসান বিষয়ে হাদীসের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

فَمَا رَاَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَاَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

"মুসলিমগণ যা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকটও উত্তম আর মুসলিমগণ যা মন্দ বিবেচনা করেন তা আল্লাহর নিকটও মন্দ।"[১৩৭]

পাশ্চাত্য আইন ও ইসতিহসান

ইসতিহসানের সার কথা যেহেতু কঠিনতা ও কঠোরতা পরিহার ও সহজ পন্থা গ্রহণ করা, সে হিসেবে এ আইনের একটি সার্বজনীন দিক রয়েছে। গ্রিক আইনে Epic keia ও রোমান আইনে Acqueta নামে যে নীতির সন্ধান পাওয়া গেছে তার সাথে ইসতিহসানের মিল রয়েছে। আধুনিক ইউরোপীয় আইন দর্শনে Natural justice বলতে যা বুঝায়, ইসতিহসানও সে ধরনের একটি আইন।

ইসতিহসানের উদাহরণ

উত্তরাধিকারের একটি প্রশ্নের মীমাংসায় সাহাবা কিরামের কার্যধারায় ইসতিহসান প্রয়োগের প্রমাণ মিলে। যেমন, এক মহিলা মৃত্যুবরণ করে এবং সে তার স্বামী, মা দুই সহোদর ভাই ও দুই বৈপিত্রেয় ভাই উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে যায়। উত্তরাধিকার আইনে সহোদর ভাই 'আসাবা' এর অর্ন্তভুক্ত এবং বৈপিত্রেয় ভাই 'আসহাবুল ফুরূয' -এর মধ্যে শামিল। আসহাবুল ফুরূয হচ্ছে তারা, যাদের প্রাপ্য অংশ কুর'আন মাজীদে নির্ধারিত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, ১/৬, ১/৩, ১/৪, ১/২ ইত্যাদি। অপরদিকে আসাবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো অংশ নেই; বরং আসহাবুল ফুরূযকে অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই তাদের অংশ।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে স্বামী অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এতে পরিত্যক্ত সম্পদের প্রায় সবটুকু বণ্টিত হয়ে যায়, সহোদর ভাইদের জন্য তেমন কিছুই থাকে না। অথচ মৃতের সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে নিকটতর।

---

১৩৭. ইমাম আহমদ, *আল মুসনাদ*, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪২১ হি), খ. ৬, পৃ. ৮৪, হাদীস নং : ৩৬০০।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.)-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তিনি সহোদর ভাইয়েরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে ইসতিহসানের পথ অবলম্বন করেন। তিনি সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাইদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। আসহাবুল ফুরূযকে আসাবার সাথে সংযুক্ত করা কুর'আনী বিধানের বিপরীত, তবুও ইসতিহসানের আশ্রয় নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার প্রশ্নে নাতীর বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়। দাদার জীবদ্দশায় যদি পিতা মারা যায় এমতাবস্থায় নাতি দাদার সম্পদে মীরাস পাবে না যদি দাদার অপর কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে। আক্ষরিক অর্থে মীরাসের আইনের এ হচ্ছে বিধান। যদি দাদা-নাতির জন্য কোনো ব্যবস্থা করে যান অথবা নাতির পিতা যদি নিজস্ব সম্পদ রেখে যান, তবে রক্ষা। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে নাতীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যদি চাচারা তাদের ভাতিজা ভাতিজীকে জীবিকার ব্যবস্থা না করে, তবে ইসতিহসানের আওতায় বিচারক কর্তৃক তাদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা ইসলামী আইনের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ হবে।[১৩৮]

ইসতিহসানের লক্ষ্য

ইসতিহসান মূলত জনকল্যাণমূলক একটি আইন এবং এটি এমন একটি নিয়ম পদ্ধতি যা সব রকমের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা দূরীভূত করে দেয়। হানাফী ফকীগণের মতে, ইসতিহসান ইসলামের সাধারণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এর সাধারণ মূলনীতি হলো :

* ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না। * অনিবার্য পরিস্থিতি নিষিদ্ধ বিষয়ক বৈধ করে। * কর্ম-কাঠিন্য সহজতার প্রসূতি।

৬. ইসতিদলাল

ইসতিদলাল শব্দের অর্থ তলব করা, আলাদা করা, খোঁজ করা বা দলীলের সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা।[১৩৯]

ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় "এটি হচ্ছে এমন একটি পরিভাষা যার সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা হয়।"[১৪০]

---

১৩৮. লেখকম—লী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৪।

১৩৯. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

১৪০. মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিক্হ* (দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো, তাবি), পৃ, ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসতিদলালের প্রয়োগ

এ আইনটিকে কখনো কখনো ইসতিহসানের চেয়েও ব্যাপক ও শক্তিশালী মনে করা হয়। তবে ইজতিহাদ ও সমস্যা সমাধান নির্ণয়ের কোনো বিশেষ পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়; বরং ফিকহবিদগণ ইজতিহাদ করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার প্রায় সবই ইসতিদলালেয় অন্তর্ভুক্ত।

ইসতিদলাল অবস্থা ও কালের পরিবর্তনের সাথে কোন কোন বিধানের পরিবর্তন ঘটায়। এটি অবস্থার দাবি হিসেবে দলীলরূপে প্রতিভাত হয়।

মওলানা আবদুর রহীম বলেন, ইসতিদলাল তিন প্রকারের হতে পারে–

(১) একটি বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের যখন যোগ ঘটে এবং সে যোগের পশ্চাতে কোন কার্যকরী কারণ থাকে না, তখন সে যোগের ফলাফলকে এক প্রকার ইসতিদলাল বলা যায়।

(২) বিলোপ বা বিরতি যতক্ষণ না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নেয়া হয় যে, কোন বস্তু বা তার অবস্থা বহাল আছে।

(৩) অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখাই নীতি।

৭. মুসলিহাত

মুসলিহাত বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেক কল্যাণকে, যে বিষয়ে শারী‘আত দাতার পক্ষ থেকে এমন অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছায়নি, যা তাকে গণ্য করার আহ্বান জানায় এবং যার কোন মূল নেই, যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, ক্ষতির কোন আশংকা থাকবে না। এটি অকাট্য ও স্পষ্ট দলীলের বিরোধী হবে না অথবা ইজমারও বিরোধী হবে না।[১৪১]

মুসলিহাত মানব কল্যাণের রচিত

ইসলামী শারী‘আতের যাবতীয় বিধিবিধান মানব কল্যাণের নিমিত্তে রচিত। ইসলামী আইনবিদগণ এই সাধারণ কল্যাণকে আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

---

১৪১. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ, ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিহাতের উদাহরণ

"ইসলামী শারী'আতে রুখসাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেমন– (১) অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি, (২) মুসাফিরের জন্য সালাত কসর ও সিয়াম পালন না করার অবকাশ। (৩) পানি ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি (৪) মুআমালাতের ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যে ইজারা, বাইয়ে সালাম, মুদারাবা প্রভৃতি ব্যবসায়িক পদ্ধতি জায়েয করা হয়েছে। শুধু তাই নয় যেখানে কল্যাণের পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে আইন ও অনিবার্যভাবে সে পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছে। যেহেতু শারী'আতের লক্ষ্য মানব কল্যাণ, সেহেতু এ কল্যাণই হচ্ছে ইসলামী শারী'আতের একটা অন্যতম উৎস মুসলিহাত। ইসলামী শারী'আতে কল্যাণ (মুসলিহাত) একটি বিশেষ পরিভাষা। শব্দটি দ্বারা বুঝায় "শারী'আতের লক্ষ্য সংরক্ষণের সীমার মধ্যে থেকে উপকারিতা লাভ এবং ক্ষতির প্রতিরোধ।" যে বিষয়ে শারী'আতের কোন দলীল উদ্ধৃত হয়নি সেক্ষেত্রেও কল্যাণই কামনা করতে হবে। এ কল্যাণই হচ্ছে, ইসলামী শারী'আতের অন্যতম উৎস মুসলিহাত। এসব কারণে ইসলামী ফিকহবিদগণ এ কল্যাণকে শারী'আত রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন।

৮. উরফ বা সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজ

উরফ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কল্যাণ, উত্তম, খারাফের বিপরীত, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।[১৪২] উরফ এর সমার্থক আরেকটি শব্দ আগত। এ উরফের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হচ্ছে ইসতিমাল। ইসতিমাল হচ্ছে–

استعمال الناس حجة - لجب العمل بها

"লোকদের ব্যবহারিক রীতি (ইসতিমাল) শারী'আতের দলীল। এর উপর আমল করা ওয়াজিব।"[১৪৩]

উরফ ইসলামী আইনের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে। পরিভাষায় উরফ হল,

মুহাম্মদ তাকী আমীনী বলেন, "কথা ও কাজে বিপুলসংখ্যক মানুষের অভ্যাস এর নাম উরফ।"[১৪৪]

---

১৪২. ড. ওয়াহাব আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ২, পৃ. ১০৪।

১৪৩. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

১৪৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. ওয়াহাব আয-যুহাইলী বলেন, "যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকাণ্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না।"[১৪৫]

সমাজের দীর্ঘদিনের রীতি-নীতি, অভ্যাস যা শারী'আতের সাথে সাংঘার্ষিক নয় তাকে গ্রহণ করা যা শারী'আতের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের যুগে এ ধরনের আইন ছিল।

উদাহরণ

দিয়াত (রক্তপণ) প্রচলিত ছিল **১৮০**টি উট। মহানবী (সা.)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব জনৈক মহিলার প্রস্তাব অনুযায়ী রক্তপণের এই সংখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবা কিরাম ও তাবেঈগণের যুগেও এই আইন প্রচলিত ছিলো।[১৪৬]

উরফ এর শ্রেণি বিভাগ

ইসলামী আইনবিদগণের মতে উরফ দুই প্রকার। যথা : উরফে খাস এবং উরফে আম।

উরফে খাস : কোন বিশেষ এলাকায় পেশায় বা বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত উরফকে উরফে খাস বলা হয়।

উরফে আম : ব্যাপকভাবে প্রচলিত উরফ যা কোন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাকে উরফে আম বলা হয়।

মানুষের তৈরি করা আইনে উরফের অবস্থান

সাধরণভাবে প্রত্যেকটি উরফকে আইনগত মর্যাদা দেয়া হয় না। কতগুলো শর্তে আদালত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো :

উরফ যুক্তিসম্মত হতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আইনের একটি স্বীকৃত নীতি হচ্ছে কুপ্রথা বাতিলযোগ্য। অর্থাৎ উরফ হবে এমন যা জনকল্যাণের স্বার্থে জড়িত।

---

১৪৫. ইমাম আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪।

১৪৬. মুহাম্মদ তকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

উরফ অপরিহার্য হতে হবে। অর্থাৎ জনগণ তাকে ওয়াজিব ও জরুরি বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া রেওয়াজ উরফের মর্যাদা পাবে না।

উরফ দেশীয় আইনের পরিপন্থী হলে তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে। আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান (সংসদ) কর্তৃক রচিত আইনের সাথে সংগতি থাকা আবশ্যক।

সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জারী থাকা জরুরি। পূর্বে শর্ত ছিল উরফ হবে স্মরণাতীতকালের এই শর্ত এখন শিথিল করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ অনুযায়ী জনগণের আমল প্রমাণিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তবে গ্রহণযোগ্যতার জন্য এখনো রেওয়াজের সূচনাকাল প্রমাণ করা জরুরি মনে করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত মেয়াদের শর্তটি খ্রিষ্টীয় গির্জার অধ্যক্ষগণ রোমান আইন থেকে গ্রহণ করেছিল।[১৪৭]

৯. সাদ্দুয যারায়ে

সাদ্দুয যারায়ে' (سد الذرائع) পরিভাষাটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সাদ্দ (سد) শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং ক্রিয়ামূল হিসেবে এর অর্থ বন্ধ করা, বাধা দেয়া, নিবারণ করা ইত্যাদি।[১৪৮]

যারায়ে (ذرائع) শব্দটি যারী'আহ (ذريعة) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ মাধ্যম, উসিলা, পথ ইত্যাদি।[১৪৯]এ ছাড়াও শব্দটি কারণ, তীর নিক্ষেপের কলা-কৌশল শিক্ষার আসর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাব্দিক অর্থে ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ের প্রতি পৌঁছার মাধ্যমকে 'যারীআহ' বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণকর কাজে প্রলুব্ধকারী উপকরণ বুঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অতএব সাদ্দুয যারায়ে পরিভাষার শাব্দিক অর্থ উপায়-উপকরণ বা কোনো কাজের মাধ্যম বন্ধকরণ।

ইব্ন তাইমিয়াহ বলেন :

الفعل الذى ظاهره انه مباح , وهو وسيلة الى فعل محرم-

---

১৪৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

১৪৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৫৫৮।

১৪৯. মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত* (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া তুরাসিল আরাবী, ২০০৩), খ. ৩, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"যারীআহ বলা হয় ঐ কর্মকে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা অনুমোদিত; অথচ তা নিষিদ্ধ কাজের উপলক্ষ।"[১৫০]

ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ -এর মতে 'সাদ্দুয যারায়ে' বলা হয়–

منع كل وسيلة مباحة , قصد بها التوسل الى مفسدة او لم يقصدة او لم يقصد , اذا افضت اليها غالبا , وكانت مفسدتها ارجح من مصلحتها۔

"এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করা, যা দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক প্রাধান্য পায়।"[১৫১]

ড. যায়দানের মতে, "মূলগতভাবে নিষিদ্ধ হোক বা অনুমোদিত হোক, অকল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কর্মকাণ্ডকে যারী'আহ বলা হয়। যেসব মাধ্যম নিষিদ্ধ তা সরাসরি কর্তাকে অকল্যাণে নিমজ্জিত করে এবং যেসব বৈধ কাজ নিষিদ্ধ কাজে প্রলুব্ধ করে, সেগুলো প্রথমে নিষিদ্ধ কাজে অতঃপর অকল্যাণে নিমজ্জিত করে।"[১৫২]

কুর'আন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহর বাণী :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ --

"হে মুমিনগণ, তোমরা 'রা'ইনা' বলো না; বরং বল, 'উনজুরনা' আর শোন, কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"[১৫৩]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ راعنا শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যদিও সাহাবীগণ সৎ উদ্দেশ্যে এ শব্দটি ব্যবহার করতেন, কিন্তু ইহুদিরা একে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করত এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি দিত। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে গালি দেয়ার উপলক্ষ হওয়ার কারণে ঐ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা কুরতুবী বলেন, এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে :

---

১৫০. তকী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাইমিয়াহ, *বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল* (রিয়াদ : মাকতাবাতু লীনা লিননাশরি ওয়াত তাওযী, তাবি), পৃ. ৩৫১।

১৫১. মুহাম্মদ ইব্ন আবূবকর ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন* (কায়রো : মাকতাবাতুল কুলিণ্ঢয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৬৮), খ. ৩, পৃ. ১০৮।

১৫২. ড. আব্দুল করিম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

১৫৩. আল কুর'আন, ২ : ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

১. কেউ হেয় প্রতিপন্ন বা অপমানিত হয় এমন শব্দ ব্যবহার থেকে দূরে থাকা।

২. সাদ্দুয যারায়ে' নীতি গ্রহণ।[১৫৪]

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

من الكبائر شتم الرجل والديه , قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال : نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه- ـ

"কোনো ব্যক্তি তার নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), কোনো ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে ঐ ব্যক্তি (প্রত্যুত্তরে) তার পিতাকে গালি দেয়। কোনো ব্যক্তি অন্যের মাতাকে গালি দেয়, ফলে ঐ ব্যক্তি (প্রত্যুত্তরে) তার মাতাকে গালি দেয়।"[১৫৫]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেয়া নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

সাদ্দুয যারায়ে নীতি প্রয়োগের শর্ত

সাদ্দুয যারায়ে শারী'আতের দলীল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, যে কোনো ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যাবে। কেননা এ নীতি অতিমাত্রায় প্রয়োগ করলে মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর ও দুঃসহ হয়ে উঠবে। আবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করলে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের প্রতি ধাবিত হবে। এ কারণে আলিমগণ এ নীতি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

১. যদি অনুমোদিত উপায়-উপকরণ অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, এ অকল্যাণের দিকে ধাবিত করাটা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। এমনকি যদি সৎ নিয়্যাতেও উক্ত উপায়-

১৫৪. ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭।

১৫৫. ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস নং ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণ গ্রহণ করা হয় এবং তা অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, তবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।[১৫৬]

২. সাদ্দুয যারায়ে যদি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে তবে সেক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি থাকলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে।[১৫৭]

৩. উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে মাঝে মধ্যে, কোনো কোনো সময় অকল্যাণ সাধন করলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

৪. যদি উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে বা প্রবল ধারণায় অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পরিমাণ বিবেচনায় নিষিদ্ধ করা হবে।

৫. সাদ্দুয যারায়ে কোনো ক্রমেই শার'ঈ নাস্ বিরোধী হবে না।

১০. দেশজ আইন

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস দেশজ আইন ইসলামী শারী'আর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন দেশজ আইন ইসলামে অনুমোদিত।

উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরবে প্রচলিত অনেক আইন গ্রহণ করেছিলেন।

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ-

"মামলা মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করবে বাদী। আর যে অস্বীকার করবে (বিবাদী) সে শপথ করবে।" বিয়ের ব্যাপারে কয়েকটি শব্দ। যথা– ইজাব, কবুল। দেনমোহর ইত্যাদি সম্পত্তি পরিহার ও হস্তান্তরের কয়েকটি পদ্ধতি; যথা : ক্রয়-বিক্রয় হেবা, রেহেন, ইজারা ইত্যাদি। ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি যাতে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা বাদ দেয়া বা তাতে শর্তারোপ করা হয়েছিল। অসিয়তের নিয়ম এবং আইন প্রয়োগ করা এবং বলবৎ রাখার কতিপয় পদ্ধতি দেশজ আইনের অন্তর্ভুক্ত।

১১. মাসালিহে মুরসালা

---

১৫৬. আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহল*, প্রাগুক্ত খ. ২. পৃ. ৩৭৪।

১৫৭. আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮), খ. ২. পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسلة) পরিভাষাটি মাসালিহ (مصالح) ও মুরসালাহ (مرسلة) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মাসালিহ শব্দটি মাসলাহা (مصلحة) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ : কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ।[১৫৮] আর মুরসালাহ অর্থ مطلقة মুক্ত, বন্ধনহীন।[১৫৯] অতএব মাসালিহ মুরসালাহ অর্থ সাধারণ কল্যাণ, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পরিভাষাটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, জনকল্যাণ চিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সহজ হয়। ইমাম মালিক (রহ.) ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে সর্বাধিক মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে ইসতিসলাহ নীতি ব্যবহার করেছেন।

মাসালিহে মুরসালা সম্পর্কে **ইমাম ইবনে তাইমিয়া** (রহ.) বলেন, মুজতাহিদগণকে কাজের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করেন এমন আইন এবং শারী'আতে উক্ত কাজের বিরোধী কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই, তাকে মাসালিহে মুরসালা বলা হয়।[১৬০]

বর্তমান যুগে মাসালিহে মুরসালাহর উদাহরণ

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সংগঠন রাবেতা আল আলম আল ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণকে নিয়ে ফিকাহ পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের সদস্যবৃন্দ মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. অঙ্গদান করা

২. বীমা চুক্তির বৈধতা

৩. ব্যাংক সুদের অবৈধতা

৪. চান্দ্রমাসের গণনা, বিশেষ করে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে চান্দ্র মাসের ভিত্তিতে যাকাতের সময় নির্ধারণ করা

৫. শেয়ারে যাকাতের বিধান

---

১৫৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৬।

১৫৯. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহলি ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

১৬০. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল* (আল কাহিরা, তা.বি) খ. ৩, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

৬. জনস্বার্থে মালিকানা অধিগ্রহণ

৭. যাকাতের অর্থ বিনিয়োগের অবৈধতা ইত্যাদি।

১২. আল ইস্তিসহাব

বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ের বিধান নির্ধারিত হওয়ার পর উক্ত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটলেও তার বিধানে পরিবর্তন না এনে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্বের বিধান বর্তমান রাখাই ইসতিসহাব।

ইসতিসহাব (استصحاب) শব্দটি সাহবুন (صحب) থেকে নির্গত। এ শব্দটি استفعال-এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। আরবী শব্দতত্ত্ব শাস্ত্র অনুযায়ী এ ওযনের বিশেষত্ব হলো কোনো কিছু অন্বেষণ করা।[১৬১]

অতীতকালে শারী'আতের যে হুকুমটা যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে হুকুমটাকে সেভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই বলা হয় 'ইসতিসহাব'।[১৬২]

ইবন হাযম বলেন :

الاستصحاب هو بقاء حكم الاصل الثابت بالنصوص , حتى يقوم الدليل منها على التغيير-

"নসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নস ভিত্তিক কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায়।"[১৬৩]

ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন :

استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفى ما كان منفيا-

"পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অননুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব।"[১৬৪]

---

১৬১. ইবন ইসফুর আল-ইশবিলী, *আল-মুমাত্তা ফীত তাসরীফ* (বৈরূত : দার ল আফাকিল জাদীদ, ১৯৭৮ ইং), খ. ১, পৃ. ১৯৫।

১৬২. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১৬৩. আলী ইব্ন আহমদ ইবন হাযম, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম* (কায়রো : দার ল হাদীস, ১৪০৪হি), খ. ৫, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ হিসেবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে। এক ব্যক্তি কোন যুবতী মেয়েকে একথা জেনে বিয়ে করল যে, সে কুমারী পরে যৌন মিলনকালে যদি সে দাবি করে যে, মেয়েটি কুমারী নয়, তবে তার দাবি এক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করবে। কেননা মেয়েটি মূলত কুমারীই ছিল বলে পূর্ব থেকে জানা ছিল। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় ইসতিসহাবে হাল বলা হয়।

সে হুকমটিকে কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ না এমন কোন দলীল পাওয়া যাাবে যা সেটিকে বদলে দিবে কিংবা সেটিকে রদ করে দিবে।

১৩. শার'উ মান কাবলানা (পূর্ববর্তী নবীদের শারী'আত)

আল্লাহর নাযিলকৃত যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি অন্যান্য উম্মতের কাছে সংরক্ষিত ছিল বা কুর'আনে উল্লিখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ওপর আমল করেছিলেন। আসলে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম মূলত এক ও অভিন্ন। আদর্শ ও মূলনীতির ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই, হবেও না। ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থাতে স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যের কারণে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নবীদের শারী'আতে কিছু পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক এবং আল্লাহ্‌র হিকমতের অনুকূল। তবে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাত অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর শিক্ষা অবিকৃত রাখতে পারেনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার রেকর্ডও লুপ্ত হয়েছে। যা অবিকৃত আছে, যার বিবরণ পাওয়া যায় কুর'আন মাজীদে, হাদীসে এবং পূর্ববর্তী উম্মতের জীবনে। তা অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট। এই কারণে পূর্ববর্তী শারী'আত ইসলামী ফিক্‌হের অন্যতম উৎস।

শাব্দিক অর্থ : শারউ মান কাবলানা (شرع من قبلنا) পরিভাষাটি মূলত 'শারউন' ও 'মান কাবলানা' দু'টি পদের সমন্বয়ে গঠিত। মান কাবলানা (من قبلنا) অর্থ যারা আমাদের পূর্বে

---

১৬৪. ইমাম আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুল মুআক্কিঈন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। অতএব 'মারউ মান কাবলানা' (شرع من قبلنا) অর্থ আমাদের পূর্ববর্তীদের শারী'আত।

পারিভাষিক অর্থ : ড. আনওয়ার শুআইব বলেন :

هو عبارة عن الاحكام والتشريعات التى شرعها الله تعالى فى حق الامم السابقة وانزلها عن طريق انبيائه ورسله كابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم , والتى من شانها ان تنظم علاقة الانسان بربه والانسان باخيه الانسان فى قضية الحلال والحرام-

"শারউ মান কাবলানা বলা হয় ঐসব বিধিবিধান ও আইন-কানূনকে, যা মহান আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন, যা তাদের নবী ও রাসূলগণ যেমন ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন এবং যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, হালাল ও হারামের ভিত্তিতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের এবং মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক পরিচালনা করা।"[১৬৫]

কুর'আন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহ বলেন :

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ-

"এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর।"[১৬৬]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁদের শরী'আতের যেসব বিধিবিধান রহিত হওয়ার স্পষ্ট কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, সেসব বিধান পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

---

১৬৫. ড. আনাওয়ার শুআইব আবদুস সালাম, *শার'উ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া নাআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া* তাতবীকাতুহু (কুয়েত : প্রকাশনা কমিটি, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ ইং), পৃ. ১৫৭।

১৬৬. আল কুর'আন, ৬ : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

"নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও মুমিনগণ। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।"[১৬৭]

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

"তারপর আমি তোমার প্রতি ওহী পঠিয়েছি যে, আপনি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর, যে ছিল একনিষ্ঠ এবং ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৬৮]

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

নামাযের কাযা আদায় সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন :

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ ـ وَاَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

-

"যদি কেউ কোনো সালাতের কথা ভুলে যায়, তবে যখন তার স্মরণ হবে তখনই সে যেন তা আদায় করে নেয়। এ অতীত উক্ত সালাতের কোনো কাফ্ফারা নেই। (কেননা মহান আল্লাহ বলেন) "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর। (সূরা তা-হা : ১৪)"[১৬৯]

মহানবী (সা.) যে আয়াতের ভিত্তিতে উক্ত বিধান উদ্ভাবন করেছেন, তা মূলত মূসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল। অতএব পূর্ববর্তী শরী'আতের বিধিবিধান গ্রহণ বৈধ না হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করতেন না।

মুজাহিদ বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি সূরা সোয়াদ তিলাওয়াত করার সময় সাজদা করব? উত্তরে তিনি وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ থেকে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ (সূরা আন'আমের ৮৪ থেকে ৯০) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের নবীও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১৭০]

---

১৬৭. আল কুর'আন, ৩ : ৬৮।

১৬৮. আল কুর'আন, ১৬ : ২৩।

১৬৯. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২, হাদীস নং : ৫৯৭।

১৭০. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস নং : ৩৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণে এ সূরায় তিলাওয়াতে সাজদা প্রদান করেছেন। আর তাঁদের অনুসরণের অর্থ তাঁদের শারী'আতের অনুকরণ।

শারউ মান কাবলানা নীতি প্রয়োগের শর্ত

যারা শারউ মান কাবলানা তথা পূর্ববর্তী শারী'আতকে ইসলামী আইনের উৎস গণ্য করেন, তারা এ নীতি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত প্রদান করেন। শর্তগুলো পূরণ হওয়া ব্যতীত কোনোক্রমেই এ নীতির প্রয়োগ বিধিসম্মত নয়।[১৭১]

১. পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধিবিধান অবশ্যই কুর'আন অথবা সহীহ সুন্নাহে বর্ণিত হতে হবে। শুধু আহলে কিতাবদের কোনো উৎস থেকে বর্ণিত হবে না। অর্থাৎ বর্তমান প্রচলিত তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কিতাবুল মুকাদ্দাস (Bible, Old Testament, New Testament, Kitab al-Muqaddas) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে না। একইভাবে কুর'আন-সুন্নাহ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোনো তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. পূর্ববর্তীদের শার'ঈ বিধান যদি সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তবে তা শুদ্ধ বর্ণনাধারায় বর্ণিত হতে হবে। দুর্বল বর্ণনাধারা সম্বলিত হবে না। অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হতে হবে।

৩. পূর্ববর্তীদের শারী'আত ইসলামী উৎস তথা কুর'আন-সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমাণিত হলে তা অকাট্য পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়া শর্ত নয়। ধারণাপ্রসূত পদ্ধতি যেমন, আহাদ সুন্নাহর মাধ্যমে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য।

৪. পূর্ববর্তীদের শারী'আতের যে বিধান গ্রহণ করা হবে, ইসলামী শারী'আতে তা রহিত না হওয়া শর্ত। যদি রহিত হয়ে যায়, তবে তা ইসলামী আইনের উৎস গণ্য হবে না। এ কারণে তার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করাও বৈধ নয়।

১৭১. ড. আনাওয়ার শুআইব আবদুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ বিভিন্ন মাযহাবে আইনের উৎস নির্ধারণে ভিন্নতা

ইসলামী আইনের উৎস নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

হানাফীদের মূলনীতি ও উৎস

হানাফীদের মূল উৎস ও মূলনীতিসমূহের মধ্যে রয়েছে :

(১) আল-কুর'আন

(২) সুন্নাতে রাসূল

(৩) ইজমা (ঐকমত্য)

(৪) কিয়াস (ন্যায় অনুমান)

(৫) ইসতিহসান (মঙ্গল কামনা)

(৬) ইসতিসহাবে হাল (অবস্থার প্রেক্ষাপট)

(৭) বারাআতুল আছলিয়া (মূলকে অক্ষত রাখা)

(৮) হিলা (কৌশল)

(৯) ফিক্‌হে তাকদীরী (ভূতপূর্ব আইন নির্ধারণ) ইত্যাদি।[১৭২]

মালেকীদের মূলনীতি ও উৎস

মালেকীদের মূলনীতির মধ্যে রয়েছে :

(১) মহাগ্রন্থ আলকোরআনের ভাষ্য

(২) প্রকাশ্য সাধারণ অর্থ

(৩) দলীল-বিপরীত ভাব উদ্ভাবন

(৪) সামঞ্জস্যশীল অর্থ উদ্ভাবন

(৫) তাত্তজীহ (কার্যকারণের উপর অনুধাবন)। এমনিভাবে সুন্নাহ ও উল্লিখিত পাঁচটি মূল উৎস থাকবে।

(১১) ইজমা (ঐকমত্য)

(১২) কিয়াস (ন্যায় অনুমান)

(১৩) মদীনাবাসীদের আমল

(১৪) ইসতিহসান (মঙ্গল কামনা)

---

১৭২. মোহাম্মদ বিন আল-হাছান আল-হাজবী, *আল-ফিকাহ আল-সামী* (আল-রিয়াদ : মাকতাবা আল-রিয়াদ, ১৩৯৮ হিজরী), পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) পথ রূদ্ধ করার হুকুম

(১৬) বিতর্কিত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ-কখনও গ্রহণ আবার কখনও বর্জন

(১৭) ইসতিসহাব (অবস্থার প্রেক্ষাপট)

(১৮) ঘুরে দাঁড়ানোর সৌন্দর্য

(১৯) মাসালিহি মুরসালাহ (আগত কল্যাণকামিতা)[১৭৩]

শাফি'ঈদের মূলনীতি ও উৎস

ইমাম শাফি'ঈ সর্বপ্রথম উসূলে ফিকহ উদ্ভাবন করেন। তাদের মতে মূল উৎস হচ্ছে :

(১) আল-কুর'আন

(২) আল-সুন্নাহ

(৩) ইজমা (ঐকমত্য)

(৪) কিয়াস (ন্যায় অনুমান)

(৫) ইসতিসহাব

(৬) মদীনাবাসীর আমল বাতিল

(৭) মাছালিহি মুরছালা বাতিল (আগত কল্যাণকামিতা বাতলি)

(৮) কওলে সাহাবী (সাহাবীদের বাণী)

(৯) সাহাবীদের মতভেদ।[১৭৪]

হাম্বলীদের মূলনীতি ও উৎস

হাম্বলেদীর মূলনীতি ও উৎস ৫টি। যথা :

(১) কুর'আন

(২) হাদীসে মারফু (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরাসরি বাণী)

(২) সাহাবীদের ফতওয়া

(৩) ছাদ্দু আল-জারায়ে' (মূলে প্রতিরোধ)

(৪) হাদীসে মুরছাল ও যয়ীফ (বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল বাণী) গ্রহণ বা কিয়াস।[১৭৫]

---

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৭৪. মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *আল-রিসালা* (হালব : মুস্ত্ফা আল-হালাবী প্রেস, ১৩৫৮ হিজরী), পৃ. ৪।

১৭৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ ইসলামী আইনের উৎসসংখ্যা নির্ধারণে ইমামদের মতানৈক্য নিরসন

ইসলামী আইনের উৎস নির্ধারণে ইমামদের মতানৈক্য থাকলেও শারী'আতের মাসআলা নির্ধারণে এ মূলনীতিগুলো তেমন একটা সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। কারণ ইসলামী আইনের উৎসগুলোর এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করার উদ্দেশ্য ছিল ইতিবাচক উন্নয়ন সাধন। তবে দলাদলির চলমান ধারার সাথে মিলিত হয়ে এই শ্রেণিবিন্যাস মাযহাবগুলোর পারস্পরিক ব্যবধানকে আরও বৃদ্ধি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে একই নীতিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়ায় তা বরং মতপার্থক্যের উৎসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মালিকি মাযহাবের আলেমগণ হানাফি মাযহাবের ইসতিহসান নীতিকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিলেও মাসালিহ মুরসালাহ শিরোনামে তাঁরা সেই একই নীতি প্রয়োগ করেছেন। অন্যদিকে শাফি'ই মাযহাব উভয় পরিভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে একই নীতি প্রয়োগ করার জন্য ইসতিসহাব পরিভাষাটি ব্যবহার করেছে।[১৭৬]

১.৬ শারী'আ আইন প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ

ইসলামী শারী'আ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্তি। সুতরাং শারী'আর প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের সামগ্রিক জীবন। শারী'আর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ হলো :

১. ইবাদত

২. আনুগত্য

৩. অপরাধ

৪. ব্যক্তিগত জীবন

৫. পরিবার ও বংশ

৬. সামাজিক আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক (মুআমালাত)

৭. সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

৮. সামগ্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১০. বিচার ফায়সালা

---

১৭৬. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, *মাযহাব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (সেলাংগর, মালেশিয়া : সিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শারী'আ আইনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব

ইসলামী শারী'আর মূল কথা হলো এটি আল্লাহ প্রদত্ত। সুতরাং এটি মানবীয় মেজাজ ও স্বভাব থেকে মুক্ত। ইসলামী শারী'আত বিশ্ব মানবতার জন্য। ইসলামী শারী'আর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এ শারী'আত গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত ও সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়েতস্বরূপ। এ শারী'আত কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠী বা কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের জন্যে নয়; বরং শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, আরব, অনারব প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্যে। এতে কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা, পক্ষপাতিত্ব, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও শ্রেণি বৈষম্যের স্থান নেই।

২.১ শারী'আ আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

নিম্নে শারী'আ আইনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব আলোকপাত করা হলো :

১. ইসলামী শারী'আত আল্লাহ প্রদত্ত

ইসলামী শারী'আত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত। এর মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। আল কুর'আনে স্পষ্ট ভাষায় এর ঘোষণা রয়েছে এবং বহু স্থানে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী শারী'আত মহানবী (স.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে উপহার দেওয়া হয়েছে। আল-কুর'আনই হচ্ছে ইসলামী শারী'আতের মূল উৎস। মানব চিন্তাধারা প্রসূত বিধিবিধান থেকে ইসলামী শারী'আত সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী শারী'আত অসম্পূর্ণতা, অপারগতা, সময়, স্থান-কাল, অবস্থা, অভিজ্ঞতা, মেজাজ, প্রবৃত্তি এবং আবেগময়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী শারী'আত তথা ইসলামী বিধিবিধান দাতা হলেন বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন কিসে মানবজাতি তথা সৃষ্টি জগতের উপকার এবং উন্নতি হবে এবং কীসে ও কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে।[১৭৭]

আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ক উন্নয়ন কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক তথা সর্বক্ষেত্রে শারী'আতের বিধিবিধান পালনের সাথে সম্পৃক্ত। যাতে মানুষ ইহকালীন জীবনে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়নসহ সকল

---

১৭৭. ইউসুফ আল কারযাভী, *শরী'আতুল ইসলাম খুলুদুহা ওয়া ছালাহুহা লিততাতবিক ফি কুলিণ্ড যামান ওয়া মাকান* (বৈরূত : আল মাকাতাবুল ইসলাম, তাবি), পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। মানবজীবনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাষায় বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ--- وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ـ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ- ـ

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা জালিম। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা ফাসিক।"[১৭৮]

২. ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত

শারী'আ আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি পুরোপুরি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মাঝে ইনসাফ (সুবিচার) ও আদল (ন্যায়বিচার) প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ তাকিদ এসেছে আল কুর'আনে। যেমন :

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং নিকট আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ করেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[১৭৯]

শারী'আ আইনের মূলনীতি হলো মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান, দ্বীন-চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির সংরক্ষণ করা। ইসলামী আইনবিদদের মতে শারী'আর চূড়ান্ত লক্ষ্য সমগ্র মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন। কোনো বিশেষ জাতি বা শ্রেণির মঙ্গল সাধন নয়। আর আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও এর উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য আখিরাতের কল্যাণসহ জাগতিক কল্যাণ সাধন, যা সাধারণত মানব রচিত আইনের উদ্দেশ্যে থাকে না; ইসলামী শারী'আর লক্ষ্য শুধু

১৭৮. আল কুর'আন ৪ : ৪৪,৪৫, ৪৭।

১৭৯. আল কুর'আন, ১৬ : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আখিরাতের কল্যাণই নয়; বরং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ধরণের কল্যাণ লাভ। সত্য ও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখতে আল কুর'আনের কঠোর নির্দেশনা এসেছে। যেমন :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায়ের উপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেনো তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর মানে) তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো। কারণ এটি তাকওয়ার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।"[১৮০]

قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ـ

"আপনি বলে দিন আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৮১]

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ـ

"যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয় হয়।"[১৮২]

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ـ

"তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দিবে।"[১৮৩]

وَاِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ

"আর মানুষের মধ্যে যখন তোমরা বিচার-ফয়সালা করবে তখন তোমরা ন্যায়ের ভিত্তিতে করবে।"[১৮৪]

وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ـ

"তোমরা ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায়ের ভিত্তিতে।"[১৮৫]

---

১৮০. আল কুর'আন, ৫ : ৮।

১৮১. আল কুর'আন, ৭ : ২৯।

১৮২. আল কুর'আন, ৬ : ১৫২।

১৮৩. আল কুর'আন, ২ : ২৮২।

১৮৪. আল কুর'আন, ৪ : ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

আর কুর'আনের উপরোল্লিখিত আয়তগুলো ন্যায়, সাক্ষ্য, সমতা, সুবিচার ও ন্যায় বিচারের চরম (absolutes) ও চিরন্তন গ্যারান্টি। তাই ইসলামী শারী'আতকে ন্যায়ের লালন ক্ষেত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩. ব্যক্তি ও সমষ্টির সমভাবে মূল্যায়ন

শারী'আ আইনের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি ব্যক্তিকে এককভাবে ক্ষমতা প্রদান করে না আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনের মতো ব্যক্তির মালিকানাকে অস্বীকার করে না। শারী'আ আইনে সমতা বিধানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মালিকানার ব্যাপারে তার অবস্থান। ইসলাম ব্যক্তিকে সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ দেয় কিন্তু মালিকানা পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক মালিকানার মত নয়; বরং ইসলামী শারী'আত মালিক হওয়ার সাথে সাথে সম্পদের হক আদায় করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।

সৎচরিত্র ও নৈতিকতার প্রভাবে সমাজে সকল কাজকর্ম সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়। ইসলামী শারী'আত ছাড়া অন্য কোন জীবনদর্শনে এরূপ উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী হওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র ও আদর্শকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন দর্শন বা রাজনৈতিক দর্শনে চরিত্রের সংরক্ষণ ও লালনের জন্য সংবিধানে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান থেকে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ অধিকাংশের মধ্যেই ধোঁকাপূর্ণ আচরণ, পথভ্রষ্টতা, জালিয়াতি এবং মিথ্যার আসর গেড়ে বসেছে। নিশ্চয়ই ইসলামের সাথে এসব অনৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই। আর ব্যক্তিগত জীবনে যেসব সৎ গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে এবং নৈতিকতার আদর্শ উজ্জীবিত হয়, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম সেসব গুণাবলীর অনুশীলন করে। এ কারণে ইসলামী জীবন বিধান বা জীবন দর্শনে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে চারিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিকতাকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে লেনদেন ও মুনাফা অর্জন সম্পন্ন হয়, তাতেও শর্তারোপ করে। এ সবের মধ্যে এমন কিছু চারিত্রিক শর্তও আছে যার ওপর ঈমান নির্ভরশীল আর কিছু আইনগত শর্ত আছে যা সরকার কার্যকর করে। এ সবের

---

১৮৫. আল কুর'আন, ৬ : ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও নিরাপত্তা প্রচার ও প্রসার ঘটানো, যাতে ধনীরা সুদ, মজুদদারী ও মুনাফাখোরী ইত্যাদির মাধ্যমে গরিব জনগণকে শোষণ করতে না পারে। আর সম্পদ ধনীদের মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে।

৪. স্থায়িত্ব ও কোমলতার সমন্বয়

শারী'আ আইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে কঠোরতার পাশাপাশি কোমলতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। ইসলামী শারী'আতে নম্রতা বিদ্যমান থাকার কারণেই বিবর্তনের মোকাবিলা করতে ও বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে চলতে সক্ষম। যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে সক্ষম। ইসলামী শারী'আত সমাজের অবদান নয়, তাই তাকে সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় না। এ শারী'আত সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রদত্ত। অতএব সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতা শারী'আতের আদেশ-নিষেধ দ্বারা পরিচালিত হবে। শারী'আত সর্বদা সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকবে। কারণ তা আল্লাহ প্রদত্ত। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ এর সামনে সম্পূর্ণ অসহায়; বরং এতে মানুষের ইজতিহাদ বা গবেষণার বিরাট সুযোগ রয়েছে।

৫. নৈতিকতার লালন ক্ষেত্র

ইসলামী শারী'আতে যে আত্মশুদ্ধি ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে তা মানুষের মনকে জাগ্রত ও সচেতন করে। হৃদয় ও মানসিকতাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। সকল কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ জোগায়। কল্যাণকর ভাবধারার স্ফুরণ ঘটায়, অন্যায়ের প্রতিরোধ করে কুস্বভাব ও অশ্লীল ভাবধারাকে দমন করে। মানব রচিত আইন বিধানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শাস্তি প্রদানই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত থাকে। তাতে মানুষকে ভেড়ার পালের মতো শুধু চাবুকের ভয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়। তাতে মানুষকে তার অনুকূলে গড়ে তুলতে এবং মনোলোকে চরিত্রের দীপ শিখা জ্বালাতে চেষ্টা করা হয় না।[১৮৬]

একথা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত মানব রচিত আইন নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখে না। কোনো ব্যক্তির অশুভ তৎপরতা ও কার্যাবলী

১৮৬. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

যতক্ষণ অন্য লোকের ক্ষতির কারণ হিসেবে প্রতীয়মান না হয় এবং সমাজ জীবনের শাসন শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে ততক্ষণ মানব রচিত আইন ব্যক্তির কার্যাবলীর প্রতি নীরব দর্শকের ভূমিকায়ই নয়; বরং তার জন্য আইনি সুরক্ষা বিদ্যমান রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বর্তমান প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার শুধু তখনই অপরাধের কাজ হিসেবে গণ্য হবে যখন তা কোন এক পক্ষের উপর জবরদস্তি বা অভিযোগ হিসেবে উত্থাপিত হবে। অর্থাৎ মানব রচিত আইনে ব্যভিচার করা অপরাধ নয়; বরং জোর জবরদস্তি করাটা অপরাধ অথবা বিবাহ বহির্ভূত যে কোন শারীরিক সম্পর্ককে মানব রচিত আইনে স্বীকার ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উভয়ের সম্মতিতে ব্যভিচার সংঘটিত হলে তাতে মানব রচিত আইন ব্যভিচারীর/ব্যভিচারিণীর প্রতি সহানুভূতি ও নিরাপত্তাবিধানকারী হিসেবে পরিণত হয়। কিন্তু শারী'আয় ব্যভিচার সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ এবং বিবাহবহির্ভূত যে কোন শারীরিক সম্পর্ক শারী'আ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, কারণ শারী'আতের দৃষ্টিতে ব্যভিচার এমন এক জঘন্য কাজ যা সমাজের নৈতিক চরিত্রের মূল শিকড়কে কেটে দেয়। আর নৈতিক চরিত্রের উপর যখন বিপর্যয় নেমে আসে তখন সমগ্র মানবজাতি অপবিত্র ও কলংকিত হয়ে সমাজের ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়। স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার জন্য মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

"উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"[১৮৭]

মহানবী (সা.) চরিত্রকে ইসলামের অংশ হিসেবে তুলনা করেছেন। ইসলামী শারী'আয় নৈতিকতাকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করেছে যার কারণে কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আইনের আড়ালে অপরাধ করতে সাহস করে না।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো ইসলামী শারী'আতের ব্যাপকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

প্রথমত : ইসলামী শারী'আত আকীদা বিশ্বাসসংক্রান্ত বিষয়াবলীকে মৌল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের বিশ্বাস, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস

১৮৭. ইমাম বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা* (বৈরূত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি), খ. ১০, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং : ২০৭৮২।

Dhaka University Institutional Repository

এর অন্তর্গত। আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোন সত্তাকে অংশীদার করা কোন মতেই বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত : স্বভাব চরিত্র সংক্রান্ত বিষয়াবলী বা একজন মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসেবে অলঙ্কৃত করে। স্বভাব-চরিত্র হলো মানব জীবনের ভূষণ। সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, মানুষকে ধোঁকা না দেওয়া, প্রতারণা না করা পরনিন্দা না করা, চুরি না করা, কারো উপর নির্যাতন-নিপীড়ন না করা, মানুষের সাথে মানবিক আচরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াবলী, মানুষ যাবতীয় সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে। মানুষের প্রতি আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে তা পালন করবে। সালাত কায়িম, সিয়াম সাধনা করা, যাকাত আদায় করা, হজ পালন করা প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিহার সংক্রান্ত বিধিবিধান ইসলামী শারী'আর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থত : ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক গঠন করা এবং পরিবার গঠনের জন্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, সন্তান লালন-পালন, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হওয়া ও সম্পদ বণ্টন-রীতি ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

পঞ্চমত : ব্যবসায়বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিবিধান। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৈধ রীতি-পদ্ধতি, হালাল ও হারাম ব্যবসায় বাণিজ্য, অগ্রীম ক্রয় বিক্রয়, সূদী ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত।

ষষ্ঠত : বিচার-ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান। হাদ্দ, কিসাস, রাজম, তাযিরসহ যাবতীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিধিবিধান, আইনের মৌলনীতিমালা, আইন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং প্রয়োগকারী সংস্থা সবকিছু ইসলাম অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উদ্ধৃত করেছে।

সপ্তমত : অমুসলিম জনসাধারণসংক্রান্ত নীতিমালা। যেসব অমুসলিম অন্যদেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে এসে বসবাস করে, অথবা ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ না করে বসবাস করে ইসলামী শারী'আ তাদের নিরাপত্তা, অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

অষ্টমত : ইসলামী রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসংক্রান্ত নীতিমালা। মুসলিম দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ বা অমুসলিম দেশের প্রতিবেশী হিসেবে মুসলিম দেশে তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামরিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আইন

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমানে যাকে সাধারণ পররাষ্ট্রনীতি বা আল কানুন আত-দাওলী আল আম বলা হয়ে থাকে। এগুলোও ইসলামী শারী'আর আলোচ্য বিষয়।

নবমত : সরকার পদ্ধতিসংক্রান্ত নীতিমালা এবং তার মৌলনীতিসমূহ, অর্থাৎ সরকার গঠনপদ্ধতি, রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামো, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও কল্যাণকর নীতিমালা, জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ নীতিমালা প্রভৃতি। ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে সকল বিষয়ে সুন্দর, সাবলীল ও জনকল্যাণমূলক নীতিমালা প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে যা সংবিধান নামে পরিচিত।

দশমত : রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও এর খাতসংক্রান্ত নীতিমালা। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে নির্বাহ করা হবে এবং কোন কোন উৎস থেকে এ অর্থ আসবে ইসলামী শারী'আত তা অতি সুন্দর, নিরপেক্ষ, নির্ভেজাল ও সুষমভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত, প্রতারিত ও উপেক্ষিত হতে না পারে। ইসলামী শারী'আত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন সাম্যের নীতি প্রবর্তন করেছে যা ধনতান্ত্রিকও নয়, আবার সমাজতান্ত্রিকও নয়; বরং ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক প্রত্যেকেই তার অধিকার প্রাপ্তিতে সক্ষম।[১৮৮]

৬. ইসলামী শারী'আত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ

ইসলামী শারী'আত এমন একটি জীবনব্যবস্থার নাম যা মানব জীবনের সকল দিক, বিভাগ ও আচার আচরণকে একীভূত করে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের বৈষয়িক সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা রয়েছে শারী'আ আইনে এমনকি ঘুমের ও বিনোদনের পদ্ধদি নিয়ে পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ইসলামী শারী'আতে। ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পরিপার্শিক আচরণগত সকল বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বিধান রায়েছে ইসলামী শারী'আতে।

৭. কঠিন ও কঠোরতার পরিহার

শারী'আ আইনে কঠিনতা ও কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা অবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে কুর'আনের এ আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।"[১৮৯]

---

১৮৮. ড. আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দাওয়াহ* (মিসর : দার উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৭৫), পৃ. ৪৯-১৯২।

১৮৯. আল কুর'আন, ২ : ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

শারী'আ আইনের মূলনীতি হচ্ছে কঠোরতা না করা। যেখানে কঠোরতা ও কষ্ট সেখানে সহজতর করা এ আইনের অন্যতম মূলনীতি।

৮. মানব কল্যাণ শারী'আতের অন্যতম উৎস

কল্যাণকে শারী'আতের অন্যতম মৌল উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এমন প্রদীপ্ত মশাল, যা ইসলামের রাজপথে চলার জন্যে বিশেষ সুবিধা বিধান করে দিয়েছে। এরই আলোকে ইসলামী আইন বিশারদগণ ইজতিহাদ তথা গবেষণার দুরূহ কাজ বিশেষ সুষ্ঠুতাসহকারে সুসম্পন্ন করেছেন এবং সকল ক্ষেত্রে শারী'আতের মূল লক্ষ্য অনুপাতে আইন বিধান রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। মালিকী মাযহাবের আইনবিদগণের মতে, সার্বিক জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সাধারণ অর্থবোধক নস বা টেক্সট বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে এমন কোনো মৌলিক নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিতে হবে, যার ফলে উহা জনস্বার্থ ও শারী'আর উদ্দেশ্য উভয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সকল বিষয়ে শারী'আতের সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান আছে সেই বিষয়ে মুসলিহাত বা মাসালিহ মুরসালা হয় না। কোন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা বা কোন মারাত্মক ক্ষতি প্রতিরোধ বা দূরীভূত করা, শারী'আর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং যেসব মূলনীতির উপর ইসলামী শারী'আতের ভিত্তি স্থাপিত তার পূর্ণতা সাধন করাই মাসালিহ মুরসালার উদ্দেশ্য।

এ সম্পর্কে ইমাম আল গাজ্জালী বলেন, "শারী'আর গুঢ় উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। যা কিছু এ পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে, তাই জনস্বার্থে বলে গণ্য এবং সেটাই কাম্য।"[১৯০]

ইবনে আল কাইয়্যেম বলেন, "শারী'আর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান এবং পার্থিব জগত ও পরকালে জনগণের কল্যাণ সাধন। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সার্বিক ন্যায়-বিচার, দয়া, সুখ-সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে। যেখানে ন্যায়-বিচারের পরিবর্তে নির্যাতন, দয়ার স্থলে

১৯০. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০), পৃ. ১৩৯-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য এবং জ্ঞানের বদলে মূর্খতা স্থান পায়, সেখানে শারী'আর কিছুই করার নেই।"[১৯১]

৯. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

মুসলিম বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি স্বাধীন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, যাদের বিচারকার্যে স্বাধীনতার নজির মুসলমানদের সমপর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। মুসলিম বিচারক কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শের অধীন নন যে, ঐ মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করায় তার ক্ষমতা থাকবে না। তেমনিভাবে তিনি আপন আইনের বলয়ে আবদ্ধ থাকবেন না, যা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ রহিত হবে। বিচারকের উপর কোনো শাসকের বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ থাকবে না। মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে ও ভূখণ্ডে অবস্থান করেছে। শাসকের পরিবর্তন হয়ে ন্যায়পরায়ণ ও জালিম শাসকের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু বিচার বিভাগ দুর্ভেদ্য দুর্গে সংরক্ষিত ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ ও জালেম এবং সত্যনিষ্ঠ ও অত্যাচারী শাসক কারো হাতই তাকে স্পর্শ করেনি। বিচারক ও তার ইজতিহাদের উৎস হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, তত্ত্বাবধায়ক হলো তার বিবেক ও দ্বীনদারী এবং অন্যায়ে বাধাদানকারী হলো তার ঈমান ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

১০. বিচার-বুদ্ধি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে এগিয়ে চলা

ইসলামী শারী'আত বিচার-বুদ্ধির ওপর ভরসা করে। তবে এর মধ্যে অদৃশ্যের উপাদান অতি সীমিত পরিসরে আবদ্ধ থাকে।

(ক) আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার ওপর। অন্ধ অনুসৃতির ওপর কোনো ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। এ অর্থে কুর'আনে বহু আয়াত উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لِأُوْلِي الاَلْبَابِ -

"অবশ্যই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।[১৯২]

---

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৯২. আল কুর'আন, ৩ : ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ইসলামী আকীদায় অদৃশ্য বিষয়াবলী সীমাবদ্ধ। কুর'আনে বলা হয়েছে, "তুমি ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের ও কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের ও কিয়ামতের দিনের প্রতি এবং তুমি ঈমান আনো তাকদীরের উপর এবং তার ভালো ও মন্দের উপর।"

ইসলামী আকীদার এই অদৃশ্য উপাদানগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ পাওয়া গেছে কেবল সেগুলো মানার জন্য মুসলমাদের কাছে দাবি জানানো হয়।

(গ) এই সীমারেখার বাইরে সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান (ইলমে গায়েব) আল্লাহ তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। অদৃশ্যের খবর তিনি খুব ভালো করেই জানেন। আমাদের সবাইকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন,

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ـ

"আল্লাহ তোমাদের অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন না।"[১৯৩] বরং প্রাকৃতিক জগতের বাইরে অহীর মাধ্যমে যতটুকু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি জানার জন্য অনুসন্ধান করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

(ঘ) কুর'আন ও সুন্নাতে অহীকে কয়েক জায়গায় 'হিকমত' আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ـ

"আর সেই কিতাব ও হিকমত, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন।[১৯৪]

কাজেই ইসলামী শারী'আত প্রতিষ্ঠিত আছে হিকমত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিচার-বুদ্ধির ওপর। প্রবৃত্তির কামনা, নির্বুদ্ধিতা, অপরিপক্কতা ও ত্রুটিপূর্ণ বিষয়াদি এর ভিত্তি নয়। কাজেই ইসলামী শারী'আত একটি উদ্দেশ্যমুখী শারী'আত।

(ঙ) ইসলামী শারী'আতের ওপর বুদ্ধিবৃত্তির বিরাট ছাপ রয়েছে। দ্বীনী শারী'আতগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামী শারী'আত এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ এ শারী'আত বুদ্ধির উপর নির্ভরতার পরিসর ব্যাপকতর করেছে। মানুষের হাতে গড়া আইনের মোকাবিলায়ও

---

১৯৩. আল কুর'আন, ৩ : ১৭৯।

১৯৪. আল কুর'আন, ২ : ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক বিচার-বুদ্ধি ইসলামী শারী'আতের একক বৈশিষ্ট্য। কারণ ইসলামী শারী'আত হিকমত, হক, ইনসাফ ও প্রবৃত্তির খায়েশ থেকে দূরে অবস্থান করে না।

ইসলামী শারী'আত গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো ন্যায় শাস্ত্রীয় কিয়াসের পদ্ধতি ব্যবহার করে, কেবল এই অর্থে এ শারী'আত বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না; বরং এ সঙ্গে উসূলী কিয়াসের আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক আরোহ অবরোহর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। উসূলী কিয়াসের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটেছে খালেস ইসলামী শারী'আতের ছত্রছায়ায়।[১৯৫]

(ক) আল্লামা যারাকশী লিখেছেন, "সাহাবায়ে কেরামও নবী (সা.)-এর জামানায়ই কুর'আন-সুন্নাহর আহকামের কার্যকারণের ওপর আলোচনা করেছেন।" ইবনে খালদুন লিখেছেন, "অনেক ঘটনা কুর'আন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত নস-এর আওতায় আসে না। এক্ষেত্রে সাহাবাগণ এই ঘটনাবলীকে প্রমাণিত নসের ওপর কিয়াস করেছেন এবং এগুলোকে এমন সব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন যেগুলোর হুকুম উল্লিখিত আছে। এই সংশ্লিষ্টতার সময় সেই শর্তগুলোও সামনে রেখেছেন যেগুলো থেকে উভয় সদৃশ ঘটনাবলীর (যাকে কিয়াস করা হয় এবং যার ওপর কিয়াস করা হয়) মধ্যে একটা নির্ভুল সামঞ্জস্য জানা যায় এবং এই উভয় ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম একই। এ সম্পর্কে 'যন্নে গালেব' তথা নির্ভুলতার কাছাকাছি জ্ঞান সৃষ্টি হয়। এভাবে সাহাবা কেরামের ইজমার মাধ্যমে কিয়াস শারী'আতের দলীলে পরিণত হয়েছে।

(খ) উসূল শাস্ত্রীয় কিয়াস ন্যায়শাস্ত্রীয় কিয়াস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এরিস্টোটলের ন্যায়শাস্ত্রীয় কিয়াস এমন একটি চিন্তাকর্ম যেখানে বুদ্ধি সার্বিক হুকুম থেকে আংশিক আহকামের দিকে এবং সাধারণ হুকুম থেকে বিশেষ হুকুমের দিকে মধ্যবর্তী সীমানার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। বিপরীত পক্ষে উসূলী কিয়াস একটি গভীর তাত্ত্বিক ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে দু'টি অংশের মধ্যে কোনো অভিন্ন গুণ পাওয়ার কারণে একটি অংশের অবস্থা থেকে অন্য একটি অংশের অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হয়।

(গ) দু'টি মতবাদ বা আইনের কারণে উসূলী কিয়াস এক ধরনের গভীর তাত্ত্বিক আরোহ অবরোহ পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

১৯৫. ড. জামাল উদ্দীন আতীয়া, *ইসলামী শরীয়ত ও বিচার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এ্যান্ড লিগাল এইড সেন্টার, ২০১২) পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এক. কার্যকারণের আইন। প্রত্যেক কাজের পেছনে কার্যকারণ থাকার মতবাদ। অর্থাৎ উসূলবিদদের এ বিষয়ের আলোচনা যে, এ হুকুমটি আসলে অমুক কার্যকারণের ফলে প্রমাণিত।

দুই. ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সমভাবাপন্নতার আইন। এককথায় বলা যায়, একই কার্যকারণ যখন সমভাবাপন্ন অবস্থার আওতায় অস্তিত্ব লাভ করে তখন একই ধরনের কাজের জন্ম দেয়। উসূলবিদদের ভাষায় এ ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে স্থায়ীকৃত হয়ে যাওয়া যে, মূল হুকুমের কার্যকারণ শাখার মধ্যে থাকে। কাজেই সেই কার্যকারণ শাখার মধ্যে পাওয়া গেলে সেটি মূল হুকুমকে অস্তিত্বশীল করবে।

(ঘ) উসূলবিদগণ মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যে কিভাবে কার্যকারণ অনুসন্ধান। উসূলবিদগণ যে পদ্ধতিতে মূল ও শাখার মধ্যে কার্যকরণ অনুসন্ধান করেন তা বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাথে স্পূর্ণ মিল।

১. কার্যকারণের সমভাবাপন্ন হওয়া। কার্যকারণকে সমভাবাপন্ন হতে হবে। অর্থাৎ যেখানে কোনো ধরনের কার্যকারণ পাওয়া যাবে সেখানে হুকুম পাওয়া যাবে। অন্য কথায় বলা যায়, কার্যকারণ হুকুমের সাথে অস্তিত্বশীল হয়।

২. কার্যকারণের প্রতিবিম্বিত হওয়া। অর্থাৎ কার্যকারণ না থাকলে হুকুমও পাওয়া যাবে না। হুকুমের সাথে কার্যকারণও অনস্তিত্বের মধ্যে অবস্থান করে। বিজ্ঞানী মিল এটিকে ব্যাহত পদ্ধতি নাম দিয়েছেন।

৩. নিয়ত আবর্তন। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয় অবস্থায় কর্মফলের সাথে কার্যকারণের অবস্থান করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামই হচ্ছে নিয়ত আবর্তন। কখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় বিপুল পরিমাণে। তাতে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। আবার কখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চূড়ান্ত নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌঁছে না। বিজ্ঞানী মিল একে ব্যাহত ও অব্যাহতের মধ্যে একাত্মতার আইন বলেছেন।

৪. ভিত্তির পরিশুদ্ধতা। হুকুম প্রয়োগস্থলে কোনো কোনো হুকুমকে ঊহ্য করে হুকুমের ভিত্তি নির্ধারণ করা। অর্থাৎ যেসব গুণ কার্যকারণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না সেগুলো বিলুপ্ত করে অবশিষ্ট গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন গুণটি হুকুমের কার্যকারণ তা নির্ণয় করা। আধুনিককালের দার্শনিকগণ একে বলেন বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) ইসলামী শারী'আত ও উসূলী কিয়াসের পদ্ধতি এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার উপর মুসলমানরা মানবিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে নিজেদের তাহযীব তমদ্দুনের ইমারত নির্মাণ করেছেন।

(চ) মুসলমানরা কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরোহ অবরোহের পদ্ধতি ব্যবহার করেনি বরং তারা অনুরূপভাবে হাদীসের পরিভাষা শাস্ত্রে এবং রাবী পরম্পরায় হাদীস বর্ণনা ও তার বুদ্ধিবৃত্তির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দলীল উপস্থাপনের এবং ইতিহাস অনুসন্ধানের পদ্ধতিও ব্যবহার করেছে।

(ছ) সম্ভবত এই বহুসংখ্যক ও বিচিত্র আলোচনা পদ্ধতির কারণে মুসলমান আলেমদের জন্য একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকৃতির বিদ্যা আয়ত্ত করা সহজ হয়ে গেছে। কাজেই একজন মুসলমান আলেম একই সঙ্গে কালাম শাস্ত্র, ফিকহ, ভাষাতত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি একাধিক ইলমে বিশেষ ও ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করে থাকেন।[১৯৬]

২.২ শারী'আ আইনের জনকল্যাণমূলক মূলনীতি

মুসলিম ফিকহবিদগণ জনকল্যাণমূলক এমন কিছু মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যার মাধ্যমে খুঁটিনাটি মাসয়ালা বের করা সহজ হয়।

শারী'আতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে এ আইনগুলো রচিত। নিম্নে কতিপয় আইনের উল্লেখ করা হলো।

اَلضَّرَرُ يُزَالُ -

"ক্ষতি দূর করতে হবে।"[১৯৭]

এ মূলনীতিমূলক আইনটি রাসূল (সা.)-এর বাণীর ভিত্তিতে রচিত। হাদীসটি হলো–

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرارَ -

"ক্ষতি স্বীকার করা এবং অন্যের ক্ষতি করা দুটোই নিষিদ্ধ।"[১৯৮]

الضَّرَرُ لا يُزَالُ بِمِثْلِهِ -

"ক্ষতি রোধ করা যায় না, অনুরূপ ক্ষতির কাজ দ্বারা।"[১৯৯]

---

১৯৬. ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১৯৭. আমীমুল ইহসান, *আল কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৮।

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

الضَّرَرُ الاكْبَرُ يُدْفَعُ بِالضَّرَرِ الاخَفِّ ـ

"বড় মাত্রার ক্ষতি হালকা মাত্রার ক্ষতি দ্বারা প্রতিরোধ করা হবে।"[২০০]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ عَلٰى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ـ

"কল্যাণলাভের তুলনায় বিপর্যয় বন্ধ করার কাজ অগ্রাধিকার পাবে।"[২০১]

اِنْ الْمَانِعَ مُقَدَّمٌ عَلٰى الْمُقْتَضٰى عِنْدَ التَّعَارُضِ ـ

"কোন কাজের নিষেধ ও আদেশের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে নিষেধকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।"[২০২]

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ـ

"আদত-অভ্যাস একটা সুদৃঢ় ভিত্তি।"[২০৩]

اَلْيَقِيْنُ لاَيَزُوْلُ بِالشَّكِّ ـ

"দৃঢ়প্রত্যয় সন্দেহের কারণে দূর হয়ে যেতে পারে না।"[২০৪]

اَلاصْلُ بَرَاءُ الذِّمَّةِ ـ

"দায়িত্বমুক্ত হওয়াটাই আসল অবস্থা।"[২০৫]

اَلْبَيِّنَةُ عِنْدَ الإنْكَارِ عَلَى الْمُدَّعِىْ ـ

"বিবাদী অস্বীকৃত হলে বাদী প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য হবে।"[২০৬]

এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসটি স্মরণযোগ্য :

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّ عِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ ـ

---

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৮।

২০০. প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৮।

২০১. প্রাগুক্ত, পৃ- ৮১।

২০২. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬।

২০৩. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৮।

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

"বিবাদী অস্বীকার করলে বাদী প্রমাণ পেশ করবে এবং যে অস্বীকার করবে (বিবাদী) সে শপথ করবে।"[২০৭]

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ ـ

"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কেও বৈধ করে দেয়।"

হানাফি ফকীহ ইমাম আবু জায়দ দরসী তার 'তাসিমুন নাছর' নামক গ্রন্থে এভাবে ৮৬টি নীতির সংযোজন করেন।[২০৮]

২.৩ মানব রচিত আইনের উপর শারী'আ আইনের শ্রেষ্ঠত্ব

জাগতিক আইন বলতে ধর্মনিরপেক্ষ আইন বা সাম্রাজ্যবাদী যুগে অমুসলিম জাতি বা সম্প্রদায়, বিশেষত খ্রিস্টান জাতি কর্তৃক রচিত আইনকে বুঝায়। ইসলামী আইনের সাথে উপরিউক্ত আইনের উৎপত্তিগত, নীতিগত, বিশ্বাসগত, প্রয়োগগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এ সকল পার্থক্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারী'আ আইন প্রচলিত মানব রচিত আইনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য ও সর্বাধিক কার্যকর। নিম্নে এ শ্রেষ্ঠত্বের দিকগুলো উল্লেখ করা হলো :

ক. আইনের মূল উৎস : ইসলামী আইনের মূল উৎস হলো আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আসমানী কিতাব তথা কুর'আন মাজীদ। ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিধানও এই কুর'আন মাজিদের আলোকে প্রণীত। এককথায় আল্লাহর ওহী-ই হচ্ছে ইসলামী আইনের উৎস। পক্ষান্তরে জাগতিক আইন, তা রাজা-বাদশাহ, একনায়ক, পরিষদ, গণভোট, বহুল প্রচলিত প্রথা, বিচারকমণ্ডলীর রায় অথবা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রণীত হোক না কেন, তা মানুষের দ্বারাই রচিত। এর কুর'আন, সুন্নাহভিত্তিক কোন ভিত্তি তো নেই, এমনকি জাগতিক ভিত্তিও নেই। এর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও স্বার্থ।

খ. আইনের সার্বজনীনতা : ইসলামী আইনের মূল বিধান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধায় এর রয়েছে একটি চিরন্তন, শাশ্বতও অবিনশ্বর বৈশিষ্ট্য। স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্থান-কাল-পাত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ নন। তিনি ভাবপ্রবণতা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, ভুল-ভ্রান্তি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং পরিবেশ ও কালের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি পরামক্রশালী, মহাজ্ঞানী, চিরস্থায়ী ও

---

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

চিরঞ্জীব। তাই স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় তাঁর প্রদত্ত আইন সুদূর প্রসারী। পক্ষপাতমূলক, ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে, চিরস্থায়ী ও শাশ্বত। পক্ষান্তরে জাগতিক আইন বা মানব রচিত আইন স্থান-কাল-পাত্রের সীমায় সীমাবদ্ধ। কারণ এই আইনের রচয়িতা মানুষ স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তার জ্ঞান একেবারেই সীমিত। তার মস্তিষ্ক প্রসূত আইন সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কাঠামো ও সংগঠন-সংস্থার প্রেক্ষিতে প্রণীত হয়। তাই পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনে, জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নয়নে, বিচার-বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তনে এই আইন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের ভাবাবেগ, স্বার্থপরতা ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে তা পক্ষপাতদুষ্ট, ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ, ভাবাবেগতাড়িত এবং একান্তই অস্থায়ী। এর মধ্যে কোন শাশ্বত বৈশিষ্ট্য নেই। যে কারণে সময়ের সাথে সাথে আইনগুলো সংশোধন হতে বাধ্য।

গ. নৈতিকতাবোধ : ইসলামী আইন মানুষকে একটি উন্নত নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে এবং মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধনে ও মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। উন্নত নৈতিক চেতনা ও আখিরাতের জবাবদিহিতার দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার মহান নীতির শিক্ষা প্রদান ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী আইনে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষ চিন্তা করে যে, ইহকাল পরবর্তী জীবনে তাকে তার ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সে অনন্ত জীবনের চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করবে এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অনন্ত দুর্ভোগ পোহাবে। এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সৎজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়, মানব কল্যাণে ব্রতী হয় এবং নিষ্ঠার সাথে সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে। ফলে সমাজে বিরাজ করে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা। পক্ষান্তরে জাগতিক আইন মানুষকে কোনো নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে না। এই আইন মানুষের মৌলিক গুণাবলি ও মানবীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করে মানুষকে পরিণত করেছে নৈতিকভাবে চরম উচ্ছৃঙ্খল। ফলে জাগতিক আইন আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ঘ. স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা : ইসলামী আইন মানবজাতির স্রষ্টা তথা বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা "আল্লাহ" সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নাই। তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, মহাজ্ঞানী, ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছুই তাঁর সামনে বর্তমান। ইসলামী আইন তাঁর অনুসারীদেরকে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে জাগতিক আইন মানব জাতির তথা বিশ্বজাহনের স্রষ্টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। অথবা এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়ে থাকে।

ঙ. ইবাদত-বন্দেগী : ইবাদত-বন্দেগীসংক্রান্ত বিধানসমূহও ইসলামী আইনের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ। কোনো ব্যক্তি বাধ্যতামূলক কোনো ইবাদত ত্যাগ করলে ইসলামী আইনে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পক্ষান্তরে জাগতিক আইন বিজ্ঞান ইবাদত সংক্রান্ত আইনসমূহকে

Dhaka University Institutional Repository

আইনের অঙ্গ বলে স্বীকার করে না। অতএব কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় ইবাদত ত্যাগ করলে, এমনকি তার স্রষ্টাকেও অস্বীকার করলে জাগতিক আইনে তা অপরাধ নয়।

চ. দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ : ইসলামী আইনের পেছনে রয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই আইনের প্রত্যেক অনুসারী বিশ্বাস করে যে, আইন মান্য করলে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত হবে এবং অমান্য করলে উভয় জগতে ধিকৃত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে জাগতিক আইন শুধুমাত্র দুনিয়ামুখী, এখানে পরকালীন অভিনন্দন ও পুরস্কারের কোনো বিষয় নেই।[২০৯]

এসব পার্থক্য ছাড়াও ইসলামী আইনের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোও পার্থিব আইনের সাথে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে।

---

২০৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৭-৬৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন সৃষ্ট সমস্যায় ইজতিহাদের মূল্যায়ন

ইসলামী শারী'আত ও আইন প্রণয়নের ইতিহাসে ইজতিহাদ অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য কার্যকারণ। শারী'আতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজনে এমন বহু নিদর্শন ও এমন কিছু নিয়ম পন্থা রয়েছে যা দ্বারা নতুন সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব।

১. ইজতিহাদের সংজ্ঞা

ইজতিহাদ আরবি শব্দ। এটি একটি ইসলামী পরিভাষা। ইজতিহাদ (اَلْاِجْتِهَادُ) শব্দের মূল হলো জাহদুন (جَهْدٌ) বা জুহদুন (جُهْدٌ)। এর অর্থ চেষ্টা, প্রচেষ্টা চালানো, চূড়ান্ত সাধনা করা, সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো, গবেষণা করা, অনুসন্ধান করা। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর উক্তি اَجْتَهِدُ بِرَايِى ইত্যাদি। আভিধানিকভাবে সূক্ষ্ম বিবেচনায় 'জুহদুন' অর্থ সামর্থ্য, আর 'জাহদুন' অর্থ চূড়ান্ত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ, কঠোর শ্রম বা কষ্ট।[২১০]

উসূল বিদগণের পরিভাষায় : ইজতিহাদ হলো কুর'আন ও সুন্নায় পাওয়া যায় না, এমন বিষয়ের শারয়ী বিধান উদ্ভাবনের জন্যে কোন মুজতাহিদ বা ফকিহ কর্তৃক নিষ্ঠার সাথে নিজের সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সর্বাত্মক চিন্তা গবেষণায় নিয়োজিত করা।[২১১]

১. কাযী বায়দাবি বলেন, هُوَ اِسْتِفْرَاغ الْجُمْدِ فِى دَرْكِ الاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ-

অর্থাৎ "ইজতিহাদ হলো শারয়ী বিধান জানা ও অবগত হওয়ার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।"[২১২]

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন–

هُوَ بَذْلُ الْوَسْعِ لِلتَّوَصُّلِ فِىْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ

অর্থাৎ, শারয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতিহাদ বলা হয়।[২১৩]

---

২১০. জামালউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৩।

২১১. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামি শারীয়া কি? কেন? কিভাবে?* (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১০) পৃ. ১০।

২১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

২১৩. প্রফেসর ড. মুহা. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী শারী'আতে ইজতিহাদের স্বরূপ* (কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক কল এ্যান্ড রিসার্চ, ২০০৭), পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইমাম আবূ হামিদ আল গাযালী বলেন,

بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم باحكام الشرع -

অর্থাৎ "শারয়ী বিধান জানার জন্য মুজতাহিদ কর্তৃক সামগ্রিক চেষ্টা চালানোর নাম ইজতিহাদ।"[২১৪]

৪. ইবনে কুদামার মতে,

بذل الجهود فى طلب العلم باحكام الشرع -

অর্থাৎ "শারয়ী হুকুমসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা চালানোর নাম ইজতিহাদ।"

৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী বলেন, আলেমদের মতে ইজতিহাদ হলো– মর্যাদানুসারে পর্যায়ক্রমিক বিন্যস্ত দলীলসমূহ (কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এ চারটি) থেকে শারী'আতের শাখাপ্রশাখার বিধানসমূহ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।[২১৫]

৬. ড. আবদুল করীম যায়দানের মতে, শারী'আতের কোনো বিধান সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদ কর্তৃক গবেষণা ও উদ্ভাবনের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মানুসারে চেষ্টা সাধনার শেষ সীমানা পর্যন্ত ব্যয় করাকে ইজতিহাদ বলে।[২১৬]

২. ইজতিহাদের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ইজতিহাদ বিভিন্ন ধরনের। ইজতিহাদের প্রকারভেদ জানার মাধ্যমে এর স্বরূপ সম্পর্কে জানা যাবে। নিম্নে ইজতিহাদের প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ক. ইজতিহাদকারীর দিক দিয়ে ইজতিহাদের প্রকারভেদ

ইজতিহাদকারীর দিক দিয়ে ইজতিহাদ দুই প্রকার, যথা–

১. ব্যক্তিগত ইজতিহাদ : যে সকল ইজতিহাদী কর্ম কোন একক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাকে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বলে। আরবিতে যাকে বলা হয় আল ইজতিহাদ আল ফারদী (الاجتهاد الفردى) বা আল ইজতিহাদ আশ শাখসী (الاجتهاد الشخصى)। অধিকাংশ

---

২১৪. ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল গাযালী, *আল মুসতাসফা ফী উসূলিল ফিক্‌হ* (বৈরূত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি), খ. ২, পৃ. ৩৫০।

২১৫. শাহ ওয়ালী উলণ্ঢাহ দেহলবী, *উকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ* (কায়রো : আল মাতবাআতুস সালাফিয়া, ১৩৫৮ হি.), পৃ. ৩।

২১৬. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদী কর্ম এ ধারায় সম্পন্ন হয়। এতে কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তি যখন ইচ্ছে তা সম্পন্ন করতে কাজ করতে পারেন।

২. সামষ্টিক ইজতিহাদ : কোন বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি মিলে যে ইজতিহাদী কর্ম সম্পন্ন করে থাকেন, তাকে সামষ্টিক ইজতিহাদ বলে। আরবিতে একে আল ইজতিহাদ আল ইজমা'ঈ (الاجتهاد الاجماعى) বলে। এটি বিভিন্ন কমিটি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে যৌথ আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে কিংবা কোন সংস্থা বা কয়েকজন গবেষকের যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হতে পারে। এতে কিছু আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমন থাকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে এভাবেই অনেক ইজতিহাদ কর্ম পরিচালিত হয়। তারা কোন নতুন সমস্যা বা বিষয়ের উদ্ভব হলে কুর'আন হাদীসে এর সমাধান না পেলে এতদুভয়ের মূল শিক্ষার আলোকে ইজতিহাদ করতেন। তবে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী সাহাবীগণকে ডেকে এক সাথে বসে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে সে ক্ষেত্রে সমাধান দিতেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)ও ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করেছিলেন। তাদের সামনে কোন বিষয় উপস্থাপন করে পর্যালোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। এটিও সামষ্টিক ইজতিহাদের পর্যায়ভুক্ত।

খ. পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ইজতিহাদের প্রকারভেদ

পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ইজতিহাদ তিন প্রকার। যথা–

১. ব্যাখ্যা, প্রাধান্য ও সামঞ্জস্য বিধানমূলক : কুর'আন সুন্নাহর কোন বক্তব্য ব্যাখ্যা দেয়া, এসব ব্যাখ্যায় উলামার বিভিন্ন মতামতের মাঝে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া এবং বিভিন্ন ধরনের বিপরীতধর্মী মতামতের মধ্যে বা হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার মাঝে কিংবা নতুন পুরাতন প্রেক্ষাপটের মাঝে কোন বিধান কার্যকর করার নিমিত্তে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য যে ইজতিহাদকর্ম পরিচালিত হয়, তা এ পর্যায়ভুক্ত। একে ইজতিহাদে তাওহীদী হিসেবেও নামকরণ করা হয়। এ পর্যায়ে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়। যেমন ব্যভিচার প্রমাণের জন্য আল কুর'আনে চার জন সাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে দেখা যায়, মেডিকেল পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দু জন নর-নারীর যৌনমিলন হয়েছে কি, হয়নি তা প্রমাণ করা যায়। কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। তাই প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় কী বলা হবে যে, কুর'আনের আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে অকার্যকর? না, অবশ্যই অকার্যকর নয়। কারণ মেডিকেল রিপোর্টেও ভুল হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। অহরহ এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তাই চার জন ডাক্তার যদি কোন রিপোর্টের উপর একমত হন কিংবা তাদের চারবার পরীক্ষায় একই রিপোর্ট আসে, তা হলে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে। এভাবে শারী'আর বিধান ও বর্তমান প্রেক্ষাপটের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্যে অধিক কল্যাণ রয়েছে।

২. কিয়াস : কিয়াস অর্থ অনুমান বা আন্দাজ করা। কোন বিষয়ে কুর'আন, সুন্নাহ বা ইজমায় কোন হুকুম যে কারণে গৃহীত হয়েছে, একই ধরণের কারণ যদি অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় তখন একইরূপ হুকুম ঘোষণা করার নাম কিয়াস। অন্যভাবে বলতে গেলে কুর'আন, হাদীস ও ইজমার কোন হুকুম মূল। এসব উৎসের যে কারণে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, অন্য কোন বিষয়ে একই ধরণের কারণ পাওয়া গেলে একই হুকুম প্রযোজ্য করার নাম কিয়াস। উদাহরণস্বরূপ : মদ্যপায়ীর শাস্তি (৮০) আশি বেত্রাঘাত। এ শাস্তি মিথ্যা অপবাদকারীর উপরও দেয়া হয়েছে। কেননা মদ্যপায়ী যখন নেশাগ্রস্ত হয়, তখন সে বাজে কথা বলে। বাজে কথাই মিথ্যা। তাই মিথ্যারোপকারীর জন্য ৮০ বেত্রাঘাত। এখানে মূল মদ্যপায়ীকে ৮০ দোররা। কারণ, মদ্যপায়ী নেশাগ্রস্ত হয়ে মিথ্যা বলে। শাখা, মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি কি হবে? হুকুম, উভয়টির মধ্যে একই কারণ মিথ্যা রয়েছে। অতএব শাখাতে ৮০ দোররা শাস্তি এটি ইজতিহাদের একটি মৌলিক ও সনাতন পদ্ধতি। এ ধরনের ইজতিহাদকে ইজতিহাদে কিয়াসী বলা হয়।

৩. জনস্বার্থ বিবেচনাপ্রসূত ইজতিহাদ : কুর'আন হাদীস তথা ইসলামী শারী'আহ মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থে নিয়োজিত। তার সকল বিধানই মানুষের স্বার্থে। কিন্তু কিছু নতুন নতুন প্রসঙ্গ ও বিষয়ের উদ্ভব ঘটে। যা হয়তো সমকালীন ইজতিহাদকারীগণ কুর'আন ও সুন্নাতে খুঁজে পাননি। এসব ক্ষেত্রে মানুষের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত দেয়াই জনস্বার্থ বিবেচনা প্রসূত ইজতিহাদ। তবে এতে শর্ত হলো ইসলামী জীবন বিধানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সিদ্ধান্তটি এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলে মনে হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন : খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কুর'আন সংকলন করা, আল কুর'আনে হরকত সংযোজন ইত্যাদি। আধুনিককালে যেমন টেস্টটিউবে সন্তান জন্ম দেয়ার বিষয়টি একটি নতুন প্রসঙ্গ। অতীতে তা ছিল না। কুর'আন হাদীসেও এ ব্যাপারে সরাসরি নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না। অপর দিকে কোন দম্পতির সন্তান না হলে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। উভয়টি দাম্পত্য জীবনকে হুমকিতে ঠেলে দিতে পারে। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যা করতে পারে। অথচ শারী'আর লক্ষ্য হলো

Dhaka University Institutional Repository

জীবন রক্ষা করা। তাই টেস্টটিউবে সন্তান উৎপাদনকে জায়েয বলতে হবে। তবে স্বামী ব্যতীত অন্যের শুক্রানু নিয়ে হলে তা জায়েয হবে না। কারণ এতে আরেকটি শারী'আর লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তা হলো বংশ রক্ষা করা। তাই এটি বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো শুক্রানু/ডিম্বানু ও ডিম্ব স্বামী স্ত্রীর হতে হবে। তাদের জীবিত থাকাবস্থায় হতে হবে। কেননা দুজনের কেউ মৃত্যুবরণ করলে বিবাহ বন্ধন থাকে না। এভাবে এসব দিকে জনস্বার্থ বিবেচনা করতে যেয়ে শারী'আর মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

গ. পরিধিগত বিবেচনায় ইজতিহাদ

পরিধিগত বিবেচনায় ইজতিহাদ দুই প্রকার। যথা :

১. ইজতিহাদে মুতলাক : ইজতিহাদে মুতলাক বা ব্যাপক ইজতিহাদ। কোনো বিশেষ মাযহাব বা বিশেষ ব্যক্তির নীতি অবলম্বন ব্যতীত যে ইজতিহাদ করা হয়, তাকে 'ইজতিহাদে মুতলাক' বলে এবং এরূপ ইজতিহাদের অধিকারীকে 'মুজতাহিদে মুতলাক' বলে।

এ পর্যায়ের ইজতিহাদের জন্য মুজতাহিদকে অবশ্যই কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এবং এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আরবি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। অধিকন্তু কুর'আন ও সুন্নাহ বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, এর শ্রেণিসমূহ এবং যুক্তি-প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। বিশিষ্ট সাহাবী (রা.)-গণ ও প্রথম শ্রেণির ইমামগণ এ প্রকারের ইজতিহাদের অধিকারী ছিলেন।

'মুজতাহিদে মুতলাক' আবার দুই প্রকার :

(i) মুজতাহিদে মুস্তাকিল : যিনি কারো সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং ইজতিহাদ করতে ও ইজতিহাদের উসূল বা নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করতে সক্ষম। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) এই শ্রেণির মুজতাহিদ।

(ii) মুজতাহিদে মুন্তাসিব : যিনি প্রথম শ্রেণির মুজাহিদগণের গুণাবলীর অধিকারী হয়েও কোন প্রথম শ্রেণির মুজতাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তার উসূলের অধীনে ইজতিহাদ করেন। ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম মুযানী, ইমাম ইবনে ওয়াহাব ও ইমাম ইবনে কাসেম (র.) এই শ্রেণির মুজতাহিদ।

২. মুজতাহিদে মুকাইয়্যেদ : কোনো বিশেষ মাযহাব বা ব্যক্তির নীতি অবলম্বনে যে ইজতিহাদ করা হয়, তাকে 'ইজতিহাদে মুকাইয়্যেদ' এবং এরূপ ইজতিহাদের অধিকারীকে 'মুজতাহিদে মুকাইয়্যেদ' বলে।

Dhaka University Institutional Repository

মুজতাহিদে মুকাইয়্যেদও দুই প্রকার। যথা :

(i) মুজতাহিদ ফিল মাযহাব : যিনি প্রথম এমনকি দ্বিতীয়, শ্রেণির মুজতাহিদের গুণাবলীরও অধিকারী নন, কিন্তু আপন মাযহাবের নিয়ম (উসূল) অনুসারে ইজতিহাদ করতে সক্ষম। শামসুল আয়িম্মা হালওয়ায়ী ও ইমাম সারাখসী এই শ্রেণির মুজতাহিদ। তারা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব অনুসারে ইজতিহাদ করতে সক্ষম ছিলেন। এরূপ ইজতিহাদের অপর নাম তাহকীকে-মানাত।

(ii) মুজতাহিদ ফিল-ফাতাওয়া : যিনি আপন ইমামের বর্ণিত বিভিন্ন ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্তের মধ্যে উত্তম-অধমের পার্থক্য করতে সক্ষম।

ঘ. প্রয়োগগত দিক থেকে ইজতিহাদের প্রকারভেদ

প্রয়োগগত দিক থেকে ইজতিহাদ আবার দুই প্রকার। যথা :

১. বাস্তবায়নধর্মী : কুর'আন সুন্নাহর কোন হুকুম বাস্তবায়ন করতে বা তার ক্ষেত্র নিরূপন করতে যেয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাকে ইমাম শাতেবী বাস্তবায়নধর্মী ইজতিহাদ নামে অভিহিত করেছেন। যেমন, সালাতের কিবলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা। জীবনযাত্রায় এমন অনেক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেখানে কিবলা কোন দিকে তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ নদী বা সাগরে নৌপথে ভ্রমণে দিকদর্শন যন্ত্র ব্যবহারে সক্ষম না হলে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে কিংবা রাত্রি বেলা হলে কিবলা নির্ধারণ করা দুরূহ। এ অবস্থায় ইজতিহাদ করতে হয়। এভাবে কোন হুকুমের ইল্লত (কারণ) জানার পরও তা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নির্ধারনেও ইজতিহাদ প্রয়োজন হয়। যাকে উসূলে ফিকহের ভাষায় তাহকীকুল মানাত (تحقيق المناط) বলা হয়। হযরত উমর (রা.) এরূপ অনেক ইজতিহাদ করেছেন। যেমন– দুর্যোগকালে চুরির শাস্তিস্বরূপ হাত কাটার বিধান কার্যকর করা থেকে তিনি বিরত থাকেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, এ বিধান কার্যকর করার পরিবেশ তখন ছিল না। এ পরিবেশে সে হুকুম কার্যকর করার ক্ষেত্র নয়। এমনিভাবে শারী'আহ বিভিন্ন হুকুম ব্যাস্তবায়ন পর্বে ক্ষেত্র বা মাত্রা নিরূপণে চিন্তাগত সকল প্রচেষ্টা এ ধরনের ইজতিহাদভুক্ত। ইমাম শাতেবীর মতে এরূপ ইজতিহাদ সকলের পক্ষ থেকে হতে পারে। যা সার্বজনীনও বটে। এটি কোন সময় বন্ধ হয় না।

২. সিদ্ধান্ত প্রদানধর্মী : কুর'আন সুন্নাহর কোন আইনের ব্যাখ্যা দেয়া বা তার আলোকে রায় তথা সিদ্ধান্ত প্রদান করা এ পর্যায়ের ইজতিহাদ বলে গণ্য। প্রচলিত ইজতিহাদ বলতে সাধারণতঃ এ কাজটিকে বুঝানো হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা

প্রথমত: ইজতিহাদের নির্দেশনা আল কুর'আনেই রয়েছে।

দ্বিতীয় : রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ইজতিহাদ করেছেন।

তৃতীয় : রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিগণকে ইজতিহাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আল-কুর'আনের নির্দেশনা : আল কুর'আন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের ইজতিহাদের অনুমতি প্রদান করেছে।

فَاسْئَلُوْا اهْلَ الزِّكْرِانْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ -

"আর তোমরা যদি (কোন বিষয়ে) না জান তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর।"[২১৭]

وَلَوْرُدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْل وَاِلَى ا اُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنِبطُوْنَهُ مِنْهُمْ- -

"আর তারা যদি বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এবং তাদের দায়িত্বশীলদের গোচরে নিয়ে আসত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধান করে, তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।"[২১৮]

وَاَمْرُ هُمْ شُوْرَاى بَيْنَهُمْ- -

"তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিবে।"[২১৯]

হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ : রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করার অনুমতি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসগুলো প্রণিধানযোগ্য :

بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْل اللهِ (ص) قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَايِىْ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِه بِمَا يَرْضٰى بِه رَسُوْلُه -

ক. রাসূল (স.) মুয়াজ (রা.) কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠানোর সময়ে তার কাছে জানতে চাইলেন; কোন বিষয় (ফয়সালার জন্যে) তোমার কাছে উপস্থাপন করা হলে তুমি কী করবে? মুয়াজ (রা.) বলেন, আমি তা ফয়সালা করব আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী।

---

২১৭. আল কুর'আন ১৬ : ৪৩; ২১ : ৭।

২১৮. আল কুর'আন ৪ : ৮৩।

২১৯. আল কুর'আন ৪২ : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে কোন সমাধান না পাও সে ক্ষেত্রে কী করবে? মুয়াজ (রা.) বলেন, তখন আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করবো। রাসূল (স.) জানতে চাইলেন রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহতে ও যদি কোন সমাধান না পাও, সেক্ষেত্রে কী করবে? মুয়াজ (রা.) বলেন, সেক্ষেত্রে আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফয়সালা করবো। তখন রাসূল (স.) মুয়াজ (রা.)-এর বুক চাপড়ে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার রাসূল (সা.)-এর দূতকে এমন হিদায়াত দান করেছেন যা তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করেছে।[২২০]

খ. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : খন্দক অর্থাৎ আহযাবের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল (সা.) সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন ইহুদিগোষ্ঠী বনি কুরাইযার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার। পথিমধ্যেই তিনি সাহাবীদের বনি কুরাইযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে বললেন। তিনি বললেন, তোমরা বনি কুরাইযায় পৌঁছার আগে আসরের নামায পড়বে না। সাহবীগণ রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হলে একদল সাহাবী বললেন, আমরা এখানেই আসরের নামায পড়ব। আরেকদল সাহাবী বললেন, নামাযের সময় চলে গেলেও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মতো আমরা বনি কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামায পড়ব না। সুতরাং একদল সাহাবী সময় মতো পথিমধ্যে আসরের নামায পড়ে নিলেন এবং আরেকদল সাহাবী সময় পার হয়ে যাওয়ার পর বনি কুরাইযায় গিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর রাসূল (স.) সেখানে পৌঁছলে উভয়পক্ষ তাঁকে ঘটনার বিবরণ দিলেন। রাসূল (স.) উভয় পক্ষের যুক্তি ও পন্থাকে সমর্থন করেন। তিনি কোন পক্ষকে ভর্ৎসনা করেননি।"[২২১]

গ. সহীহ বুখারি ও মুসলিমে আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি (খলিফা) উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে এসে বললো, আমার উপর গোসল ফরজ হয়েছে, কিন্তু পানি পাচ্ছি না, এখন আমি কী করবো (কিভাবে নামায পড়বো)? আম্মার তখন উমর (রা.)-কে বলেন : আপনার কি মনে নেই, আপনি এবং আমি এক সফরে ছিলাম এবং (স্বপ্নদোষের কারণে) উভয়ে অপবিত্র হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি পানি না পেয়ে তখন নামায পড়লেন না,

---

২২০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬০৮, হাদীস নং :১৩২৭।

২২১. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১২, হাদীস নং ৪১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়লাম। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ঘটনাটির বিবরণ দিলে তিনি আমাকে বলেছিলেন : তোমার জন্যে এতোটুকু করাই যথেষ্ট ছিলো– একথা বলে তিনি নিজের দুই হাতের তালু জমিনে মারলেন, তারপর হাত উঠিয়ে ফুঁ দিলেন এবং উভয় হাতের তালু দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন অর্থাৎ তায়াম্মুম করলেন।

এসব উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত থেকে কতিপয় বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো :

১. কুর'আন মজিদে ইজতিহাদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

২. উদ্ধৃত প্রথম হাদীস থেকে জানা গেলো আল কুর'আন এবং সুন্নাহয় ফয়সালা পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ করার মধ্যেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টি রয়েছে। ইজতিহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মুয়াযকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেছেন।

৩. উদ্ধৃত দ্বিতীয় হাদীসটি হলো বনি কুরাইযায় গিয়ে নামায পড়া সংক্রান্ত। এখানে বনি কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামায না পড়ার নির্দেশ ছিলো। কিন্তু এই নির্দেশ বাস্তবায়নে সাহাবীগণ দুই রকম আমল করেছেন।

একদল সাহাবী রাসূলূল্লাহ (সা.)-এর আদেশ বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে হুবহু পালন করেন এবং আসরের নামাযের সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও বনি কুরাইযায় না পৌঁছে পথে নামায পড়েননি।

৪. সাহাবীগণের অপর দল রাসূল (সা.)-এর নির্দেশের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে নির্দেশের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেন। ফলে তাঁরা মনে করেন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিলো বনু কুরাইযায় পৌঁছা ত্বরান্বিত করা এবং অকারণে পথে বিলম্ব না করা। নামাযের সময় চলে গেলেও পথে নামায পড়া যাবে না– এমনটি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিলো না।' এই ইজতিহাদের ফলে তাঁরা পথেই সময়মতো নামায পড়ে নেন।

৫. সাহাবীগণের প্রথম গ্রুপের কর্মপন্থা ছিলো সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থভিত্তিক।

৬. দ্বিতীয় গ্রুপের কর্মপন্থা ছিলো ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্দেশের উদ্দেশ্য নির্ণয় করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ভিত্তিক।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সাহাবীগণের উভয় গ্রুপই নিজেদের কর্মপন্থা অনুমোদনের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পেশ করেন। তাঁরা একদল আরেক দলকে দোষারোপ করেন নি।

৮. রাসূলুল্লাহ (সা.) উভয় কর্মপন্থাই অনুমোদন করেন।

৯. তৃতীয় হাদীসটি আম্মার (রা.)-এর হাদীস। জুনুবি (অর্থাৎ বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরজ হওয়া) ব্যক্তি যদি পানি না পায় এবং নামাযের সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, সে সময় করণীয় সংক্রান্ত এ হাদীস থেকে জানা গেলো ঐ সময় পর্যন্ত কুর'আন সুন্নাহয় এ সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়নি। তাই উমর এবং আম্মার দুটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

১০. উমর মনে করেন পানি ছাড়া পবিত্র হওয়া যাবে না। আর পবিত্রতা ছাড়া তো নামায পড়া যায় না। তাই তিনি সময়মতো না পড়ে পরে কাযা করেন।

১১. আম্মার ইজতিহাদ করেন। ইজতিহাদের ভিত্তিতে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়ে নেন।

১২. তারা দু'জনেই নিজ নিজ কর্মপন্থা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উত্থাপন করেন।

১৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) আম্মারের ইজতিহাদি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং তা কিছুটা সংশোধন করে আরো সহজ করে দেন।

এরকম ঘটনা সম্বলিত হাদীস আরো রয়েছে।

এভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই ইজতিহাদের সূচনা হয়। তিনি ইজতিহাদকে উৎসাহিত করেন এবং সাহাবীগণের ইজতিহাদ অনুমোদন করেন।

ইমাম জাসসাস ইজতিহাদ এবং কিয়াসের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে কুর'আন মজিদের বাইশটি আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঊনচল্লিশটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে সাহাবীগণের ইজমা হয়েছে।[২২২]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"আর আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে প্রতিটি বিষয়ের বিবরণ বা নির্দেশনা রয়েছে।"[২২৩]

---

২২২. ইমাম আবু বকর আহমদ ইব্ন আলী আল জাসসাস, *আল ফুসুল ফিল উসূল* (লাহোর : মাকতাবায়ে ইলমিয়া, তাবি), পৃ. ৬৪-১০৯।

২২৩. আল কুর'আন, ১৬ : ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০ হি.) বলেন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ ও ইসতিহসান-এর মাধ্যমে যেসব বিধিবিধান নির্ধারিত হয় সেগুলোও মূলত কুর'আনেরই বয়ান। কারণ সেগুলো বিধান হিসেবে কুর'আন দ্বারা অনুমোদিত।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ (মৃত্যু ২০৪ হি.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে নিজ বান্দাদের জন্যে চার পদ্ধতিতে বিধান দিয়েছেন :

১. কিছু বিধান কুর'আন মজিদেই তিনি স্ববিস্তারে বলে দিয়েছেন। যেমন : কেরান হজ্ব পালনকারী যদি কুরবানির পশু সংগ্রহ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে স্ববিস্তারে বলে দেয়া হয়েছে তাকে হজ্বের দিনগুলোতে তিনটি এবং হজ্ব থেকে ফেরার পর সাতটি রোযা রাখতে হবে।

২. কিছু বিধান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এগুলো কুর'আনের ব্যাখ্যামূলক। যেমন : অযু, গোসল, সালাত, সাওম, যাকাত, উশর, হজ্ব, উমরা, বিয়ে, তালাক, অসিয়ত, মিরাস, ব্যবসা বাণিজ্য, ইজারা, কৃষি, দণ্ড, কিসাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির বিধান।

৩. এমন কিছু বিধান রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে কার্যকর করেছেন, কুর'আনে যেগুলোর উল্লেখ হয় নি। যেমন : রজম।

৪. আর কিছু কিছু বিধান উদ্ভাবনে মুজতাহিদদের জন্যে ইজতিহাদ জরুরি করেছেন। যেমন : ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ কোনো প্রাণী হত্যা করে তবে তার বিনিময় (ফিদিয়া) প্রদান আবশ্যক কিন্তু সেটার পরিমাণ কী তা কুর'আন এবং সুন্নাহয় উল্লেখ করা হয় নি। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ জরুরি।

৪. ইজতিহাদের শর্তাবলি

যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম মুজতাহিদের মধ্যে কিছু গুণাবলীর শর্তারোপ করে আসছেন। যেমন : নিম্নে কয়েকজন আলিমের মত উল্লেখ করা হলো :

ক. ইমাম শাফি'ঈ (র.) : তিনি বলেন, কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান ও গুণ ব্যতীত আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মতামত দেয়া হালাল নয়। তা হলো : আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান, হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান, আরবী কবিতাসহ আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান, এভাবে কুর'আন অনুধাবনে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য জ্ঞান, কম কথা বলা, চিন্তাবিদদের ইখতিলাফ সম্পর্কে জ্ঞান, জন্মগত প্রতিভা ও মেধা। এগুলো থাকলে তিনি হালাল হারামের বিষয়ে মতামত দিতে পারেন।[২২৪]

খ. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) : তিনি বলেন, যিনি শারয়ী বিষয়ে মতামত দিতে চান, তিনি আল কুর'আন ও সুন্নাহর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সহীহ সনদ সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ অধিকাংশ মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে নবী পাক (সা.) যা নিয়ে এসেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন এবং দুর্বল বর্ণনা থেকে সহীহ সনদ পৃথক করা সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য।"[২২৫]

অন্য স্থানে তিনি আরো বলেন : কোন ব্যক্তির মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি গুণ প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ফাতওয়া দেওয়া কিংবা কোন বিষয় ইজতিহাদ করে অভিমত পেশ করা অনুচিত। গুণসমূহ হলো :

ক. নিয়্যত শুদ্ধ হওয়া। কারণ অশুদ্ধ নিয়্যতের মধ্যে নূর থাকে না। ফলে লোকেরা তার কথা থেকেও কোন নূর পাবে না।

খ. তার মধ্যে প্রজ্ঞা, ধৈর্যশীলতা, গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা বিদ্যমান থাকা।

গ. ইজতিহাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়া।

ঘ. যৎসামান্য জীবিকার উপর তুষ্ট থাকা। নতুবা সে নিজ অবস্থানের উপর কায়েম থাকতে সক্ষম হবে না।

ঙ. সমাজ সচেতন হওয়া।[২২৬]

গ. ইমাম আহমদ ইবন হাজার আল মাক্কী আশ শাফিঈ (র.) ও ইমাম নববী (র.) : ইমাম আহমদ ইবন হাজার আল মাক্কী ও ইমাম নববী (শারহুল মুহাযযাবে) বলেন, স্বয়ংসম্পন্ন মুজতাহিদ (মুজতাহিদ মুস্তাকিল) হওয়ার শতার্বলী নিম্নরূপ :

১. ফিকহুস নাফস

২. বিশুদ্ধ মেধা

৩. বিদগ্ধ গবেষণা

৪. বিশুদ্ধ যুক্তি চয়নে পারদর্শিতা

---

২২৪. আবূ বকর আহমদ আল খাতীব আল বাগদাদী, *আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* (রিয়াদ : মাতাবিউল কাসীম, তাবি), ২ খ, পৃ. ১৫৭।

২২৫. প্রাগুক্ত।

২২৬. ইমাম আল জাওযিয়া, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সজাগ দৃষ্টি

৬. শারঈ দলীলসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান

৭. বিচক্ষণতার সাথে দলীল নির্ধারণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ

৮. ফিকহের মৌলিক মাসাইল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি।

ঘ. শায়খ আবু যুহরা : তাঁর মতে ইজতিহাদের জন্য ৮টি শর্ত।

১. আরবী ভাষা জ্ঞান

২. কুর'আন সম্পর্কে জ্ঞান

৩. সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান

৪. যে সব বিষয়ে ইজমা হয়েছে, যেসব বিষয়ে ইখতিলাফ আছে সে সম্পর্কে জ্ঞান

৫. কিয়াস সম্পর্কে জ্ঞান

৬. শারী'আর হুকুম আহকামের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান

৭. সঠিক অনুধাবনশক্তি ও সুন্দর পরিমাপে দক্ষতা

৮. সহীহ নিয়্যত ও নির্মল আকীদা বিশ্বাস

ঙ. ড. আব্দুল করীম যায়দান : তার মতে ইজতিহাদের জন্য শর্ত ৭টি :

১. আরবী ভাষা জ্ঞান

২. আল কুর'আন সম্পর্কে জ্ঞান

৩. সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান

৪. উসূলুল ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান

৫. ইজমা সম্পর্কে জ্ঞান

৬. শারী'আতের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান

৭. ইজতিহাদের জন্য জন্মগত যোগ্যতা।

চ. ইমাম নববী : ইমাম নববী 'আল মিনহাজ; গ্রন্থে ইসলামী আদালতের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন :

১. তাকে মুসলিম হতে হবে।

২. বালেগ ও বিবেকসম্পন্ন হতে হবে।

৩. স্বাধীন হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পুরুষ হতে হবে।

৫. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

৬. শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

৭. ফায়সালা কার্যকর করার মতো শক্তিমান হতে হবে।

ছ. ইমাম গাযালি : ইমাম গাযালি 'আল মুস্তাফা' গ্রন্থে মুজতাহিদের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আটটি শর্তারোপ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. আল কুর'আনের যথার্থ জ্ঞান।

২. সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর যথার্থ জ্ঞান।

৩. কুর'আন সুন্নাহর সামগ্রিক বিধানসংক্রান্ত জ্ঞান।

৪. সেসব বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, যেগুলো সম্পর্কে ইজতিহাদ করা জরুরি। (অর্থাৎ যেগুলো সম্পর্কে কুর'আন ও সুন্নাহয় বিধান পাওয়া যায় না)

৫. ইজতিহাদের মূলনীতি (উসূলে ফিকহ) সংক্রান্ত জ্ঞান।

৬. আরবি ভাষার জ্ঞান (কেননা সরাসরি কুর'আন সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের জন্যে আরবি ভাষা জানা জরুরি।)

৭. নাসেখ ও মানসুখের (রহিত ও রহিতকারী বিধানের) জ্ঞান।

৮. উসূলুল হাদীসের জ্ঞান।

জ. ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহরা : ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহরা 'উসূলুল ফিকহ' গ্রন্থে বলেছেন, ইজতিহাদের শর্তাবলি নিম্নরূপ :

১. আরবি ভাষার জ্ঞান।

২. আল কুর'আনের জ্ঞান।

৩. সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর জ্ঞান।

৪. ইজমা (মতৈক্য) ও ইখতেলাফের (মতভেদের) কারণ জানা।

৫. আহকাম বা বিধানের উদ্দেশ্য জানা।

৬. কিয়াস সংক্রান্ত জ্ঞান।

৭. সুস্থ বিবেক বুদ্ধি।

৮. সুস্থ ও নির্ভুল আকিদা বিশ্বাস।

৯. ইখলাস বা নিয়্যতের নিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) : শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় আল ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ ও ইকদুল জীদ ফী আহকাম আল ইজতিহাদ ওয়া আল-তাক্বলীদে মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলী প্রসঙ্গে বলেন,

১. মুসলিম হওয়া। প্রথমত মুজতাহিদকে মুসলিম হতে হবে। কেননা অমুসলিম কর্তৃক ইসলামী আইনের গবেষণা ত্রুটিমুক্ত হবে না এবং তা মুসলিমের উপর প্রযোজ্য নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।

৩. স্বাধীন হওয়া।

৪. ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

৫. শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া।

৬. আরবি ভাষার জ্ঞানলাভ : মুজতাহিদকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সুদক্ষ হতে হবে। কারণ এ রকম দক্ষ না হলে কুর'আন মাজীদ ও সুন্নাহের শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, বিশেষ পরিভাষা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সমাধান উদ্ভাবন সম্ভব হবে না।

৭. কিতাবুল্লাহর জ্ঞানলাভ : ইজতিহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে অবশ্যই কিতাবুল্লাহ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক মর্ম এবং এর যাবতীয় প্রকারভেদ যথা : আম, খাস, মুসতারেক, মোআউয়াল, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তবে গোটা কিতাবুল্লাহ তথা কুর'আন সম্পর্কে প্রজ্ঞা থাকা শর্ত নয়। বরং আহকাম এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে ৫০০ আয়াত রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখা আবশ্যক।

৮. হাদীসের জ্ঞানলাভ : ইজতিহাদের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে-যে তিন হাজার হাদীস থেকে আহকাম উদ্ভাবন করা হয় সে হাদীসগুলো এবং সেগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে মুজতাহিদকে জ্ঞান রাখতে হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রকাশিত সকল হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখা শর্ত নয়।

৯. ইজমা সম্পর্কিত জ্ঞান : ইজমায়ে উম্মাতের জ্ঞান অর্থাৎ শারী'আতের কোন্ কোন্ আহকাম সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীন বা পরবর্তী ফকীহগণের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় তার পক্ষে কোন বিষয়ে ইজমাবিরোধী মত প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. কিয়াস সম্পর্কিত জ্ঞান : ইজতিহাদের তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, কিয়াসের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। কিয়াসের শর্ত, রুকন ও প্রকারভেদের যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. পূর্ববর্তী ফকিহগণের ফাতওয়া সম্পর্কে জ্ঞান : সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণের ফাতওয়ার বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তারা কোন্ কোন্ মাসআলার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করতেন আর কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন।

১২. ওরফ বা প্রথা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ : লোকের আদত-অভ্যাস বা সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা– অন্য কথায় স্থান ও কালের প্রভেদ এবং মানবজীবনের বাস্তব সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া।

১৩. শারী'আতের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান : ইসলামী শারী'আতের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া।

১৪. বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী : নিয়তকে পরিষ্কার করা, অন্য কথায় ইজতিহাদকারীর মন ও মস্তিষ্ককে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্ত করা অর্থাৎ কুর'আন ও হাদীসকে আপন প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা না করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কুর'আন ও হাদীস হতে যা প্রমাণিত হয় তার সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তিকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করা।

১৫. সৎচরিত্রবান হওয়া : কবীরা গোনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা এবং কোন সগীরা গোনাহ বারবার না করা, অর্থাৎ চরিত্রগতভাবে ভালো লোকদের আস্থাভাজন হওয়া।[২২৭]

৫. ইজতিহাদি মতের সাথে দ্বিমত করার অধিকার

ইজতিহাদ যেমন যুক্তি, দলিল এবং অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়, তেমনি যুক্তি, দলিল ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনো ইজতিহাদি মতামতের ব্যাপারে কোনো মুসলিম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন :

ক. তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন।

খ. তিনি তা খণ্ডন করতে পারেন।

গ. দ্বিমত পোষণ করতে পারেন।

ঘ. একজনের মতের উপর আরেকজনের মতকে প্রাধান্য দিতে পারেন।

ঙ. এতোদিন যে মতের উপর আমল করেছেন, তার চাইতে অধিকতর মজবুত ও প্রমাণিত মত পেলে পূর্বেরটি ত্যাগ করে পরেরটি গ্রহণ করতে পারেন।

---

২২৭. শাহ ওয়ালী উলণ্ডাহ দেহলবী, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

চ. দুটি সঠিক মত পেলে কঠিনটি ত্যাগ করে সহজটি গ্রহণ করতে পারেন।

ছ. যোগ্যতা অর্জন করলে নিজে ইজতিহাদ করতে পারেন।

জ. মজবুত, যুক্তিসঙ্গত, প্রমাণিত ও সহজতর পেলে দশটি ব্যাপারে দশজন ইমাম মুজতাহিদের মত মেনে চলতে পারেন।

ঝ. নিজের জ্ঞান ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার কমতি বা অভাব থাকলে কোনো একজন মুজতাহিদের তকলিদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে পারেন।[২২৮]

৬. ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করে কিভাবে?

ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মতের বিভিন্নতা (ইখতিলাফ) সৃষ্টি হতে পারে। এমনটি হওয়া স্বাভাবিক। তবে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদ আইনের মর্যাদা লাভ করার উপায় হলো :

ক. ইজমা : যদি কোনো ইজতিহাদি মতামতের উপর উম্মতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

খ. আ'ম মকবুলিয়্যত : অর্থাৎ সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদি মতামত যদি উম্মতের উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মুসলমানগণ সাধারণভাবে গ্রহণ করে নেয়, তবে তা আইনের মর্যাদা লাভ করে। যেমন : হানাফি, শাফি'ঈ, হাম্বলি, যাহেরি, মালেকি, যায়েদি ইত্যাদি ফিকহি মতামতসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার সর্বশ্রেণির মুসলিম জনগণ গ্রহণ করে নিয়েছে।

গ. রাষ্ট্র কর্তৃক আইন হিসাবে গ্রহণ করা হলে : যেমন ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করায় হানাফি ফিকহ রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে চালু হয়ে যায়।

ঘ. রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হলে : সরকার যদি কোনো সংস্থাকে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সে সংস্থা যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে, তখন তা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনে পরিণত হয়।

ঙ. আদালতের রায় : রাষ্ট্রীয় কোর্টের কাযী বা বিচারপতি কোনো ইজতিহাদি মতের ভিত্তিতে যখন কোনো রায় প্রদান করেন, তখন তা সরকারিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

---

২২৮. আবদুস শহীদ নাসিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

সকল পর্যায়ের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মুজাতাহিদকে মনে রাখতে হবে শারী'আর উৎস হচ্ছে আল কুর'আন এবং সুন্নাহ। তাই যে কোনো প্রক্রিয়ার ইজতিহাদি আইন অবশ্যই–

১. আইনের উৎস (আল কুর'আন ও সুন্নাহ) থেকে গৃহীত হতে হবে, অথবা

২. আইনের উৎস দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, অথবা

৩. আইনের উৎস কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে স্বাধীন ইজতিহাদ করা হলে, তা ইসলামী আইন বলে গণ্য হবে না।[২২৯]

৭. ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শারী'আতের আইন প্রণয়নে ইজতিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিপুল সম্ভাবনাময় উৎস। ইজতিহাদ থেকে শারী'আতের যেসব হুকুম আহকাম জানা যায় তা যদি অকাট্য ও সন্দেহমুক্ত নাও হয়ে থাকে, তবুও ইজতিহাদ একক উৎস হয়েই থাকবে। ইজতিহাদকে সর্বাবস্থায় তীক্ষ্ণ ও শাণিত করে রাখা আবশ্যক। তাকে সদা কার্যকর না রাখা হলে আল্লাহর বিধানকেই নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর করে দেয়া হবে। তাই ইজতিহাদ অতি আবশ্যক একটি বিষয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ড. ইউসুফ আল কারযারির মতে, আইনগত বিষয়গুলো আজ অনেক বেশি জটিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও অর্থনীতির ন্যায় বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। একজনের ধর্মীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। সূত্র ও অবদানের মধ্য দিয়ে 'দ্বিবিধ লক্ষ্য' অর্জন (double Vision) আলেমদের জন্য একদিকে যেমন জরুরি হয়ে পড়ছে তেমনি অপরদিকে আমাদের সময়ের যথাযথ ও গভীর জ্ঞান, পরিবেশ ও বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান ও উলামাকে অর্জন করতে হবে।[২৩০] ইজতিহাদের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিশেষ দিকগুলো হলো–

ক. নতুন উদ্ভাবন : মানুষের জীবন ও কর্মধারার পরিসর সুবিনস্তৃত ও বৈচিত্রময়। একে মানুষের রুচি, খেয়াল এবং দৃষ্টিকোণ একেক রকমের। এ জীবন গতিশীল ও চির অগ্রসরমান। কোথাও থেমে থাকে না। নতুন থেকে নতুন সাজে সজ্জিত জীবনের এ গতিময়তা মানুষের বৈশিষ্ট্য। এ গতিময়তার উপরই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি মহান

২২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৩।

২৩০. তারিক রামাদান, *মুসলিমের ইউরোপ* (ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০৮), পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর কুদরত ও তাঁর শৈল্পিক গুণের পরিচয়ক। ইমাম সারাখসী (রহ.) বলেন, এমন কোন ব্যাপার নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বৈধ কিংবা অবৈধ, প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয়তার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রত্যেক ব্যাপারে কুর'আন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। কেননা কুর'আন-হাদীসের মূল পাঠ সীমিত ও একপর্যায়ে এসে শেষ হতে বাধ্য। আর চলমান ঘটনাপঞ্জি কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হতেই থাকবে।[২৩১]

খ. কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা : জীবনের পরিসর যত বৈচিত্রময়ই হোক না কেন সর্বাবস্থায় মানুষ শরী'আতের মুকাল্লাফ। কোন কাজ শরী'আতের আওতা বহির্ভূত হয়ে সম্পাদনের অনুমতি নেই। জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক চালানো হলে তার জন্য রয়েছে মহাকল্যাণ ও জান্নাত। আর তা না হলে তার জন্য নির্ধারিত হবে মহা অকল্যাণ ও জাহান্নাম। তাই জীবনের সকল কাজ কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর নেই।

গ. কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুধাবন : কুরআন ও সুন্নাহ হলো প্রধানত জীবন যাপনের মূলনীতির নির্দেশক। এখানে সকল প্রশ্নের সমাধান রয়েছে। তবে কোনটি স্পষ্টভাবে আবার কোনটি মূলনীতি বলে দেয়ার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ যে জিনিসটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে ভাল মনে করেছেন সেটি স্পষ্ট বলেছেন আর যা মূলনীতি-উসূলের আলোকে উত্থাপন ভাল মনে করেছেন, সেটি উসূলের আলোকে পেশ করেছেন। উসূল বলতেও ফকীহগণের বর্ণিত উসূল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর গৃহীত নিজস্ব উসূল।

ঘ. জীবন সমস্যার সমাধান : জীবনকে মহান আল্লাহর মরযী মোতাবেক পরিচালনা করতে হলে জীবনের সর্বাবস্থায় সকল প্রশ্নের জবাব ও পথনির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করা আবশ্যক। আর এ সমাধান ও পথ নির্দেশনা খুঁজতে গেলে সব প্রশ্নের জবাব হয়ত সরাসরিভাবে পাওয়া যাবে না। কোনটি পাওয়া যাবে আবার কোনটি পাওয়া যাবে না। যেটি পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে বিধাতার পথ নির্দেশহীন কাজ করার দায়ে তাকে গুনাহগার হতে হবে। আর যে ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে সেটিও কতটুকু বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করা হল, তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়। এসব কারণেই গোটা জীবনকে বিশুদ্ধ ও যথাসম্ভব নিশ্চিত আস্থা নিয়ে আল্লাহর

---

২৩১. ইমাম সারাখসী, *উসূল আল সারাখসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তুষ্টি মোতাবেক পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কুরআন সুন্নাহর উপর গভীর গবেষণা ও ইজতিহাদ। ইজতিহাদ ব্যতিরেকে সদা নতুন সাজে সজ্জিত গতিশীল ও বৈচিত্রময় মানব জীবনের সকল কাজকর্ম শরী'আতের আদলে স্থাপন করা সম্ভব নয়। এ কাজটি নিজের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব হলে তিনি নিজে করবেন– তাকে বলা হবে মুজতাহিদ। ইসলাম ধর্ম বিশ্বে প্রচলিত সব ধর্মের জন্য চূড়ান্ত ফয়সালাকারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যার উদ্ভব হবে সব সমস্যার যিম্মাদার। অতএব কুর'আন, সুন্নাহ ও এতদসম্পৃক্ত জ্ঞান, এসব কিছুই ঐ প্রবহমান ঝর্ণাধারার অন্তর্ভুক্ত; যা থেকে সমস্যা সমাধানের ধারা উৎসারিত হয়। অনন্তর সাহাবা-ই-কিরাম, তাবিঈন ও ইজতিহাদ বিশেষজ্ঞগণের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন এবং যেসব মূলনীতির নির্দেশনা কুর'আন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোর উপর অপরাপর আহকামকে অনুমান করেছেন এবং কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশনাবলীকে শাখা-প্রশাখা ও চলমান ঘটনাবলীর প্রতি আরোপিত করার জন্য ইজতিহাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এভাবে ইজতিহাদ ও কিয়াস আইনতত্ত্বের মূলনীতিতে একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে স্থান পেয়েছে। এতে করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বোধের পরিমণ্ডল পরিব্যাপ্তি লাভ করে। এই পরিমণ্ডলকে সংকীর্ণ করার কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রবহমান ঝর্ণাধারার গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়া মোটেই কাম্য নয়। কেননা কুর'আন, সুন্নাহ ও বিবেক বুদ্ধির প্রমাণাদি দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, এই পরিমণ্ডল ইসলামের প্রত্যেক যুগেই বিস্তৃতাকারে বিদ্যমান থাকবে।[২৩২] আল কুর'আনে উল্লেখ রয়েছে, "নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"[২৩৩] কুর'আনের এ আয়াতে 'ই'তিবার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; কোন জিনিসের নির্দেশনাকে তার অনুরূপ জিনিসের প্রতি আরোপ করার নামই হলো 'ই'তিবার'। এ কারণেই যে মূল জিনিসের প্রতি তার সামঞ্জস্যশীল জিনিসকে আরোপিত করা হয় তাকে 'ই'বরাত' বলে। কুর'আন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে, "তারা যদি ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাদের মধ্যকার বিজ্ঞ জনদের প্রতি ন্যস্ত করতো তবে তাদের মধ্যে যারা এটা বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা নিজেরাই তা

---

২৩২. মোঃ মফিজ উদ্দিন, *ইসলামী আইন তত্ত্বের ইজতিহাদ ইসলামী আইন তত্ত্বের ইজতিহাদ, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ৪৮।

২৩৩. আল কুর'আন, ৩ :১৩।

Dhaka University Institutional Repository

জানতো"।[২৩৪] কুর'আনের এ আয়াতে আল্লাহ 'ইসতিমবাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লামা সারাখসী (রহ.) তার 'উসূল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ইসতিমবাত'-এর অর্থ হচ্ছে ইজতিহাদের মাধ্যমে কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশাবলীর সঠিক কারণ উদঘাটন করা।[২৩৫]

ঙ. ইসলামের পূর্ণতার প্রমাণ : ইজতিহাদ ইসলামের পূর্ণতার বাস্তব দলিল। এর মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান সব সমস্যার ইসলামী সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এটি না থাকলে ইসলামকে পূর্ণ জীবন বিধান প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন এবং তদনুসারে একটি সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলে তার আদর্শও স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই স্থান বা কালের প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তার যতখানি অংশ স্থান ও কালের প্রভাব হতে মুক্ত ততখানি হয় চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয়, আর যতখানি স্থান বা কাল-সংশ্লিষ্ট, ততখানিতে স্থান-কালের পরিবর্তনের দরুন শূন্যতা দেখা দিতে পারে বা দেখা দিয়ে থাকে। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইসলামে ইজতিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে যুগে যুগে এই শূন্যতা পূরণ করবেন, এটাই হলো ইসলামের বিধান। ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামের জীবনীশক্তি। পর্বত হতে পানি নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলে যেমন নদী মরে যেতে বাধ্য, তেমনি ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেলে ইসলামও মরে যেতে বাধ্য।[২৩৬]

৮. ইজতিহাদ অপরিহার্য

ইসলামী শারী'আ ও আইন প্রণয়নের ইতিহাসে ইজতিহাদ একটা অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য কার্যকারণ। কেননা শারী'আতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন এমন বহু বিষয় ও ব্যাপার আছে যে বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি। সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ অপরিহার্য। ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদুবী (রহ.) তার 'উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় বুদ্ধিমত্তা মানবদেহে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যেমনিভাবে বিশ্বজগতে সূর্য একটা আলোকবর্তিকা। ওটা দ্বারা ভ্রমণ-পথ আলোকিত হয়, যেখানে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের পদচারণা নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ বুদ্ধিমত্তা নিজে নিজের পথ-প্রদর্শক নয় বরং তার কাজ হলো পথটা আলোকময় করা। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর অন্তরই স্বীয় বোধশক্তির আলোকবর্তিকা দ্বারা এর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়। যেমন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পথ আলোকময় হয়ে যায়, কিন্তু

---

২৩৪. আল কুর'আন, ৪ : ৮৩।

২৩৫. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ আস সারাখসী, *উসূল আল সারাখসী*, (হায়দারাবাদ, তাবি), খ. ২, পৃ. ১২৮।

২৩৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা*, (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার গবেষণামূলক পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩), পৃষ্ঠা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

পথ দেখার জন্য কেবল সূর্যালোকই যথেষ্ট নয় বরং চক্ষুজ্যোতিরও প্রয়োজন রয়েছে।[২৩৭] আর চক্ষুজ্যোতিই হলো ইজতিহাদ। আর এ কারণেই শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী (রহ.) প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদকে ফরজ বলে মন্তব্য করেন, "আমি যে বলেছি– প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফরজ। তার কারণ এই যে, ঘটনাবলী অন্তহীন অথচ সে সকল ঘটনা সম্পর্কে শারী'আতের নির্দেশ কী তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই ফরজ। পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সকল যুগের জন্য যথেষ্ট নয়।[২৩৮] ..... যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, একালে মুজতাহিদ পাওয়া যায় না বা যেতে পারে না তারা নিশ্চয় ভুল করেন"।[২৩৯] আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) বলেন, শারী'আত অনুসারে ইজতিহাদ ফরজে কিফায়া। কোন যুগে কেউই যদি এর প্রতি মনোযোগী না হন এবং সবাই-ই তা ছেড়ে দেন তাহলে সবাই গোনাহগার হবেন। ইমাম মাওয়ার্দী, বাগবী, ইমাম ইবনুস সালাহ ও নববী প্রমুখ ইমামগণও একই কথা বলেছেন।[২৪০]

৯. সমসাময়িক বিষয়ে ইজতিহাদের আবশ্যকতা

ইবনে তাইমিয়া থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আরো স্পষ্ট করে বললে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার মাত্রা বেড়ে গেছে, এটি হয়েছে উলামার নিস্পৃহতার কারণে। বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি শেষ দিকের উলামা ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্য ইবনে আল কাইয়্যিম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ ইজতিহাদের সাহায্য ছাড়া শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে ১০ম ও ১১তম শতকের উলামার আইনের ওপর নির্ভর করে থাকা যাবে না। মুয়ামালাতের ফিকহ (সামাজিক ও সরকারি ব্যাপারে) যৌক্তিক বিশ্লেষণমূলক এবং বিশ্বজনীন ইসলামের বিধির ওপর নির্ভরশীল ও সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে এগুলোকে পুনরায় ভেবে দেখতে ও যুগোপযোগী করতে হবে। পশ্চিমা মানদণ্ডে আধুনিক সঠিক চেতনা নিয়ে পুনরায় চিন্তার সুযোগ হয়েছে। ইসলাম যদি চিরন্তন বাণী হিসেবে সব স্থান ও সর্ব সময়ের জন্য হয়ে থাকে, স্থায়ী প্রতিফলনের মাধ্যমে তাকে দেখাতে হবে প্রমাণ, করতে হবে ও প্রকাশ করতে হবে। এগুলো আসবে

---

২৩৭. ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদুবী, *কাশফুল আসরার আলা উসূল আল-বযদুবী* (দিলণ্টী : তাবি) খ. ৪, পৃ. ২৩২।

২৩৮. শাহ ওয়ালী উলণ্ঢাহ দিহলবী, *আল-মুসাফফা*, (দিলণ্টী : আল-মুসাওয়া, তাবি), পৃ. ৭৭।

২৩৯. শাহ ওয়ালী উলণ্ঢাহ দিহলবী, *উকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

২৪০. শাহ ওয়ালী উলণ্ঢাহ দিহলবী, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, (অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতার দিকে সূত্র হতে আর সূত্র হতে বাস্তবতার দিকে। এ পদ্ধতি সর্বত্র ও সবসময় হতে হবে যাতে ইসলামী আইন মাকাসিদ আশশারী'আর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আশ শাওকানি, আল আফগানী, আলকাওয়াকিষি, আবদু, রিদা, আন নুরমী, ইবনে বাদিস, ইকবাল, আল্লামা মওদূদী, আল বান্না ও বেন্নাবীর ন্যায় পরবর্তী কালে রশিদ রিদা, মুহাম্মদ আবু জাহরা, হাসান আহমদ খাল্লাফ এবং সাম্প্রতিককালের গাযালী, ইউসুফ আল কারযাবীর ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিরা নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা আর নতুন নতুন অবস্থা ও সমস্যার ক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যবহারের গুরুত্বারোপ করেন।

১০. সামষ্টিক ইজতিহাদের গুরুত্ব

একজনের জন্য দ্বিবিধ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। উলামাকে নিয়ে এবং নিরপেক্ষ পণ্ডিত বা বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কাউন্সিল বা ফোরাম গঠন করা ছাড়া সমসাময়িক ইজতিহাদ সফল হতে পারে না।

নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিক ইজতিহাদের ওপর নির্ভর না করে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সামষ্টিক ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। এ জাতীয় সামষ্টিক ইজতিহাদ বিশেষভাবে জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পরও ব্যক্তির মতামতের চেয়ে সামষ্টিক মতামত সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী।[২৪১] ড. ইউসুফ আল কারযাবি তার আল ইজতিহাদ আল মুয়ামীর রায়েন আল ইনফিরাত ওয়াল ইনফিরাদ গ্রন্থে আরো বলেন, চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ পরিবেশে গবেষণার সুযোগ দেয়া হলে শূরাভিত্তিক আলোচনার ফলাফল গ্যারান্টিযুক্ত।

আল কারযাবির মতে নির্বাচন, নতুন ইসলামী রুলিং ও সামষ্টিক সিদ্ধান্ত সমসাময়িক ইজতিহাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। গত পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক উলামা এ ধারণাটিই পোষণ করে আসছেন। এ ধারণাটি তখনই এসেছে যখন মনে হয়েছে যে, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে ইসলামী দেশগুলোকে পরিবর্তন আনতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন হচ্ছে তার মোকাবিলায় ইসলামী বিশ্বের বিধি-বিধানের যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে আধুনিকতার

২৪১. তারিক রামাদান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

চ্যালেঞ্জের সামনে ইসলামী বিশ্বকে ইসলামী জবাব দিতে বলা হয়েছে।[২৪২] ইসলামী বিশ্বের সর্বত্রই ইজতিহাদের সার্বিক পুনর্জাগরণের আবশ্যকীয়তা দেখা দিয়েছিল, এ লক্ষ্যে বহুবিদ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী আইন স্থির (Static) কোন বিষয় ইজতিহাদ তারই প্রমাণ। আল্লাহর কিতাব এবং চূড়ান্ত বিধি-বিধানের বেলাতেও বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও যুগোপযোগী করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এবং এটি আজ যুগের চাহিদাও।

১১. অমুসলিম দেশে শারী'আ পালনে মুসলমানদের সমস্যা ও ইজতিহাদ

দীর্ঘ বছর ধরে ইউরোপ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীনের মতো দেশগুলোতে মুসলমানদের ব্যাপক উপস্থিতি, অভিবাসী হয়ে সেসব দেশে বসবাস ও তাদের সন্তানদের নতুন দেশ নতুন পরিবেশ এবং নতুন মানসিক অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে দেশটিকে আপন করে নিয়েছে। এ মৌলিক পরিবর্তন অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে সেগুলোর জবাব দান আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম দিকে কিছু উলামা বিশ্বের একটা বিশেষ ভূগোলের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এখানে দার আল ইসলাম (ইসলামী দেশ) আর আল হারব (যুদ্ধের দেশ) রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে পার্থক্য হলো ইসলামী শাসনের। এখানে আরো বলা হয়েছে যে, দার আল হারবে কিছু কিছু অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া বসবাস করা অসম্ভব। যারা এসব দেশে কাজ করতে এসেছে আর যারা পশ্চিমা দেশগুলোর তাদের পরিবার পরিজনের সাথে বসবাস করছে তাদের কী সমস্যা হয়? তাদের সন্তান আর তাদের আত্মীয়তার কী অবস্থা হয়? অমুসলিম পশ্চিমা একটি নতুন দেশে কি তারা সত্যিকার খাঁটি ও পুরোপুরি নাগরিক হতে পারে, জাতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তারা কি এরূপ অনৈসলামিক দেশে সত্যিকারের নাগরিক হতে পারে?

এ প্রশ্নগুলোর সাথে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যাসমূহের দীর্ঘ একটা তালিকা তৈরি করা যায়। ইজতিহাদের সমসাময়িক উন্নয়নের ধারায় থেকে অনৈসলামিক দেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিশেষ অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে।[২৪৩]

---

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা রক্ষার্থে, বিনা বাধায় খাঁটি আবশ্যকীয় ও স্থায়ী অনুশীলনের অনুমতি, পরিবারের উন্নতি, পরিবার রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের উন্নয়ন ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার উন্নয়ন মুসলমানদের বৈধ উপার্জনের সুযোগ দেয়, যার মধ্য দিয়ে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে এবং সমাজের ওপর কোনরূপ বোঝা হবে না। এ ধরনের বিষয়গুলো মৌলিক অগ্রাধিকার বিষয় হবে এবং যথা শীঘ্রই এগুলোর সমাধান পাওয়া যাবে। এর অর্থ হলো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে একযোগে এগুলোর ওপর কাজ করতে হবে। ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষাগত বিষয় ছাড়া ও নাগরিকদের বিশেষ করে মুসলমানদের স্বাধীনতা, কাজ, ব্যবসার ন্যায় সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট সমাধানের জন্য রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। পশ্চিমা সমাজে এগুলোর উন্নয়ন ও এগুলোর সাথে জড়িত হওয়া শুধু নতুনই নয়, কঠিন ও বটে। কিন্তু কিছু স্পর্শকাতর আইনি প্রশ্ন ও নৈতিক বিষয়ে প্রশ্নের সমাধান এখানে আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে অনৈসলামিক দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের ইসলামী আইনের প্রতি আনুগত্যের সমস্যাটি প্রথমেই এসে দাঁড়ায়।[২৪৪]

১২. যেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ আবশ্যক

যে সব বিষয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে শারী'আতের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল রয়েছে এবং যা সুস্পষ্টভাবে হুকুম প্রকটল করে অথবা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেসব বিষয়ে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। এসব ক্ষেত্রে বরং শারী'আতের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীলের বিরুদ্ধতা করাই সুস্পষ্টরূপে হারাম। যে সব বিষয়ে স্পষ্ট অকাট্য দলীল নেই অথবা যে সব বিষয়ে কোন দলীলই নেই, কোন ইজমা নেই, ইজতিহাদ কেবলমাত্র যেসব ক্ষেত্রেই করা হয়। কেননা সেসব ক্ষেত্রে শারী'আতের দলীল অনুধাবন করা কিংবা তা থেকে কোন হুকুম জানা যায় কিনা এ বিষয়ে মত নির্ধারণে আলোচকদের বিভিন্ন মত হয়ে থাকে। অথবা অন্যান্য ইশারা ইঙ্গিত বা নিদর্শনাদির সাহায্যে আল্লাহর হুকুম জানতে পারার ব্যাপারেও নানা মতের সৃষ্টি হয়। এ কারণেই সেখানে ইজতিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। একথা থেকে আর একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো ফিকহর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পার্থক্য বা মত বিরোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শারী'আতের আইন প্রণয়নে ইজতিহাদ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপুল সম্ভাবনাময় একটি উৎস। ইজতিহাদ থেকে শারী'আতের যেসব হুকুম আহকাম জানা যায় তা যদি অকাট্য ও সন্দেহ বিমুখ নাও হয়ে থাকে, তবু ইজতিহাদ

---

২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

এক একক উৎস হয়েই থাকবে। কেননা মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে একটি মাত্র মতে ঐক্যবদ্ধ হবেন ও একই মত পোষণ করবেন, তা ধারণা করা যায় না। এ কারণে ইজতিহাদ শারী'আতের দৃষ্টিতে একটি প্রার্থিত উৎস ও ব্যবস্থা। যেসব বিষয়ে শারী'আতের হুকুম জানা দরকার তাতে ইস্তিম্বাত করেই আল্লাহর ইচ্ছা জেনে নিতে হবে, যদি ও তার উপর বহু প্রকারের শর্ত আরোপিত হয়েছে। ইজতিহাদকে সর্বাবস্থায় তীক্ষ্ম ও শান্তি করে রাখা আবশ্যক। তাকে সর্বদা কার্যকর না রাখা হলে আল্লাহর বিধানকেই অকার্যকর করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা যে শারী'আত পালনের দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন, তা চিনতে ও জানতে পারাকে ব্যর্থ করে দেয়া হবে। আর এ কাজ যে নিতান্তই হারাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের সমাজে নানা ধরনের মাসয়ালার উদ্ভব হয়েছে। যেমন : টেষ্টটিউবে সন্তান উৎপাদন, জেনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং পদ্ধতি, জিন ও কোষ গবেষণা, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লাভ বা সুদ, রক্ত প্রদান, প্রাণীর অঙ্গ সংযোজন, অঙ্গ স্থানান্তর, দেহের কোন বিশেষ অঙ্গ দান– যেমন কিডনি, চক্ষু ইত্যাদি। এসব বিষয়ে শারী'আতের নির্দেশনা কাম্য। অবশ্য অধুনা এসব বিষয়ে ইজতিহাদ হচ্ছে। তবু আরো বেশি হওয়া প্রয়োজন।

১৩. ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও কার্যাবলি

ইজতিহাদের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ–

ক. কিয়াস : কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে অপর নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে তুলনা করে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণের প্রেক্ষিতে উভয়ের ইতিবাচক বা নেতিবাচক একই বিধান বা ফলাফল সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলা হয়।

খ. আল ইস্তিহসান : এর অর্থ– দুটি করণীয়ের মধ্যে অধিকতর কল্যাণকর ও উপকারী কাজটি নির্ণয় ও নির্ধারণ করা। যেমন : মহিলাদের হাত পায়ের তালু (এবং মুখমণ্ডল) ছাড়া পুরো শরীরই গোপনীয়। এখন তার গোপনীয় কোনো অঙ্গে এমন রোগ হলো যা চিকিৎসার জন্যে মহিলা ডাক্তার না পাওয়ায় পুরুষ ডাক্তারের দেখা, বা স্পর্শ করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় তার সামনে দুটি পথ রয়েছে : ১. শারী'আতের সাধারণ বিধান অনুযায়ী এবং ফিতান থেকে বাঁচার জন্যে ডাক্তারকে দেখাবেন না। ২. রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তারকে দেখাবেন। এই দ্বিতীয় পন্থাটি নির্ণয় করাকে ইস্তিহসান বলা হয়। কারণ এটি কল্যাণকর।

গ. মাসালিহ আর মুরসালা (মাসালাহা) : এর অর্থ বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যেমন : নবীর মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে। তিনি যে মসজিদ তৈরি করে গিয়েছিলেন, পরবর্তীতে জনস্বার্থে তা ভেঙে বড় ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

ঘ. আয যারায়ে : এর অর্থ কার্যকারণের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অর্থাৎ ইতিবাচক উদ্দেশ্য হাসিলে জন্যে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা। যেমন : রাসূল (সা.) হাদিয়া প্রদান এবং গ্রহণকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যাকাত আদায়কারীদের হাদিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

ঙ. আল উরফ : এর মানে প্রচলিত ভালো নিয়ম বা রেওয়াজ। এ ক্ষেত্রে রেওয়াজটিকে প্রত্যাখ্যান করা, বা সংশোধনপূর্বক গ্রহণ করা, বা পুরোপুরি গ্রহণ করার বিষয়ে মত প্রদান করাকে উরফ বলা হয়।

চ. রায় : এক্ষেত্রে দু' ধরণের রায় লক্ষণীয়। ইসলামী আদালতের কাযীর বা বিচারপতির রায়। ইসলামী মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের রায়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শারী'আ আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা, কারণ অনুসন্ধান ও সমাধান

৪.১ শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা

শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক কিছু বাধা ও প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. স্বেচ্ছাচিন্তার যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আওতায় চলে আসে। উপনিবেশিক শক্তিগুলো শুধুমাত্র মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। তারা ঐ সব দেশে প্রচলিত শারী'আতের বিধিবিধানের উপরও থাবা বিস্তার করে। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করে এবং সে দেশে ইউরোপীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি পাকাপোক্ত হয়। অটোম্যান কর্তৃক ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের গুলহেন সনদ (Gulhane charter of 1839) প্রবর্তন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যর্থ মুসলিম অভ্যুত্থানের সময় হতে স্বেচ্ছাচারিতার যুগ শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা যায়। বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং এর অব্যবহিত পরে মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদের ইউরোপীয় ধারণাসমূহ পশ্চিমা আইনকে সম্মুখে ঠেলে দেয় এবং মুক্ত আইনের গতি আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মিশ্র ধারণা এর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিম জাতির জন্য ইসরাঈলী আগ্রাসন একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জরূপে পরিগণিত হয়। শারী'আ আইনের ইতিহাসের এ সপ্তম পর্যায়ে শারী'আ আইন এক চরম পরীক্ষার মধ্যদিয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, পশ্চিমা চিন্তার মহাপ্লাবন ইসলামী দেশগুলোকে ভীষণভাবে হতবুদ্ধি করেছে। এ সময়ে উপনিবেশবাদ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং আধিপত্যবাদের সূত্রে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে যে প্রত্যক্ষ সংশ্রব ঘটে, বিশেষ করে তখন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি শিল্প নির্ভর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং বস্তুবাদ, শিক্ষায় উদারনৈতিকতাবাদ, লিঙ্গ সমতা, একক বিবাহবাদ এবং আরো অন্যান্য জিনিসের ইউরোপীয় ধারণাসমূহ পূর্বাঞ্চলকে পরিব্যাপ্ত করে। এর একটি সুগভীর এবং কার্যকরী ফল দেখা দেয়। অনুসন্ধানী প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসিত হতে থাকে। ধর্ম কী? সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

কী? ইসলামী আইন কী? আমরা এগুলো নির্মূল করে দিব, না প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগুলোর উন্নয়ন করব? একজন মুসলিম কে? এবং তার জন্য কী কী প্রয়োজন? এ সকল প্রশ্ন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্য দিয়ে গভীর থেকে গভীরভাবে মৌলিক এবং জাতীয় আত্মনির্ভরতার প্রশ্নে একত্রে জঠ পাকিয়ে প্রধানরূপে দেখা দেয়।[২৪৫]

খ. উপনিবেশিক শক্তির প্রভাব

উপনিবেশিক শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে মুসলমানদের দীর্ঘ ইতিহাসে একমাত্র ইসলামী শারী'আই ছিল তাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থার উৎস। ইউরোপীয় ও মার্কিন উপনিবেশিক শক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দুনিয়াকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। তারা মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দিয়েছে তাদের রচিত ফৌজদারি, দেওয়ানি ও আন্তর্জাতিক আইন। মুসলিম দুনিয়ায় তারা নিজেদের পছন্দশীল ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতার শীর্ষে আসীন করেছে। যার ফলে তারা শারী'আ আইনকে ক্ষত-বিক্ষত ও এ আইনের কবর রচনা করেছিল। কারণ উপনিবেশিক শক্তি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা ক্ষমতা, উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষে। অন্যদিকে মুসলিম জাতি হয়েছে পরাজিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এ কাজে উপনিবেশিক শক্তিকে ইসলামী সমাজের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে তেমন কোন কষ্ট সাধন করতে হয়নি। বিখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের ভাষায়, النَّاسُ عَلى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ

"বিজিতরা বিজয়ীদের আনুগত্যের ও অনুকরণের দাসে পরিণত হয়।"

গ. রাজনৈতিক অসাধুতা

রাজনৈতিক অসাধুতা শারী'আ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার লাভ শারী'আর প্রতি দায়বদ্ধতাকে অনেকটাই সংকুচিত করেছে। যার ফলে ইসলামের প্রথম চার খলীফার পরবর্তী যুগের শাসন শারী'আ আইনকে প্রভাবিত করছে। খলিফা ও খিলাফতের আবরণে আচ্ছাদিত তথাকথিত খিলাফতের খলিফাগণ আমির-ওমারা, সুলতানদের জবাবদিহিতাহীন শাসন ব্যবস্থা শারী'আ আইনের ধারাগুলোকে ধীরে ধীর পর্যুদস্ত করেছে। সৌভাগ্যের বিষয় হলো রাজনৈতিক অসাধুতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথা : উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়

২৪৫. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি* (ঢাকা : হলি প্রকাশনী, ১৯৯৬) পৃ. ৪৮ ও ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী হওয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা লাভ করেনি। কিন্তু তাও উম্মতের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। আলেম-ওলামা ও সৎলোকদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের টার্গেটে পরিণত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, সাহসী ওলামায়ে কিরাম সর্বদা জালিম শাসক ও দুরাচারী আমিরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। অনেক সময় ওলামায়ে কিরাম প্রতিবাদমুখী ও কলম ছেড়ে তরবারি ও তীর স্পর্শ করেছেন। যেমনটি দেখতে পাওয়া যায়, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও উমাইয়্যা সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে আবদুর রহমান ইবনে আসআস ও তার ফকীহ ও মুহাদ্দিস সাথীদের আন্দোলনে।[২৪৬]

ঘ. শারী'আ আইনকে ধর্মীয় আইন মনে করার প্রবণতা

শারী'আ আইন ঐশ্বরিক এ অজুহাতের ভিত্তিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম এবং ইসলামী আইনকে রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন হতে বাদ দেওয়ার একটা প্রবণতা ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি পাশ্চাত্য ধারার গোঁড়া যুক্তি তীব্রতর হতে লাগল যে, ইসলামী আইন বিবর্তনমূলক নয়, আর তাই তা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনুপযোগী। কাজেই বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন হতে আলাদা করা উচিত। এ ধরনের চিন্তার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও ধর্ম আলাদা; দুটি একই সাথে চলতে পারে না অথবা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র অসম্ভব ও অমূলক। ধর্ম যার যার; রাষ্ট্র সবার। এ সকল নতুন থিউরি জনগণকে দীর্ঘদিনের লালিত পালিত ও পরীক্ষিত শারী'আ আইনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপযোগিতার ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। আধুনিক তরুণ সমাজ মূলত; সামাজিক বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতির মত বিষয়গুলোর মূল দর্শন (Vision) দ্বারা অনেকখানিই প্রভাবিত হয়েছে। মূলত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর মুসলিম জাহানের নেতৃত্বে থাকা ওসমানী খিলাফতের পতন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করার সাহস চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়।

ঙ. ইউরোপীয় আইনের প্রভাব

---

২৪৬. আলণ্ঢামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন*, অনু. ড মাহফুজুর রহমান (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৮৭-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তির প্রভাবে মুসলিম জাহানের নেতৃত্বে থাকা তুর্কি অটোম্যান সম্রাজ্য পশ্চিমা নিয়ম-নীতি দ্বারা ইসলামী আইনে সংস্কারনীতি গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী তুর্কি অটোম্যান সুলতানদের রেখে যাওয়া শারী'আ আইনের অনন্য সাধারণ গ্রন্থ 'কানুননামা' যা রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থার মূলমন্ত্র তা সংস্কার করে 'তানজিমাত' নামে নামকরণ করে (১৮৩৯ খ্রি.)।[২৪৭] ইউরোপীয় প্রাকৃতিক আইনের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরাতন আইন-কানুনকে নতুন ও পুনর্গঠিত ডিক্রি দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের সংস্কার সেনা বাহিনী, অর্থ ব্যবস্থা এবং অনুরূপ বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে এবং সাধারণ প্রশাসনের সংস্কার সাধন করা হয়। এ সময় দেশকে ইসলামী রূপ পরিবর্তন করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ছাঁচে গড়ার জন্য আইন সংকলন বা আইন সংহিতা প্রকাশ করা হয়।[২৪৮] ইউরোপীয় আইনের নীতিতে নৌ-আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং দেওয়ানি কার্যবিধি আইন তৈরি করা হয়। অবশেষে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাজ্য হতে পুরোপুরিভাবে ইসলামী আইন তুলে দেওয়া হয়।[২৪৯] মিশরে মোহাম্মদ আলীর রাজত্বকালে যতদূর সম্ভব ওয়াকফ এবং ব্যক্তিগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে শারী'আ আইনের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, দেওয়ানি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[২৫০] ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোতে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব, ইচ্ছা-পত্র (উইল, অসিয়ত), দান এবং ওয়াকফ ইত্যাদি বিষয়কে ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্র বলে সাব্যস্ত করা হয় এবং যতদূর সম্ভব ইউরোপীয়করণ হতে বিমুক্ত রাখা হয়।[২৫১]

চ. তাকলীদের অনুসরণ

তাকলীদ শব্দটি আরবি। শাব্দিক অর্থ অন্ধ অনুকরণ, কোন প্রকার কারণ জিজ্ঞাসা না করে নিষ্ঠা সহকারে এবং পরিপূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে কোন নীতি বা নিয়ম পালন করার নামই তাকলিদ।

---

২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইনতত্ত্বে তাকলীদ বলতে মুসলিম আইনবিদদের মতের অনুসরণ বুঝায়। যে সম্পর্কে কুর'আন, হাদীস বা ইজমায় কোন সমাধান নেই, সে সম্পর্কে মুসলিম আইনবিদগণ যে অভিমত প্রকাশ করেন তা গ্রহণ করার নাম তাকলীদ। তাকলীদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, শৃঙ্খলার অনুশীলন। যিনি ইসলামী শারী'আ আইনে বিজ্ঞ নন তিনিই তাকলীদ করবেন। যিনি নিজে আইনবিদ তিনি স্বাধীন অভিমত পোষণ করতে পারেন। তাঁর পক্ষে অন্যের অভিমত গ্রহণ করা উচিত নয়।

তাকলীদ ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিক। যে সকল সমস্যার সমাধান ইসলামের চার প্রধান ইমামসহ ইসলামী ফিকহের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তাকলীদ কোন বাধা নয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্রনিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ মানবজীবনকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। গ্যাসীয়ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার মানবজীবনে বিরাট উন্নতি সাধন করেছে। যার ফলে এমন সব সমস্যা ও অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা ইতঃপূর্বে কোন মানুষের কল্পনায়ও উদিত হয়নি। বর্তমান প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ন্যায় বহু জটিল শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। যুগের চাহিদা ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্ব ইজতিহাদ কৌশলটি এখন স্থায়ীভাবে আলেমদের হাতে রয়েছে। যুগের নবতর অনেক প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান তাকলীদী মাসআলাগুলোতে বর্তমান নেই। দীর্ঘকাল তাকলীদভিত্তিক মাসআলার উপর নির্ভর করায় নবতর অনেক সমস্যার সমাধান আসতে অনেক সময় লেগে গেছে, যা কখনো কাম্য ছিল না। ইসলামের বিখ্যাত চার ইমাম, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফি'ঈ (রহ.), ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), তারা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। সমসাময়িক উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধান তারা দিয়েছেন।

সুতরাং শারী'আ আইনে তাকলীদ কোনো বাধা নয়। কিন্তু যে সকল বিষয়ে তাকলীদী মাসআলা নেই সেসকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসআলা নির্ধারণ করা যায়।

ছ. প্রগতিবাদের প্রোপাগান্ডা

বর্তমান বিশ্বে প্রগতিবাদীরা নানাভাবে ইসলাম ও ইসলামী বিধানসমূহকে হেয় প্রতিপন্ন ও এর বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়াচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা বর্তমান যুগে ইসলামী শারী'আহ কার্যকর করার যুক্তিকতা নেই, এ শারী'আত মানব কল্যাণে অকার্যকর ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

স্লোগানে সমাজ, রাষ্ট্র ও আর্ন্তজাতিক মিডিয়া সরব করে রাখে। ইসলামের দণ্ডবিধি বিশেষ করে হত্যার জন্য শিরোচ্ছেদ, ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতের শাস্তি পাথর ছুঁড়ে হত্যা ও অবিবাহিতের শাস্তি একশ বেত্রাঘাতের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে ইসলামী আইনের বিরূদ্ধে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এনে অপপ্রচার করা হয়। এছাড়াও তাদেরকে বিভিন্ন সময় ইসলামী শারী'আহ আইনের বিরূদ্ধে আন্দোলন করতেও দেখা যায়। তাদের এ ধরনের প্রোপাগান্ডার ফলে আইন প্রণেতা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত হয়, মাঝে মাঝে শারী'আহ আইনকে পরিবর্তন করতেও দেখা যায়। তাদের নানামুখী চাপের ফলে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা শারী'আহ আইন প্রণয়ন করতে বাধার মুখে পড়ে।

জ. অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ

ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ করা হয় যে, তা কার্যকর হলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার চরমভাবে ব্যাহত হবে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের একজন মুসলমানের মান-সম্মান ও ইজ্জতের যে মূল্য দেয়া হয় ঠিক একই মর্যাদা দেয়া হয় অমুসলিম নাগরিকের প্রতি, ইতিহাস থেকে সে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিমদের সম্পত্তিতে যে পরিমাণ কর দিতে হয়, ঠিক তেমনি অমুসলিমদেরও একই পরিমাণ কর দিতে হয়; বরং অমুসলিমদের উপর যাকাতের বিধান বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু মুসলমানদের উপর তা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোতে কেবল রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি তথা নির্বাহীপদ ব্যতীত অমুসলিমদের জন্য যে কোনো পদে নিয়োগ লাভ করতে আইনগত কোনো বাধা নেই। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মিসর প্রদেশের অর্থ বিভাগ তথাকার খ্রিষ্টানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।[২৫২]

বাংলাদেশে শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক সমস্যা

ক. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

বাংলাদেশে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। একটি মাদরাসা শিক্ষা এবং অপরটি সাধারণ শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি ইসলামী শিক্ষা বলে দাবি করে এবং দ্বিতীয়টি আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গৌরববোধ করে। যারা মাদরাসায় শিক্ষালাভ করেন তারা কুর'আন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন বটে, কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তেমন

২৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সুযোগ পান না। ফলে মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত সমস্যা আছে, সেগুলোর আধুনিক রূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই লাভ করেন না। ফলে মানবজীবনে সমস্যার যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান কুর'আন ও হাদীসে দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারেন না। এ কারণে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণে প্রযুক্তির দৌড়ে কার্যত ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে আনে।

পক্ষান্তরে যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করেন তারা প্রচলিত দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করতে পারেন বটে, কিন্তু নির্ভুল আদর্শিক জ্ঞানে তারা সমৃদ্ধ হতে পারেন না। এ শিক্ষার নির্ভুল আদর্শিক পাশাপাশি ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করতে তাদেরকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিখে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান রূপে গড়ে তুলতে অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়।[২৫৩]

খ. ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য

বাংলাদেশে যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে দেখতে চান তাদের স্লোগান, লেখনী ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঐক্য লক্ষ্য করা গেলেও কার্যত তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত। ফলে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। তাদের এ অনৈক্য বাংলাদেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে বড় অন্তরায়।[২৫৪]

গ. শারী'আ আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব

বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের আওতায় শিক্ষাদান করা হলেও ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তেমন কোন ধারণাই দেয়া হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো সিলেবাস চালু না থাকায়, ইসলামের রাষ্ট্র ও বিচারনীতিতে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কোনো কোনো পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল খণ্ডিত ও বিকৃত। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর। এটাও বড় ধরনের সমস্যা।[২৫৫]

---

২৫৩. ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচারব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রি. ২০০৭, পৃ. ৩৭৬।

২৫৪. প্রাগুক্ত।

২৫৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. শারী'আ আইনের কার্যকারিতা উপস্থাপনে ব্যর্থতা

ইসলামী আইন যে বহু ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম তা ইসলামের আদর্শের অনুসারীগণ জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। ফলে জনগণের ভেতরে একটি অস্পষ্টতা, ভীতি, সংশয় ও অজ্ঞতা থেকে যাচ্ছে। এটিও একটি সমস্যা।[২৫৬]

ঙ. দেশি-বিদেশি মিডিয়ার অপপ্রচার

ইসলাম বিদ্বেষী দেশি-বিদেশি প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম, বিশেষত শারী'আ আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে এবং জনমতে শারী'আ আইনের বিরুদ্ধে একটি অজানা ভীতি ও সংকোচের জন্ম দিচ্ছে। এ ধারা এখন নতুন যাত্রা পেয়েছে। এতে বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী দর্শন সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এটিও একটি মারাত্মক সমস্যা।[২৫৭]

৪.২ শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়

ক. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন

বর্তমানে ইসলামী শারী'আহ বাস্তবায়নের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো ইজতিহাদ। অর্থাৎ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে ইসলামী শারী'আত প্রগতিবাদের মোকাবিলা করতে সক্ষম প্রমাণ করা। এ শর্তের সাথে সাথে আরো কিছু আমলী শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। এসব শর্ত পাওয়া গেলে ইসলামী শারী'আত বর্তমান সমাজের কল্যাণ সাধনে এবং মানবজীবনে তার কাঙ্ক্ষিত সুফল দানে সক্ষম হবে। এসব আমলী শর্তের অন্যতম শর্ত হলো : জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ ইসলামকে এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে ইসলাম জীবনের সবকয়টি দিককে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং আদালত ইসলামের কিছু বিধান গ্রহণ করবে আর কিছু বিধান ত্যাগ করবে তা হতে পারে না। কারণ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যাকে বিভক্ত করা যায় না। ফলে ইসলামী শারী'আতের একাংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশকে গ্রহণ করলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যিনা, ব্যভিচারের হদ (শাস্তি) বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই এমন ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে লোকেরা হালালভাবে বিয়ে করার জন্য সহজ

---

২৫৬. প্রাগুক্ত।

২৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে এবং অবৈধ যৌনচারের পথ অবরুদ্ধ থাকে। একদিকে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা, মহরের পরিমাণ কমানো, বাসস্থান ও আসবাবপত্র সহজলভ্য করা, বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচ কমানো ও অন্যদিকে সমাজকে যৌন উত্তেজক কর্মকাণ্ডে তথা অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, পর্দাহীনতা, অশ্লীল গল্প-নাটক, উপন্যাস, নাচ-গান, সুড়-সুড়িদানকারী শিল্প সাহিত্য হতে পূত-পবিত্র রাখা সম্ভব হলে তখনই ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে শাস্তিদান যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং বিধানদাতার এ শাস্তি ব্যবস্থাও পুরাপুরিভাবে সার্থক হয়।[২৫৮]

খ. ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা

আধুনিক জীবনে শারী'আ আইনের সুফল পেতে হলে আমাদের এমন এক মুসলিম সমাজ তৈরি করতে হবে যারা শারী'আতের সুবিচারে বিশ্বাসী এবং পূর্ণবিশ্বাস ও সন্তুষ্টির সাথে শারী'আর শাসন কামনা করে। আমাদেরকে এমন মুমিন বিচারক তৈরি করতে হবে যারা ইসলামী শরীআতের পবিত্রতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। এমন ঈমানদার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা-তৈরি করতে হবে যারা বিপদে পড়ে বা উপয়ান্তর না দেখে বরং নিজ উৎসাহেই ইসলামী শারী'আতের হিফাজত ও বাস্তবায়ন করবে এবং সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। এমন একটি ইসলামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে হবে, যারা ইসলামী শারী'আত বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেবে।

বর্তমান সমাজের যে মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা আচার-আচরণ, আদব-কায়দা ও সংগঠন বিরাজমান–এ সবই উপনিবেশিকবাদের সৃষ্টি। উপনিবেশিক আমলে নানান কলা-কৌশলের মাধ্যমে আমাদের মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধ, জীবনযাপন সবকিছু সমাজ থেকে সুকৌশলে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। সুতরাং চিন্তাগত ও মানসিক বিপ্লব সাধন ছাড়া আমাদের এ সমাজ কিছুতেই মুক্তি লাভ করতে পারবে না।

গ. ইজতিহাদের পুনরুজ্জীবিত করা

বর্তমানে ইসলামী শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো ইজতিহাদকে পুনরুজ্জীবিত করা। আধুনিক দুনিয়ার নানামুখী চ্যালেঞ্জ ও প্রগতিবাদের মোকাবিলা করতে ইজতিহাদের বিকল্প নেই।

---

২৫৮. আলণ্ঢামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান যুগে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্প উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও প্রচার, শিল্প-কারখানা, ব্যাংক-বীমা, শ্রমিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ের উদ্ভব, শেয়ার বাজার, এম. এল. এম. ব্যবসার উদ্ভব ইসলামী চিন্তার জগতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষাগ্রহণ (সহশিক্ষা কার্যক্রম), কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান প্রতিযোগিতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে পরিবার ও সমাজে। ইসলামী সমাজে পর্দা প্রথার উপরও এ ধরনের প্রভাব আরো ব্যাপক। বিজ্ঞান, তর্থ্য-প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে বিশ্বায়নের (গ্লোবালাইজেশনের) এক বড় প্রভাব রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপর। এ প্রভাব এখন তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাটক-সিনেমা, ফ্যাশন শো, বিজ্ঞাপন, মডেলিং, নাচ-গান, অভিনয় ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, শিল্পকলা, চিত্রাংকন, পেইন্টিং, ভাস্কর্য নির্মাণ, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণের মতো বিষয়গুলো শারী'আ আইনকে খানিকটা প্রভাবিত করে।

তথ্যপ্রযুক্তির ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সাথে শারী'আতগত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এসব সমস্যার মোকাবিলা করতে ও আধুনিক যুগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে ইজতিহাদ অপরিহার্য। ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের অনেক সমাধান ইতোমধ্যে শারী'আ আইনকে গতিশীল ও বেগবান করছে।

ড. ইউসুফ আল কারযাবী মনে করেন, পূর্বেকার মুজতাহিদগণ বিশেষ করে ইমাম শাফিই (রহ.), মালিক (রহ.), ইবনে হাম্বল (রহ.) ও তাদের বহু অনুসারীর ন্যায় আলেমগণ দীর্ঘদিন মহিলাদের অধিকারের জন্য সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কঠোর রুলিং জারি করেছেন। আমাদেরকে তাদের মতামত ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিবেচনার জন্য, এমনকি আমাদের পূর্ববর্তীগণের সূত্রে বর্ণিত পুরো বিধিবিধান বিবেচনা করে না থাকলে সেগুলোর ব্যাপারেও আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। ড. কারযাবী আরো মনে করেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামত আজকের দিনে বেশি সঠিক। তাঁর মতামত গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন, কুর'আনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বৈধ নিষেধাজ্ঞা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বিবাহের বেলায় মেয়েদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।[২৫৯]

---

২৫৯. তারিক রামাদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. জনমত তৈরি

শারী'আ আইন বাস্তবায়নের জন্য জনমত তৈরি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। উম্মাহর আলেম-ওলামা, তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্বে নিয়োজিত মুবাল্লিগ, মসজিদের ইমাম, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দ্বীনের কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শারী'আ আইনের বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। শারী'আ আইনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব, ইতিহাস, বাস্তবতা, প্রয়োজনীয়তা এবং এ আইনের সফলতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নিম্নের আয়াতটি অধিক যুক্তিযুক্ত :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ-

"অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।"[২৬০]

ঙ. শিক্ষাব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন

ইসলামী বিচারব্যবস্থাকে সম্ভাবনাময় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন সাধারণ আইন শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য যেমন প্রয়োজন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের, তদ্রূপ প্রয়োজন একটি আইন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। এ একাডেমিই আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী আইনের যেসব গ্রন্থ রয়েছে তা শুধু মাতৃভাষায় অনুবাদই করবে না, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা জানার জন্য বর্তমান যুগ চাহিদার দাবি অনুসারে তা নতুনভাবে ঢেলে সাজাবে। শারী'আ আইনের মৌলিক গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা অনুদিত হওয়া আবশ্যক। এ পদ্ধতিতেই পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহ প্রধানত আরবী ভাষায় রচিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণত আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই প্রায়ই ইসলামী আইন ও বিধান সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং তা প্রচার করেন। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, যারা এরকম অর্থহীন

২৬০. আল কুর'আন, ৯ : ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারা পোষণ করেন, তারা নিজেদের অসার চিন্তা ও বিবেকের দৈন্য-দশারই প্রকাশ ঘটান। যদি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ইসলামী আইন শাস্ত্রের (ফিকহ শাস্ত্র) গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন গত দেড় হাজার বছরে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ অর্থহীন বিতর্কেই জড়িয়ে সময় নষ্ট করেননি; বরং তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন এক মহান উত্তরাধিকার।[২৬১]

চ. অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ

বিগত দিনসমূহে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানগণ যে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সবকটি আইনই ছিল ইসলামী আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তারাই এ রাষ্ট্রের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হতেন। তাদের রায় দ্বারা বিচার বিবরণীর বিপুল সম্পদ তৈরি হতো এবং তারা আইনের প্রায় সব বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। এজন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি দলকে বাছাইপূর্বক এ কাজে নিয়োজিত করা, যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি সেসব মূল্যবান বিষয়কেও সাজিয়ে দেবেন। বিশেষত এমন কতিপয় আইন ও বিচার সম্পর্কীয় গ্রন্থ আছে যার বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত জরুরি।[২৬২]

২৬১. ড. মো. মাসুদ আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

২৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্য যাচাই

৫.১ বাংলাদেশে শারী'আ আইনের বিবর্তন

মুসলমান রাজত্বকালে এদেশে ইসলামী আইন সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। ইংরেজ কর্তৃক এদেশ বিজিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারও পূর্বপ্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা স্থির করে, ফলে প্রথম দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালতে শারী'আ আইন ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত করে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা ইংরেজরা স্থির করেছিল যে উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বর্ণ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রথা কিংবা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মকদ্দমায় মুসলমানদের জন্য শারী'আ আইন এবং হিন্দুদের জন্য শাস্ত্রের আইন অপরিহার্যভাবে প্রয়োগ করা হবে। যদি উভয়পক্ষের এক পক্ষ হিন্দু কি মুসলমান হয়, তাহলে বিবাদী পক্ষের আইন ও প্রথা প্রয়োগ করা হবে।[২৬৩] তবে ক্রমে ক্রমে উহার প্রয়োগ হ্রাস পায়। এ ধারাবাহিকতায় এদেশে ৯০.৪% মুসলিম[২৬৪] থাকা সত্ত্বেও আজও শারী'আ আইন অবহেলিত। এদেশে শারী'আ আইনের একটি ধারাবাহিক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

ইসলামী দণ্ডবিধির পরিবর্তন ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতিতে সংস্কার

উপমহাদেশে ইসলামী শারী'আ আইনের আলোকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মোঘল শাসনামল অন্যতম। মোগল শাসনামলে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন পরিচালিত হতো ইসলামী ফৌজদারি আইনের ভিত্তিতে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা পাওয়ার পর দীর্ঘদিন ইসলামী ফৌজদারি বিচার পদ্ধতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের বিচার পদ্ধতির মতো বিচার ও সুশাসনের ধ্যান-ধারণা প্রয়োগ শুরু করে এবং মুসলিম ফৌজদারি বিচার পদ্ধতির পরিবর্তন ও সংশোধন করতে থাকে।

---

২৬৩. Sir George Rankin, *Background of Indian Law* (Cambridge: University Press, 1946), p. 54.

২৬৪. আদমশুমারী, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

আউটলাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টরী গ্রন্থে এম.পি জৈন মুসলমান শাসকদের প্রবর্তিত ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্থলে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তনের এ ধারার বিবরণ দেন নিম্নরূপভাবে–

"ভারতে মোগল সম্রাটদের শাসনামলে, ফৌজদারি বিচার প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম ফৌজদারি আইন সাম্রাজ্যের আইন হিসেবে বিবেচিত– কোম্পানি যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করে, তখনও এ ভূখণ্ডে মুসলিম ফৌজদারি আইন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ এরূপ আইনের স্থিতাবস্থা রাতারাতি পরিবর্তন করেননি, বরং ঐ আইন চালু রাখার বিষয় অনুমোদন করেন। ঐ আইনের অনেকগুলো দৃশ্যমান ত্রুটি ছিল। অনেক নীতিগত বিষয়ে ব্রিটিশদের ন্যায়বিচারের সুবিবেচনা ও সুশীল সরকারের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এমন একটি সমাজের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে এ আইনের পরিকাঠামো নির্দিষ্ট হয়েছিল, যা ছিল ব্রিটিশদের অভ্যুদয়ের পর অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় যে সমাজের উত্তরণ ঘটেছিল তার থেকে অন্তর্নিহিতভাবে আলাদা ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের রেগুলেশন প্রণয়ন ক্ষমতা ব্যবহার করে ধীরে ধীরে মুসলিম ফৌজদারি আইনে পরিবর্তন আনতে থাকে। এভাবে ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের ন্যায়বিচারের ধারণা ও সামাজিক আচরণের ধারা অনুসারে, বাংলার সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনের ভিত্তিতে মুসলিম ফৌজদারি আইন গ্রহণ করতে থাকে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মফস্বল অঞ্চলে কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণের পরবর্তী ১০০ বছর পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম ফৌজদারি আইনের প্রচলন ছিল। যদিও এ সময়ে, বিশেষত ১৮৬০ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রণয়নের মধ্যদিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কারণে বিদ্যমান আইনকে মুসলিম ফৌজদারি আইন হিসেবে চিহ্নিত করাই কষ্টকর ছিল। এ আইন এরূপ পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে মুসলিম আইন বিজ্ঞানের ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে এ্যাংলো-মুসলিম আইনে পরিগণিত হয়েছে।[২৬৫]

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির পক্ষে দেওয়ানির দায়িত্ব গ্রহণ করে বিচার ব্যবস্থার সংস্কার পরিকল্পনার আওতায় বিচার প্রশাসন নিম্নরূপভাবে পরিচালনা করেন–

---

২৬৫. এম পি জৈন, *আউটলাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টরী* (নিউ দিলণ্টী : মানোহার পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃ. ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

মফস্বল দেওয়ানি আদালত : জেলা কালেক্টরকে বিচারিক দায়িত্ব দিয়ে সবধরনের দেওয়ানি মামলা পরিচালনার এখতিয়ার দিয়ে মফস্বল দেওয়ানি আদালত স্থাপন করা হয়। মুসলিম ও হিন্দুদের বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মীয় বিধান প্রয়োগ করা হতো।

মফস্বল ফৌজদারি আদালত : মফস্বল নিযামত বা ফৌজদারি আদালতের সবধরনের ফৌজদারি মামলার বিচারের এখতিয়ার দিয়ে মফস্বল ফৌজদারি আদালত গঠন করা হয়। কাযী ও মুফতিদের ফাতওয়ার দ্বারা ইসলামী আইনের ভিত্তিতে মফস্বল ফৌজদারি আদালত পরিচালিত হতো। কাযী, মুফতি ও মৌলভীদের সমন্বয়ে এ আদালত গঠিত ছিল। জেলা কালেক্টর এ আদালত মাঝেমধ্যে পর্যবেক্ষণ করতেন।

সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিযামত আদালত : মফস্বল আদালতের এখতিয়ারের বাইরে সদর দেওয়ানি আদালত গভর্নর ও কাউন্সিলর সমন্বয়ে গঠিত হয়। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ প্রথম এ আদালত বসে। মফস্বল দেওয়ানি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দুই মাসের মধ্যে এ আদালতে আপিল করা যেতো। সদর নিযামত আদালতের বিচারক উপমহাদেশের লোকজনের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হতো। তাকে বিচারিক কাজে সহায়তার জন্য একজন প্রধান মুফতি ও তিনজন মৌলভী নিয়োগ দেয়া হয়। সদর নিযামত আদালতে মফস্বল নিযামত আদালতের পাঠানো বিষয় বা নিষ্পত্তিকৃত বিষয়ের আপিলের বিচার হতো। মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কারার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিযামত আদালত গহণ করতো। নিযামতের প্রধান হিসেবে নবাব এরূপ আদেশে স্বাক্ষর করতেন। গভর্নর ও কাউন্সিলরগণ এ আদালতে সব বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার কর্মসূচির আওতায় নিযাম ও দেওয়ান নিয়োগের মাধ্যমে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকাদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য পৃথক আদালত স্থাপন করা হয়। ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করতে মুসলিম আইনজ্ঞগণ সহায়তা করতেন। স্থানীয় প্রথা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ইংরেজগণ অভিজ্ঞ ছিলেন না। ফলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এ সময় পর্যন্ত তারা হস্তক্ষেপ করেনি। তবে ফৌজদারি বিচার প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ইংরেজ গভর্নর ও কাউন্সিলরদের উপর ন্যস্ত ছিল। ভারতের মুসলিম ও হিন্দু জনগণের ব্যক্তিগত আইন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হেস্টিংস দেওয়ানি মামলার বিচারে ব্রিটিশ আইনের প্রচলন শুরু করেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিচার প্রশাসনে যে অরাজকতা চলে আসছিল,

Dhaka University Institutional Repository

হেস্টিংস-এর সংস্কারের ফলে তা থেকে মুক্ত হয়ে বিচার সুসংগঠিত আকার লাভ করে। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।[২৬৬]

কোম্পানি আমলে বিচার প্রক্রিয়া

লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রশাসনিক পরিকল্পনার আওতায় আদালত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হলেও মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধ ইসলামী আইন দ্বারা নিষ্পত্তি করা হতো। দেওয়ানি আদালতে এ জন্য ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ আলিম নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফৌজদারি আদালতের বিচারেও ইসলামী আইনের বিধান অনুসরণ করা হতো। বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বর্ণ ধর্মীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দেওয়ানি আদালতে বিচারকগণ হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইন অনুসরণ করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের সময় এ দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহ শারী'আহভিত্তিক ইসলামী আইনের বিধান ও বাদশাহী ফরমান অনুসরণ করে মামলার বিচার করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণের পর রাতারাতি ব্রিটিশ বিচার পদ্ধতি প্রবর্তন করা কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় তারা পূর্বতন বিচার ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখে এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামী দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা চালু রাখে। দেওয়ানি মামলার পক্ষগণ হিন্দু হলে নির্দিষ্ট বিষয়ে হিন্দু আইনের বিধান অনুসরণে বিচার করার সুবিধার্থে হিন্দু পণ্ডিতদের পরামর্শে ইংরেজ বিচারক মামলা নিষ্পত্তি করতেন। দেওয়ানি মামলার পক্ষগণ মুসলিম হলে ইসলামী আইনের বিধান অনুসরণে বিচার করার সুবিধার্থে মৌলভী নিযুক্ত করে তাদের লিখিত মতামত বিবেচনায় নিয়ে ইংরেজ বিচারক বিচার করতেন। জেলার দেওয়ানি আদালতের মত প্রাদেশিক দেওয়ানি আদালত ও সদর দেওয়ানি আদালতে ইংরেজ বিচারকগণ মৌলভী ও পণ্ডিতদের লিখিত মতামত নিয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। ফৌজদারি আদালত ও সদর নিযামত আদালতে কাযী ও মুফতি ইসলামী আইন অনুসারে বিচার করতেন। তবে ইংরেজ বিচারক তাদের কার্যক্রম তদারকি করতেন। কোম্পানি আমলে রেগুলেশন ও আইন দ্বারা ফৌজদারি বিচারের দায়িত্ব ইংরেজ বিচারকদের উপর ন্যস্ত করা হলে কাযী ও মুফতি

---

২৬৬. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা : ইফাবা, ২০১২), খ. ৩, পৃ. ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইন সম্পর্কে মতামত দিয়ে বিচারে সহায়তা করতেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা বাতিল করা হলে ইসলামী আইন সম্পর্কে এরূপ পরামর্শের বিধান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।[২৬৭]

লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক ইসলামী দণ্ডবিধিতে সংস্কার

লর্ড কর্নওয়ালিস ইসলামী দণ্ডবিধিতে সংস্কার সাধন করেন। তিনি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা ও ইসলামী দণ্ডবিধি প্রবর্তন ও সংস্কারপূর্বক আদালতসমূহের ব্রিটিশ আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। এ সময়ে তিনি ৪৮ টি রেগুলেশন জারি করেন। তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের কার্যক্রম একত্রিত করেন।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস ইসলামী দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আদালতের কার্য প্রণালিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। ইসলামী দণ্ডবিধিতে খুনের অপরাধের শাস্তি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের ইচ্ছানুসারে নির্ধারণের পদ্ধতি বাদ দিয়ে খুনের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান করেন। অপরাপর অপরাধের শাস্তি হিসেবে হাত-পা ছেদন করে পঙ্গু করার পরিবর্তে অভিযুক্ত অপরাধীকে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধার প্রচলন করেন। এ সময়ে গভর্নর জেনারেল ও চার কাউন্সিলর সদস্য, প্রধান কাযী এবং দুজন মুফতি নিয়ে সবধরনের নিযামত আদালত পুনর্গঠন করেন। এর কার্যালয় মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা স্থানান্তর করেন। মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ঢাকা ও পাটনার জন্য চারটি কোর্ট অব সার্কিট গঠন করেন এবং প্রত্যেক কোর্টে একজন কাযী ও একজন মুফতি নিয়োগ দেন। সার্কিট জজ বছরে দু'বার জেলায় গমন করে অপরাধের বিচার সম্পন্ন করতেন।

লর্ড কর্নওয়ালিসের রেগুলেশনসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গঠন করা। স্থানীয় প্রথা বিলুপ্ত করে কালেক্টরের নিকট থেকে সব ধরনের রাজস্বের বিচার ক্ষমতা জেলা জজের আওতাভুক্ত করেন। পূর্বের প্রচলিত গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলরদের নিয়ে সদর দেওয়ানি ও সদর নিযামত আদালত গঠন করা হয়। মুসলিম ও হিন্দু জনগণের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়ে পূর্বে প্রচলিত আইন বহাল রাখা হয়। ইউরোপের বিচারককে মুসলিম ও হিন্দু আইন সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রত্যেক আদালতে একজন মুসলিম ও একজন হিন্দু আইন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়।

---

২৬৭. এম পি জৈন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ আদালত স্থাপনের ফলে কাযীদের দ্বারা পরিচালিত দেশীয় আদালতের অবসান হয়।[২৬৮] কাযীর কাজ হয় দলীল সনাক্ত করা, বিবাহ ও অন্যান্য ইসলামী ধর্মীয় উৎসবের নেতৃত্ব দেয়া।

স্যার জনসন কর্তৃক মুসলিম ফৌজদারি আইন সংশোধন : ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার জনসন লর্ড কর্নওয়ালিসের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর মুসলিম ফৌজদারি আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন আনয়ন করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির মানবিক দিক বিবেচনা করে বিচারকগণকে কিছু কিছু শাস্তির ধরণ পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাদণ্ডের প্রথা বাতিল করা হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড প্রথা চালু হয়।[২৬৯]

ব্রিটিশ শাসনামলে ইসলামী বিচার

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট দ্বারা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশ সরাসরি ইংল্যান্ডের রাজার শাসনাধীনে ন্যস্ত হয়। উপমহাদেশের শাসন ও বিচার প্রশাসনে এ আইন ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের পর এ আইন দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে সরাসরি ব্রিটিশরাজ এর অধীনে চলে আসে। পরবর্তীতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়া হাইকোর্টস এ্যাক্ট প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত উপমহাদেশের বিচারব্যবস্থায় যেসব আইন-কানুনের প্রচলন ছিল, তার মধ্যে মুসলিমদের ভূমির উত্তরাধিকার, সম্পত্তি হস্তান্তর, বিবাহ, বর্ণ, ধর্মীয় প্রথা সম্পর্কিত বিধিবিধান উল্ল্যেখযোগ্য। এ সময় পর্যন্ত মুসলিম ফৌজদারি বিচার পদ্ধতিতে বিভিন্ন রেগুলেশন জারীর মাধ্যমে সময়ে সময়ে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বাংলা ও মাদ্রাজের মধ্যে এসব আইনের প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দের চার্টার রাজা প্রথম জর্জ ভারতীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করার বিধান করলেও, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর হয়ে তা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা বহাল থাকে।[২৭০]

ব্রিটিশ কর্তৃক ইসলামী শারী'আ আইন বিধিবদ্ধকরণ

---

২৬৮. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

২৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

২৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসনামলের পূর্বে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ সকল আইন যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ ছিল না। ব্রিটিশরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করে এ সকল আইনকে বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুসলিম ও হিন্দু ব্যক্তিগত আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য ছিল। তবে এরূপ আইনের ব্যাখ্যা প্রদানে কোন কোন সময় ব্যাখ্যাকারীদের নীরব থাকার কারণে বিচারকগণ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করতেন। আইন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজগণ ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি, দেওয়ানি কার্যবিধি, তামাদি আইন, সাক্ষ্য আইনসহ ব্যাপক ভিত্তিতে ব্রিটিশ আদর্শের আইন প্রণয়ন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা লাভের পূর্বে মুসলিম শাসকগণ শারী'আহভিত্তিক বিচার প্রশাসন গড়ে তুললেও বিবাহ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি হস্তান্তরসহ নানাবিধ ক্ষেত্রে মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের ক্ষেত্রে মোকদ্দমার পক্ষদের ধর্মীয় বিধানাবলী প্রযোজ্য হতো। বিচারের পদ্ধতিগত কোন বিধিবদ্ধ আইন না থাকায় হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান, ঐতিহ্য, প্রথা, বিচার-প্রশাসন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুসারে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচার প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে বিচারকার্যে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন চার্টারের অধীনে সৃষ্ট ব্রিটিশ আইন, গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল দ্বারা ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ঘোষিত রেগুলেশন, ১৮৩৩ সালে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহও ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত আইন ও বিচার পদ্ধতিতে অসামঞ্জস্যতার অন্যতম কারণ ছিল। ভারতের জন্য একটি নিয়মিত ও সাধারণ বিচারব্যবস্থা, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত আইনি কাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে উপমহাদেশে প্রচলিত সকল বিধিবিধান, এ্যাক্ট রেগুলেশনসমূহ একত্রিকরণ ও লিখিত আকারে বিধিবদ্ধকরণ বা কোডিফিকশন করার লক্ষ্যে ১৮৩৩ সালে চার্টার এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলকে ভারতের জন্য আইন কমিশন গঠনের নির্দেশ দেয়। উপমহাদেশে প্রচলিত বিচারব্যবস্থা, আইনি কাঠামোর মূল্যায়নসহ প্রচলিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়নে আইন কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ আইন কমিশনগুলো হলো– ক. ১৮৩৪ সালের প্রথম আইন কমিশন, খ. ১৮৫৩ সালের দ্বিতীয় আইন কমিশন, গ. ১৮৬১ সালের আইন কমিশন ও ঘ. ১৮৮৯ সালের আইন কমিশন।[২৭১]

ইঙ্গ মুসলিম আইন

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারকগণ ও ভারতবর্ষের বিচারপতিগণ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৮৯৭ সাল মীমাংসিত আগা মোহাম্মদ বনাম কুলসুম বিবির মামলার রায়ে এই নীতি অনুসরণ করেন যে, যদি আদালতসমূহ কুর'আনের আয়াতসমূহের ব্যখ্যায় ফতোয়া-এ-আলমগীরি বা হানাফী আইন সম্পর্কিত হেদায়ার মত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লিখিত নির্ধারিত বিধিমালার পরিবর্তে নিজেদের মতামত প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তবে আদালতসমূহ মারাত্মক ভুলে পরিণত হবে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংলিশ ন্যায়পরায়ণতা আইনের সূত্রাবলী প্রয়োগ করা হইলে ইসলামী ও ইংলিশ আইন ব্যবস্থার মিশ্রণে অনুপম আইনের সৃষ্টি হয় এবং ইহা ইঙ্গ মুসলিম আইন (Anglo Mohamedan Law) রূপে পরিচিত লাভ করে।[২৭২]

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণিত শারী'আ ভিত্তিক বিভিন্ন আইন : উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শারী'আ আইনের আলোকে প্রণিত আইনগুলো হলো– ক. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯, খ. মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ ও গ. মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯।

পাকিস্তানি শাসনামলে শারী'আ আইনে বিচার

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন দ্বারা লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের পরিকল্পনা অনুসারে উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলের আইন পদ্ধতি, বিচার, প্রশাসন ও আদালতের গঠন কাঠামো সংশোধন সাপেক্ষে প্রায় অপরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান থাকে।

---

২৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৬।

২৭২. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের শাসনাধীনে একটি প্রদেশ ছিল। এ সময়ে পাকিস্তানে দু'দফায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান প্রণীত হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান : পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইন ও বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে ইসলামী নীতিমালা সন্নিবেশিত হয়। পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ইসলামে নির্দেশিত সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সহনশীলতা ও সামাজিক সুবিচারের নীতি অনুসৃত হয়। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন গৃহীত হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তান একটি ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক গবেষণাগার এবং ইসলামিক উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান একজন মুসলমান হবেন এবং ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব মেনে চলা হবে বলেও সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। আইন ও শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখা হয় এবং এর উপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিরোধ মীমাংসা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার বিধান করা হয়। আইন প্রণয়নের নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামের বিধানের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান বিবেচিত হবে। এ সংবিধানে প্রত্যেক প্রদেশে একটি হাইকোর্ট স্থাপনের বিধান করা হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল দায়েরের বিধান করা হয়। অধীনস্থ আদালতসমূহের তত্ত্বাবধানেও হাইকোর্টে আপিল দায়েরের বিধান করা হয়। অধীনস্থ আদালতসমূহের তত্ত্বাবধানেরও হাইকোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন উপমহাদেশে ব্রিটিশদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আইন প্রবর্তিত হয়ে পাকিস্তান আমল, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রায় অপরিবর্তিত আকারে প্রচলিত আছে। তবে ব্রিটিশ আইন প্রণেতাগণ ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রথা তাদের শাসন ক্ষমতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ইসলামী আইন-কানুন একেবারে বিসর্জন দিতে পারেনি; বরং ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইনকেও তা প্রভাবিত করেছে এবং উপমহাদেশের ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন ইসলামী আইন-কানুনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।[২৭৩]

---

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার জর্জ ক্যামবেল তাঁর মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

"আমাদের ফৌজদারি আইনের ভিত্তি এখনো মোহামেডান কোড; তবে আমাদের রেগুলেশনদ্বারা এতে এতোটা পরিবর্তন ও সংযুক্তি ঘটেছে যা খুব কমক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর ব্যবহার, ক্রমাগত সংশোধন দ্বারা আমাদের নিজস্ব ধারা হিসেবে এর উত্থান ঘটেছে। এরুপ পরিবর্তনের ধারায় মূল মুসলিম আইন এবং মুসলমান আইনবিদদের পরামর্শ প্রকৃতপক্ষে খুবই কমক্ষেত্রে নেয়া হয়েছে। এখনো অদৃশ্যমান কাঠামোটি যার উপর পুরো অবকাঠামোটি নির্ভর করছে, তা মুসলিম আইন থেকে প্রত্যাহার করা হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত সঙ্গ খুঁজে পাওয়া দুরুহ হবে অথবা অনেক সাধারণ অপরাধের শাস্তির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি থাকবে না।[২৭৪]

পাকিস্তান শাসনামলে শারী'আ আইনের আলোকে মোট দুটি আইন প্রণিত হয়– ক. মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৮ নং আইন), খ. ওয়াক্ফ অর্ডিন্যান্স (১৯৬২ সালের ১নং অধ্যাদেশ)।[২৭৫]

স্বাধীন বাংলাদেশে শারী'আ আইন

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল মুজিব নগর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করা হয় এবং একই তারিখে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে Laws Continuance Enforcement Order জারী করে বিধান করা হয় যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত সকল আইন চালু থাকবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তান আমলের বিচার ব্যবস্থা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান চালু হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে।

পরবর্তীতে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আবির্ভাব। এ সময়ে এসেও পূর্ব থেকে বলবৎ থাকা শারী'আ আইনের

---

২৭৪. এম পি জৈন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৪।

২৭৫. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি কতিপয় আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইনের সংশোধন করা হয়। এভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে শারী'আ আইনকে স্পর্শ করে নানা বিধান প্রবর্তিত হয়।

৫.২ বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম ও শারী'আ আইনের তুলনামূলক আলোচনা

নিম্নে সংস্কারকৃত বিভিন্ন আইন ও ধারা এবং শারী'আ আইনের মূলনীতির আলোকে তূলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। এখানে শারী'আ আইনের সাথে এ আইনের অসঙ্গতি ও সাংঘর্ষিক দিক তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৫.২.১ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯[২৭৬]

বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান নিবারণ করিবার জন্য আইন: যেহেতু বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান প্রতিরোধ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এই আইন প্রণয়ন করা হলো :

ধারা -১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, এলাকা ও প্রয়োগঃ

(ক) এই আইনকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ নামে অভিহিত করা হবে।

(খ) সমগ্র বাংলাদেশের আওতাভুক্ত এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের উপরই, তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, ইহা প্রযোজ্য হবে।

(গ) ১৯৩০ সনের এপ্রিলের প্রথম দিন হতে এই আইন বলবৎ হবে।

ধারা- ২। সংজ্ঞাঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই আইনে–

(ক) শিশু বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যার বয়স পুরুষ হলো একুশ বছরের নিচে এবং নারী হলো আঠার বছরের নিচে।

(খ) "বাল্যবিবাহ" বলতে ঐ বিবাহকে বুঝায় যার চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের যেকোনো একপক্ষ শিশু;

(গ) বিবাহের চুক্তি পক্ষ বলতে পক্ষগণের যেকোনো এক পক্ষকে বুঝায় যার বিবাহ তদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হওয়ার জন্য প্রস্তুত;

---

২৭৬. ১৯২৯ সনের ১৯ নং আইন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) "নাবালক" বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার বয়স পুরুষ হলে একুশ বছরের নিচে এবং নারী হলে আঠার বছরের নিচে;

(ঙ) "মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন" বলতে ১৯৮২ সনের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫ নং আইন) বা ১৯৮৩ সনে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০নং আইন) বা ১৯৮৪ সনের খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশের অধীন গঠিত কর্পোরেশনকে বুঝায় যার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

(চ) "পৌরসভা" বলতে ১৯৭৭ সনের পৌরসভা অধ্যাদেশের (১৯৭৭ সনের ২৬ নং আইন) অধীনে গঠিত পৌরসভাবে বুঝায় যার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ; এবং

(ছ) "ইউনিয়ন পরিষদ" বলতে ১৯৮৩ সনের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের (১৯৮৩ সনের ৫১ নং আইন) অধীনে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদকে বুঝায় যার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

ধারা-৩। শিশু বিবাহকারী ২১ বৎসর বছরের নিচে পুরুষ লোকের শাস্তি বাতিল করা হয়েছে।

ধারা- ৪। শিশু বিবাহকারীর শাস্তিঃ

যে কেউ ২১ বৎসর বয়সোর্ধ্ব পুরুষ বা আঠারো বয়সোর্ধ্ব মহিলা হয়ে কোন বাল্যবিবাহের চুক্তি করলে, একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য জরিমানায় বা উভয়বিধ শাস্তিযোগ্য হবে।

ধারা- ৫। বাল্যবিবাহ সম্পন্নকারীর শাস্তি :

যে কেউ যেকোনো বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান, পরিচালনা বা নির্দেশ করলে তিনি এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাবাসে, এক হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য জরিমানায় বা উভয়বিধ দণ্ডে শাস্তিযোগ্য হবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে, তার বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, উক্ত বিবাহ কোন বাল্যবিবাহ ছিল না।

ধারা- ৬। বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতার বা অভিভাবকদের জন্য শাস্তি :

Dhaka University Institutional Repository

যেক্ষেত্রে কোন নাবালক কোন বাল্যবিবাহের চুক্তি করে, সেক্ষেত্রে ঐ নাবালকের ভারপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি, পিতা-মাতা হউক বা অভিভাবক হউক বা অন্য কোন সামর্থ্যে হউক, আইনসম্মত হউক বা বেআইনি হউক যদি উক্ত বিবাহে উৎসাহ প্রদানের কোন কাজ করেন, অথবা উহা অনুষ্ঠিত হওয়া হতে নিবারণ করতে অবহেলার দরুন ব্যর্থ হন, তিনি এক মাস পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য বিনাশ্রম কারাবাসে বা একহাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য জরিমানায় বা উভয়বিধ দণ্ডে শাস্তিযোগ্য হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলাই কারাবাসে শাস্তিযোগ্য হবে না।

এই ধারার উদ্দেশ্যে যদি না এবং যতক্ষণ না বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়, এই অনুমান করতে হবে যে, যেক্ষেত্রে কোন নাবালকের বাল্যবিবাহের চুক্তি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে উক্ত নাবালকের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া হতে নিবারণ করতে অবহেলার দরুণ ব্যর্থ হয়েছেন।

ধারা- ৭। ৩ ধারা অধীনে অপরাধের জন্য কারাবাস প্রদান করা হবে না

১৮৯৭ সনের সাধারণ দফা আইনের ২৫ ধারায় অথবা দণ্ডবিধির ৬৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত যেকোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও ৩ ধারার অধীনে কোন অপরাধীকে দণ্ডদানকারী আদালত এই মর্মে নির্দেশ দান করবে না যে, আরোপিত জরিমানা অনাদায়ে তাকে যেকোন মেয়াদের কারাবাস ভোগ করতে হবে।

ধারা- ৮। এই আইনের অধীনে এখতিয়ার

১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি কোডের ১৯০ ধারায় অন্তর্ভুক্ত যেকোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত কোন আদালতই এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অধিগ্রহণ বা বিচার করবে না।

ধারা- ৯। অপরাধের বিচারার্থে অধিগ্রহণ করিবার পদ্ধতি

কোন আদালতই ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন কর্তৃক অথবা যদি উক্ত এলাকায় কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন না থাকে, তা হলে সরকার এতদপক্ষে নির্ধারণ করতে পারেন এমন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনীত অভিযোগের ভিত্তি ব্যতীত এই আইনের কোন অপরাধের বিচারার্থে অধিগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করবেন না এবং ঐরূপ অধিগ্রহণ কোন ক্ষেত্রেই যে তারিখে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে বলা হয়, সেই তারিখ হতে এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর করা হবে না।

ধারা- ১০। এই আইনের অধীন অপরাধের প্রারম্ভিক অনুসন্ধান

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারার্থে অধিগ্রহণকারী আদালত ১৯৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি কোডের ২০৩ ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অভিযোগ খারিজ না করলে, হয় ঐ কোডের ২০২ ধারা মোতাবেক স্বয়ং অনুসন্ধান করবে, অথবা উহার অধঃস্তন কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে ঐরূপ অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেবে।

ধারা- ১১। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারা ১২(৫) দ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

ধারা- ১২। এই আইন অমান্য করিয়া নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষমতা

(১) এই আইনে অন্তর্গত বিপরীত কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও আদালত এই আইন লঙ্ঘনক্রমে বাল্যবিবাহ ব্যবস্থিত হয়েছে বা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত, এই মর্মে কোন অভিযোগের মাধ্যমে বা অন্যভাবে উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্য হতে সন্তুষ্ট করে ঐরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ করে এই আইনের ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ধারায় উল্লিখিত যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

(২) উপধারা (১) মোতাবেক কোন নিষেধাজ্ঞাই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জারি করা যাবে না, যদি না আদালত ঐরূপ ব্যক্তিকে পূর্বাহ্নে নোটিশ প্রদান করে এবং তাহাকে নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়।

(৩) আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছে বা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে (১) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত যেকোন আদেশ প্রত্যাহার করতে বা পরিবর্তন করতে পারে।

(৪) যেক্ষেত্রে এরূপ আবেদনপত্র পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আদালত উহার সমক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অথবা উকিল মারফত আবেদনকারীকে একটি আগ-শুনানির সুযোগ দেবেন এবং যদি আদালত আবেদনপত্র বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে এইরূপ করার কারণ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) যে কেউ এই ধারার (১) উপধারা অনুসারে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েও সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, তাহা হলে তাকে তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য জরিমানায় অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না।

পর্যালোচনা

১৯২৯ সালের প্রণীত এ আইনটির মাধ্যমে ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংস্কারমূলক উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। সংস্কারকৃত আইনগুলোর কতিপয় মৌলিক ধারায় শারী'আ আইনের সরাসরি বিরোধ রয়েছে। অথচ এ আইনগুলোকে মুসলিম পারিবারিক আইন হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ১২ নং ধারায় এ আইনের কতিপয় সংশোধনী রয়েছে। এতৎসম্পর্কিত শারী'আ মূলনীতি সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন-এর ১২ নং ধারার পর্যালোচনায় বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

৫.২.২ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শারী'আত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭[২৭৭]

বাংলাদেশে মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসিলম ব্যক্তিগত আইন (শারী'আত) প্রয়োগের বিধান করবার জন্য আইন।

যেহেতু বাংলাদেশে মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও আওতা :

(১) এই আইন ইসলাম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ বলে অভিহিত হবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশ ইহার আওতাভুক্ত।

২। মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইনের প্রয়োগ :

বিপরীত কোন প্রথা বা রীতি থাকা সত্ত্বেও উইলহীন উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা চুক্তি বা দান বা ব্যক্তিগত আইনের অন্যকোন বিধানানুযায়ী লব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিসহ নারীদের বিশেষ সম্পত্তি, বিবাহ, তালাক, ইলা, যিহার, লিয়ান, খুলা ও মুবারাতসহ

২৭৭. ১৯৩৭ সনের ২৬ নং আইন।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহভঙ্গ, খোরপোষ, দেনমোহর, অভিভাবকত্ব, দান, অছি, অছি সম্পত্তি ও (দাতব্যালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য ও ধর্মীয় সম্পত্তি ব্যতীত) ওয়াকফসংক্রান্ত সকল প্রশ্নে (কৃষি জমি সম্পর্কিত প্রশ্ন ব্যতিরেকে) যে সকল মামলায় পক্ষগণ মুসলমান সেসব মামলার সিদ্ধান্ত বিধি মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) হবে।

৩। ঘোষণা করবার ক্ষমতা :

(১) যে ব্যক্তি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করেন যে,

(ক) সে একজন মুসলমান, এবং

(খ) সে **১৮৭২** সনের চুক্তি আইনের **১১** ধারার অর্থে চুক্তি করবার যোগ্য, এবং

(গ) সে বাংলাদেশের একজন আবাসী;

সে নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারে যে, এই ধারার বিধানাবলীর সুবিধা লাভে ইচ্ছুক এবং তারপর ২ ধারার বিধানাবলী ঘোষণাকারী ও তার সকল নাবালক সন্তান ও তার বংশধরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২) যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (১) উপধারা অনুযায়ী ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, সে ক্ষেত্রে ঘোষণা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সরকার এতৎপক্ষে সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ অফিসারের নিকট আপিল করতে পারেন এবং এরূপ অফিসার আপিলকারী ঘোষণা করবার অধিকারী বলে সন্তুষ্ট হলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে আদেশ দিতে পারেন।

৪। বিধি প্রণয়নকারী ক্ষমতা :

(১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী কার্যকরী করবার জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারেন।

(২) বিশেষ করে এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণত্বের হানি না করে, উক্ত বিধিমালা নিম্নরূপ বিষয়াদির সবগুলোর বা যে কোনটির জন্য বিধান করতে পারে, যথা-

(ক) যে কর্তৃপক্ষের নিকট ও যে ফরমে এই আইনের অধীন ঘোষণা করতে উহা নির্ধারণের জন্য;

(খ) ঘোষণা দাখিলকরণের জন্য এবং এই আইনের অধীন কর্তব্য পালনরত কোন ব্যক্তির বেসরকারি আবাসে হাজিরার জন্য, প্রদত্ত ফি নির্ধারণের জন্য এবং যে সময়ে উক্ত ফি প্রদেয় হবে এবং যে ধরনের উহা ধার্য করা হবে উহা নির্ধারণের জন্য।

(৩) এই ধারার বিধানাবলীর অধীন প্রণীত বিধিমালা অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হবে এবং উহার ফলে কার্যকরী হবে যে উহা এই আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া এ আইনের ৫-১৩ নং ধারাসমূহ পরবর্তীতে বিভিন্ন আইন দ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের আদালতসমূহ মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে ইসলামী আইন বা মুসলিম আইন বা শরিয়ত আইন প্রয়োগ করতে পারেন :

১. উত্তরাধিকার

২. নারীদের সম্পত্তি

৩. বিবাহ

৪. তালাক

৫. ইলা

৬. যিহার

৭. লিয়ান

৮. খুলা

৯. মোবারাত

১০. অন্যভাবে বিবাহভঙ্গ

১১. খোরপোষ

১২. দেনমোহর

১৩. অভিভাবকত্ব

১৪. হিবা

১৫. উইল

১৬. ওয়াকফ

সর্বোপরি, ইসলামী শারী'আ দৃষ্টিকোণে এ সকল বিষয়াদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন জরুরি, যা এর মাধ্যমে প্রচলিত আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়।

পর্যালোচনা

এ আইনে ইসলামের ফৌজদারি আইনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে।

৫.২.৩ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯[২৭৮]

মুসলিম আইন মোতাবেক বিবাহিতা মহিলাগণ কর্তৃক আনীত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা সম্পর্কিত মুসলিম আইনের বিধানসমূহ একত্রীকরণ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্য এবং বৈাহিক

২৭৮. ১৯৩৯ সনের ৮নং আইন, ১৭ই মার্চ, ১৯৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কের উপর বিবাহিতা মুসলিম মহিলা কর্তৃক ইসলামধর্ম ত্যাগের পরিণামজনিত সন্দেহ দূরীকরণের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু মুসলিম আইন মোতাবেক বিবাহিতা মহিলাগণ কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আনীত মামলা সম্পর্কে এবং বৈবাহিক বন্ধনের উপর বিবাহিতা মুসলমান মহিলা কর্তৃক ইসলাম ধর্ম ত্যাগের পরিণামজনিত সন্দেহ দূরীকরণের জন্য মুসলিম আইনের বিধানসমূহ একত্রিত ও সুস্পষ্ট করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন পাস করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও আওতা

(১) অত্র আইনকে ১৯৩৯ সনের "মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রির কারণসমূহ

নিম্নলিখিত যেকোনো এক বা একাধিক কারণে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিতা কোন মহিলা তাহার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি লাভের অধিকারিণী হইবেন, যথা–

(১) চার বৎসর যাবৎ স্বামী নিরুদ্দেশ (খোঁজ-খবর জানা না থাকা) হইলে;

(২) স্বামী যদি দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দিতে অবহেলা করেন অথবা ব্যর্থ হন;

(৩) স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিলে:

(৪) স্বামী যদি সাত বৎসর বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(৫) যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া, স্বামী তিন বৎসর যাবৎ তাহার বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে;

(৬) স্বামী যদি বিয়ের সময় পুরুষত্বহীন থাকেন এবং সেই অবস্থা তখনও থাকে;

(৭) স্বামী যদি দুই বৎসর যাবৎ উম্মাদ (পাগল) থাকেন অথবা কুষ্ঠ বা মারাত্মক যৌন ব্যাধিতে ভুগিতে থাকিলে;

(৮) আঠার বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি তাঁহার (স্ত্রীর) পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক তাহাকে বিবাহ দিয়া থাকেন এবং ঊনিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে উক্ত বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকিলে। তবে শর্ত হইল যে ঐ বিবাহ যৌন মিলন দ্বারা সম্পূর্ণ হয় নাই।

(৯) স্বামী তাহার (স্ত্রীর) সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, অর্থাৎ-

(ক) অভ্যাসগতভাবে মারধর করেন বা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলেন, যদিও অনুরূপ আচরণ দৈহিক পীড়নের পর্যায়ভুক্ত না হইয়া থাকে, অথবা

Dhaka University Institutional Repository

(খ) কুখ্যাত স্ত্রীলোকের সহিত বা কলঙ্কিত জীবন-যাপন করে এমন মহিলাদের সহিত জীবন যাপন করেন; অথবা

(গ) স্ত্রীকে অনৈতিক জীবন যাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন; অথবা

(ঘ) স্ত্রীর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন অথবা সম্পত্তিতে তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা দেন; অথবা

(ঙ) স্ত্রীকে ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বাধা সৃষ্টি করেন; অথবা

(চ) একাধিক স্ত্রী থাকিলে স্ত্রীর সহিত কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়পর আচরণ না করেন; অথবা

মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈধকরণ হিসাবে স্বীকৃত অন্য যেকোন কারণে–

তবে শর্ত হইল যে–

(ক) কারাদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত (৩) নং কারণে কোন ডিক্রি দেওয়া যাইবে না।

(খ) (১) নং কারণে প্রদত্ত ডিক্রিটি উহার প্রদানের তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না এবং স্বামী উক্ত সময়ের মধ্যে নিজে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে যদি আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, তিনি দাম্পত্য কর্তব্য পালনে প্রস্তুত আছেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত ডিক্রি বাতিল করিয়া দেবেন; এবং

(গ) (৫) নং কারণে ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে স্বামীর আবেদনক্রমে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে স্বামীকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে, সে তাহার পুরুষত্বহীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং স্বামী উক্ত সময়ের মধ্যে অনুরূপ সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আদালত ঐ কারণে কোন ডিক্রি প্রদান করিবেনা।

পর্যালোচনা

উপরিউল্লিখিত ২ নং ধারার ৮ নং উপধারার পর্যালোচনা মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১-এর ১২ নং ধারায় পর্যালোচনা করা হলো।

৩। স্বামীর ঠিকানা জানা না থাকিলে তাহার উত্তিরাধিকারীদের উপর নোটিশ জারী

যে মামলার ক্ষেত্রে ২ ধারার (১) উপ-ধারা প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে-

(ক) আরজিতে ঐ সকল ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা লিখিতে হইবে যাহারা আরজি পেশ করার সময় স্বামী মারা গেলে মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হইত,

(খ) উক্ত ব্যক্তিদের উপর মোকদ্দমার নোটিশ জারী করিতে হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) উক্ত ব্যক্তিদের ঐ মামলায় বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে;

তবে, শর্ত হইল যে, স্বামীর চাচা ও ভাই থাকিলে উহারা উত্তরাধিকারী না হইলেও তাহাদিগকে অবশ্যই পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

৪. ধর্মান্তরের ফলাফল

কোন বিবাহিতা মুসলিম মহিলা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিলে অথবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম দীক্ষিত হইলে উহাতেই তাহার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

তবে অবশ্য, এই জাতীয় ধর্মত্যাগ বা অন্য ধর্ম গ্রহণের পর মহিলাটি ২ ধারায় বর্ণিত যেকোন কারণে তাহার বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, অন্য ধর্মাবলম্বী কোন মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাহার পূর্ব ধর্ম আবার গ্রহণ করিলে এই ধারার বিধান তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

পর্যালোচনা

উক্ত ৪ নং আইনের আলোকে পরিদৃষ্ট হয়, কোনো বিবাহিতা মুসলিম মহিলা বিবাহের পর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তার বিবাহ ভঙ্গ হবে না। তবে কোনো স্বামী ইসলাম ত্যাগ করলে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইসলামী শারী'আ আইন অনুসারে ধর্মত্যাগ তথা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তার সাথে মুসলিমের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই স্বামী-স্ত্রী যে কারো ধর্মত্যাগের ফলে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু উক্ত আইনে বিপরীত বলা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে শারী'আ আইনের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো–

ইসলামী শারী'আর মূলনীতি হলো, কোনো মুসলিম নারী বা পুরুষ কোনো অমুসলিম নারী বা পুরুষকে বিবাহ করা শারী'আ সম্মত নয়। এ সম্পর্কে কুর'আনের বাণী,

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ۔

"আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয়ই উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মু'মিন নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।"[২৭৯]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত শারী'আ আইনে স্বামী ও স্ত্রীর দুইজনকে মুসলিম হতে হবে।

স্বামীর ইসলাম গ্রহণ : স্বামী ইসলাম গ্রহণের পর স্ত্রীকে তা গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে এবং স্ত্রী যদি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তা হলে আদালত কর্তৃক বিবাহ নাকচ করতে হবে।

স্ত্রীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ : যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে সে স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে এবং স্বামী অস্বীকার করলে আদালত কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। এ সম্পর্কে কুর'আনের বাণী, لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয়; কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।"

উভয় পক্ষের ইসলাম গ্রহণ : যদি স্বামী স্ত্রী উভয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে তা বৈধই থেকে যাবে। কিন্তু আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদের মতে তাদের বিবাহ ইদ্দতকালীন ঘটলে ঐ বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

৫। দেনমোহরের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না

এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই কোন মহিলার বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে মুসলিম আইন অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য দেনমোহর অথবা কোন অংশের উপর তাহার কোন অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ন করিবে না।

৬। ১৯৩৭ সালের ২৬নং আইনের ৫ ধারা বিলুপ্তি

১৯৩৭ সালের মুসলিম ব্যক্তিগত (শারী'আত) আইনের ৫ ধারা এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

পর্যালোচনা

এতদসম্পর্কিত আলোচনা মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১-এর ৭ ও ৮ নং ধারায় পর্যালোচনা করা হলো।

৫.২.৪ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১[২৮০]

[বিবাহ এবং পারিবারিক আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকর করার জন্য প্রণীত অধ্যাদেশ]

---

২৭৯. আল কুর'আন, ২ : ২২১।

২৮০. ১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু বিবাহ এবং পারিবারিক আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকর করা দরকার ও সমীচীন; সেহেতু ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত অধ্যাদেশটি প্রণয়ন ও জারী করিলেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, সীমা, প্রয়োগ ও বলবতের সময়

(১) এই অধ্যাদেশকে ১৯৬১ সনের 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' নামে অভিহিত করা হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং যেখানেই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের উপর প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ যে তারিখ নির্ধারণ করিবেন, সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

[N.B. উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সনের ১৫ জুলাই তারিখ হইতে এই অধ্যাদেশটি বলবৎ হইয়াছে।]

২। সংজ্ঞাসমূহ

এই অধ্যাদেশে, বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গ হইতে বিপরীত কিছু প্রতীয়মান না হইলে-

ক) 'সালিশী পরিষদ' বলিতে চেয়ারম্যান এবং এই অধ্যাদেশে উল্লিখিত কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রত্যেকের একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিষদকে বুঝাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোর্স নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে অনুরূপ প্রতিনিধি ছাড়া গঠিত পরিষদই সালিশী পরিষদ হইবে।

খ) চেয়ারম্যান বলিতে বুঝাইবে

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;

(২) পৌরসভার চেয়ারম্যান;

(৩) মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক;

(৪) সেনানিবাস এলাকায় অত্র অধ্যাদেশ অনুযায়ী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি;

(৫) কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বাতিল করা হইলে সেক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অত্র অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত ব্যক্তি ;

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান একজন অমুসলমান অথবা তিনি নিজেই সালিশী পরিষদের নিকট কোন দরখাস্ত করিতে চাহেন এমন হইলে, অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা উহার একজন মুসলমান সদস্যকে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলী পূরণকল্পে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন।

(গ) **'মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন'** বলিতে ১৯৮২ সালের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫ নং অধ্যাদেশ) অথবা ১৯৮৩ সালের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০নং অধ্যাদেশ), অথবা ১৯৮৪ সালের খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৪ সনের ৭২নং অধ্যাদেশ) অনুযায়ী গঠিত মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বুঝাইবে এবং নির্ধারিত এখতিয়ার সম্পন্ন হইবে;

(ঘ) পৌরসভা বলিতে ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশ (১৯৭৭ সনের ২৬ নং অধ্যাদেশ) অনুযায়ী গঠিত পৌরসভা বুঝাইবে এবং নির্ধারিত এখতিয়ার সম্পন্ন হইবে;

(ঙ) 'নির্ধারিত' বলিতে ১১ ধারার অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝায়;

(চ) 'ইউনিয়ন পরিষদ' বলিতে ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের (১৯৮৩ সনের ৫১ নং) অধীনে গঠিত এবং উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত এখতিয়ার সম্পন্ন ইউনিয়ন পরিষদকে বুঝায়।

৩। অত্র অধ্যাদেশ অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে

(১) অপর কোন আইন, বিধি অথবা প্রচলিত রীতিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(২) সন্দেহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা ইহা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের সালিশী আইন (১৯৪০ সালের ১০ নং আইন), ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (১৯৪০ সালের ৫ নং আইন) এবং আদালতের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণকারী অপর কোন আইনের কোন ব্যবস্থা সালিশী পরিষদে প্রযোজ্য হইবে না।

৪। উত্তরাধিকার : যাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হইবে, তাহার পূর্বে তাহার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি বণ্টনের সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি জীবিত থাকিলে, তাহারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাইবে, যাহা তাহাদের পিতা অথবা মাতা জীবিত থাকিলে পাইত।

Dhaka University Institutional Repository

৪ নং ধারার পর্যালোচনা

এ ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

১. দাদার পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

২. দাদির পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

৩. নানার পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র-দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

৪. নানির পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র-দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেতো, ততটুকু পাবে।

অধ্যাদেশের এ ধারাটিতে অনেক দিক থেকেই 'ইসলামী উত্তরাধীকার' নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এদিকগুলো আমরা একে একে উল্লেখ করছি।

১. দাদা-দাদির পূর্বে বাবা মারা গেলে, যদি দাদা-দাদির মৃত্যুর সময় এক বা একাধিক চাচা (অর্থাৎ দাদা-দাদির কোন পুত্র) বর্তমান থাকে, তাহলে ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী পৌত্রীর কেউই দাদা কিংবা দাদির সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মীরাস পাবে না। অথচ উপরিউক্ত অধ্যাদেশটিতে সর্বাবস্থায় দাদা-দাদির সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রী মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি পাবে বলে উল্লেখ আছে। ইসলামী শারী'আতের সাথে অধ্যাদেশটি এ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক।

كل ذكر من الفروع يحجب من كان انزل منه , ذكرا كان ام انثى- -

অর্থাৎ, অধস্তনের প্রত্যেক পুরুষ তার চেয়ে অধিক নিম্নস্তরের নারী-পুরুষ সকলকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করবে।[২৮১]

---

[২৮১] লেখকমন্ডলী, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ* **১৯৬১***-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব* (ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

এ নিয়মের পক্ষে ইমাম বুখারী মীরাস অধ্যায়ে ইবনে সাবিত (রা.) থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন এবং ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেন।

ইবনে সাবিত (রা.) বলেন :

وَلَدُ الاَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ، اِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ زَكَرَهُمْ كَزَكَرِهِمْ، وَاُنْثَاهُمْ كَاُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ

-

অর্থাৎ পুত্রের সন্তানগণ নিজের সন্তানের সমতুল্য, যখন তাদের অধস্তন কোন পুত্র সন্তান না থাকে। পুত্রের ছেলে সন্তানগণ পুত্রেরই মতো এবং মেয়ে-সন্তানগণ মেয়েরই মতো। আপন সন্তানের মতোই তারা ওয়ারিস হয় এবং ওদের মতোই তারাও কোন কোন ওয়ারিসকে বাধাগ্রস্ত করে। আর পুত্রের উপস্থিতিতে তার সন্তানগণ মীরাস পাবে না।[২৮২]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

"যারা ফারায়েয তথা মীরাসের সুনির্দিষ্ট অংশের অধিকারী, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকি থাকবে, তা দেয়া হবে সম্পর্কের দিক থেকে মৃতের নিকটতর পুরুষকে।"[২৮৩]

এ হাদীসটিতে নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ 'আসাবা'দের দেয়ার কথা বলা হয়েছে মৃতের নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা, 'অসাবা'দের একের উপস্থিতি অন্যকে মীরাস থেকে মাহ্রুম ও বঞ্চিত করে। আর তা নির্ণীত হয় নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। উল্লেখ, এখানে, 'পুরুষ' কথাটি বলা হলেও মহিলা আসাবাগণ একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এছাড়া কুর'আন করীমে পুত্র-সন্তানের উত্তরাধিকার সত্ত্বেও ঘোষণা দেয়া হলেও সরাসরি পুত্রের সন্তান তথা পৌত্রের কথা বলা হয়নি। তবে আলেমদের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত

---

[২৮২] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫১।

[২৮৩] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫১, হাদীস নং : ৬৭৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

হলো কোন পুত্র জীবিত না থাকলে পুত্রের পুত্র সন্তানগণ তার স্থলাভিষিক্ত হবে। কেননা, শারী'আতের পরিভাষায় সন্তানের সন্তানগণও সন্তানরূপে গণ্য হয়। আর এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণও তাদের ভ্রাতাদের সাথে আসাবা হিসেবে মীরাস পাবে।

উপরিউক্ত দলীলগুলোর সারকথা হলো-দাদা/দাদির কোন পুত্রসন্তান জীবিত থাকরে পুত্রের অধস্তন যে কোন সন্তান (পৌত্র/পৌত্রী) তার (দাদা/দাদির) সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

২. আর যদি দাদা-দাদির মৃত্যুর সময় তাদের শুধু কন্যা সন্তানগনই জীবিত থাকে এবং তাদের পূর্বে মারা যাওয়া তাদের মৃত পুত্রদের ছেলেমেয়েরা জীবিত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় কন্যাদের অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ পৌত্র-পৌত্রী আসাবা হিসেবে পাবে। এ ক্ষত্রেও উপরিউক্ত অধ্যাদেশটি শারী'আত বিরোধী। কেননা, অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌত্র-পৌত্রীরা মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে অংশ পাবে, যা উপরিউক্ত অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৩. যদি দাদা-দাদির একটি মাত্র কন্যা বর্তমান থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, তাহলে মৃত পুত্রের কন্যা/কন্যাগণ ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কেননা, মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশের অর্ধেক কন্যা নেয়ার পরও এক-ষষ্ঠাংশ বাকি থাকে, যা শরীআত পুত্র না থাকয় পৌত্র-পৌত্রীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু উপরিউক্ত অধ্যাদেশ পৌত্র-পৌত্রীদেরকে দেয়া হয়েছে মৃত বাবার অংশ, যা ইসলামী শারী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক।

৪. যদি দাদা-দাদির একাধিক কন্যা বর্তমান থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণ কিছুই পাবে না। কেননা, মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশ কন্যাগণ নেয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায়ও উপরিউক্ত অধ্যাদেশটি ইসলামী শারী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, কন্যাদের এই অবস্থায় তাদের মৃত বাবার অংশ পাওয়া ইসলামী শারী'আতের ফায়সালা নয়, অথচ অধ্যাদেশটিতে তাই বলা হয়েছে।

৫. ইসলামী শারী'আতে আসাবা ও আসহাবুল ফুরূয়ের উপস্থিতিতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী কখনোই নানা-নানির সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। কেননা, কুর'আন ও সুন্নাহয় তাদেরকে কোন মীরাস দেয়া হয়নি। অথচ উপরিউক্ত অধ্যাদেশটিতে নানা-নানীর আগে মায়ের মৃত্যু হলে দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে মায়ের প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

শারী'আতের পরিভাষায় কন্যার সন্তানদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম' অর্থাৎ এমন আত্মীয় যারা 'আস্হাবুল ফুরুয' (নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী) কিংবা 'আসাবা' নয়। এ রকম

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়দের মধ্যে আরো রয়েছে বোনের সন্তানগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ, মামা ও খালা প্রভৃতি। এর 'আসহাবুর ফুরুয' ও 'আসাবা' থাকাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না।

অবশ্য যদি 'আসহাবুল ফুরুয' ও 'আসাবা' না থাকে, তাহলে অধিকাংশ আলেম যাবিল আরহামকে উত্তরাধিকার দেয়ার কথা বলেছেন।

লক্ষণীয়, দৌহিত্র-দৌহিত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের উত্তরাধিকার ধারাটি সাংঘর্ষিক। কেননা, উপরোল্লিখিত কোন অবস্থাতেই ইসলামী শারী'আত তাদের নানা-নানী থেকে মীরাস পাওয়ার বিধানকে সমর্থন করে না।

সংশোধনসহ প্রস্তাবনা

অতএব, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর উপরিউক্ত ধারাটি যেহেতু শরী'আ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই ধারাটিকে এমনভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে শরী'আ আইনের সাথে এর কোন সংঘর্ষ না থাকে এবং ইসলামী শারী'আতের বিধিমালা অনুযায়ী এ ধারাটির পুনর্বিন্যাস করা হয়।

ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করে আমরা অধ্যাদেশের ৪ নং ধারটিকে সাংশোধিত করে এভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব। 'যার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা নিজেদের কোন সন্তান রেখে মারা গেলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী তার জীবদ্দশায় মারা যাওয়া পুত্রের বা কন্যার সন্তানদের জন্য অসিয়ত করবেন, যেন তার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি থেকে তাদেরকে নিয়মানুযায়ী একটা অংশ প্রদান করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই অসিয়ত যেন এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি না হয়।

৪নং ধারার ক্ষেত্রে বলা যায়, ইসলামী শারী'আতে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের যে বিধান রয়েছে, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শারী'আত সমর্থিত পন্থায় পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরকে সম্পত্তি দেয়া যায় এবং আইনের এ অধ্যাদেশটিকে আমরা শারী'আতের বিরোধিতা থেকে মুক্ত করতে পারি।

উল্লেখ্য যে, ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক অসিয়তের বিধানটি বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, কুয়েত ও লেবানন অন্যতম। সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও এ আইনের মাধ্যমেই এসব দেশে দাদা-দাদির সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রীকে নিয়মানুযায়ী একটা অংশ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন গ্রন্থকার এ বক্তব্য– আজকাল এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কুর'আনে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও اقربون-এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিস হতে পারে না। কেননা পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্যই এ আয়াতের বর্ণনা।[২৮৪]

সুতরাং দানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো 'অসিয়াত"। বেশিরভাগ আলেমের মতে "অসীয়াত" করা মুস্তাহাব। ইমাম নুহাস বলেন, এ আয়াতের আলোকে ওসিয়ত করাটা উত্তম। আর এটিই গ্রহণযোগ্য সমাধান।[২৮৫]

একদল আলেমের মতে "অসিয়াত" করা ওয়াজিব।

সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত যে, নাতি/নাতনীদেরকে দাদার জন্য কর্তব্য হলো অসিয়াত করা।

৫. [বাতিল] এই ধারাটি ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

৬. বহু বিবাহ

(১) সালিশী পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি একটি বিবাহ বলবৎ থাকাকালে আরেকটি বিবাহ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই জাতীয় কোন বিবাহ হইলে তাহা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪ [১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন] অনুসারে রেজিস্ট্রি হইবে না।

(২) (১) উপ-ধারায় বর্ণিত অনুমতির জন্য নির্দিষ্ট ফিসসহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ এবং বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্মতি নেওয়া হইয়াছে কিনা, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) (২) উপ-ধারা মোতাবেক আবেদনপত্র পাওয়ার পর চেয়ারম্যান আবেদনকারী এবং বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের প্রত্যেককে একজন করিয়া প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে বলিবেন এবং এইরূপে গঠিত সালিশী পরিষদ যদি মনে করেন যে, প্রস্তাবিত বিবাহটি প্রয়োজন এবং

---

২৮৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), *তাফসীরে মা'আরেফুল কোর'আন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সৌদি আরব : তাবি), পৃ. ২৩৫।

২৮৫. হযরত আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে আব্বাস, *তাফসীরে ইবনে আব্বাস* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫), খ. ১, পৃ. ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়সঙ্গত তাহা হইলে কোন শর্ত থাকিলে উহা সাপেক্ষে, প্রার্থিত বিবাহের অনুমতি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৪) আবেদনটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সালিশী পরিষদ সিদ্ধান্তের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যে কোন পক্ষ, নির্দিষ্ট ফিস জমা দিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মুন্সেফের নিকট রিভিশনের (Revision) জন্য আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন আদালতে উহার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) সালিশী পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহাকে-

(ক) অবিলম্বে তাহার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের 'তাৎক্ষণিক' অথবা 'বিলম্বিত' দেনমোহরের যাবতীয় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে এবং উক্ত টাকা পরিশোধ করা না হইলে উহা বকেয়া ভূমি রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

(খ) অভিযোগক্রমে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানাক অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৬ নং ধারার পর্যালোচনা

৬নং ধারায় উল্লিখিত ৫টি উপধারার মধ্যে ৫টি উপধারা শরী'আ আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন ইসলামী শারী'আহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও আলেমগণ।

৬ নং ধারার ১ নং উপধারা : উক্ত ধারায় উল্লিখিত সালিশী পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি ইসলামের বিধান বহির্ভূত। কারণ দ্বিতীয় বিবাহ করা বা না করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার স্বামীর অথবা বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলার। অন্য কোন ব্যক্তির এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তার সিদ্ধঅন্ত কার্যকারিতার ব্যাপারে আদালত অথবা সালিশী পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকৃত অর্থে বহুবিবাহ ইসলামী শারী'আতে বিনা শর্তে জায়েয। এ ক্ষেত্রে কুর'আনের মূলনীতি হলো–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -

"আর যাদেরকে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি।"[২৮৬]

২৮৬. আল কুর'আন, ৪ : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আলেমদের মতামত : দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহ মোবাহ (ঐচ্ছিক) ব্যাপার। এটাকে ঢালাওভাবে অবৈধ সাব্যস্ত করা যাবে না। তবে এই মোবাহকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি শর্ত জড়িত।

(১) প্রয়োগের বিশেষ কারণ থাকা এবং সেটা শারী'আতসম্মত কিনা লক্ষ্য রাখা।

(২) উক্ত প্রয়োগ যেন জুলুম বা বৈষম্যে কিংবা ন্যায়নীতির বিরোধী না হয়।

আর সরকার বা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠাসমূহের দায়িত্ব হলো কুরআনের এ দু'টি শর্ত পালনে কোন অবহেলা হচ্ছে কি না তার প্রতি দৃষ্টি রাখা।[২৮৭]

শর্ত পালনের অঙ্গীকারের পরও যদি কোন স্বামী সেটা লংঘন করে বা নারীর ক্ষতি সাধন করে, অথবা নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর দণ্ড বিধান কার্যকর করা উচিত যেমনটা আইনের পাঁচ নম্বর উপধারায় উল্লিখিত আছে। এই উপধারার 'ক' এবং 'খ'-এ যে শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে সেটা আরো কঠোর করে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে দোষী ব্যক্তিকে প্রতারণা বা চিটিং-এর অপরাধের জন্য প্রচলিত দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, বিয়ে, তালাক ইত্যাদির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে। এ জন্য মুসলিম পারিবারিক আদালত গঠন করা দরকার। যার অধীনে বিয়ে-শাদী এবং এ জাতীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে। আইনের এক নম্বর উপধারায় উল্লিখিত সালিসী পরিষদটি ঐ আদালতের অধীনে করে দিলে এ সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধানটি সটিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে।

৬ নং ধারার ২ নং উপধারা : উক্ত ধারাটি বিশ্লেষণ করলে তিনটি শর্ত লক্ষ্য করা যায়।

১. চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন।

২. বর্তমান স্ত্রীদের সম্মতি।

৩. প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ বর্ণনা।

---

২৮৭. ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *বহু বিবাহ ও বর্তমান সমাজ*, (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, বর্ষ : ২, সংখ্যা : ৫), পৃষ্ঠা. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

১নং শর্তের পর্যালোচনা মতে, চেয়ারম্যানের নিকট আবেদনের কোন বিধান ইসলামী শারী'আতে নেই। যা পূর্বে আলোচিত (৬.১) ধারায় বর্ণিত।

২নং শর্তের পর্যালোচনা : এটি ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ ইসলামে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে বর্তমান স্ত্রীদের অনুমতি নেওয়ার কোন নিয়ম নেই। প্রয়োজন সাপেক্ষে একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারে। তবে এখানে একটি বিষয় প্রনিধান যোগ্য, ইসলামই একমাত্র ধর্ম বা জীবন বিধান যেখানে এক বিবাহকে নির্দিষ্ট করেছে আল কুরআনের সূরা নিসার এ আয়াতটি উল্লেখযোগ্য।

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً --

" আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি।" (সূরা নিসা : ৩)

৩নং শর্তের পর্যালোচনা : ইসলামী আইনীবিদদের মতে নিম্নোক্ত কারণে বহুবিবাহ প্রযোজ্য হতে পারে :

১. স্ত্রীহারা স্বামী।

২. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত স্ত্রী যার সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ সে কারণে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন।

৩. সমাজের মধ্যে যদি এমন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা থাকেন যারা অবহেলিত, অসহায়, এতিম সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে বিবাহ করা।

৪. স্ত্রী বন্ধ্যা, মানসিক ভঅরসাম্যহীন হলে।

৫. বদমেজাজ, রুক্ষ ও উগ্র স্বভাবের স্ত্রীর নিষ্ঠুর আচরণের কারণে দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া অনেকের উপায় থাকে না।

৬. স্বামীর দৈহিক প্রয়োজনীয়তা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সন্তান ও বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে।

৮. সমাজে নারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় ব্যভিচার থেকে তাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।[২৮৮]

৩নং শর্তের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত হলো : প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ বর্ণনার কোন ভিত্তি সভ্য সমাজে প্রচলন নেই। কেননা, ইমাম শাফি'ঈর মতে– বিবাহের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হলো কাম-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়া, আর এমতাবস্থায় বিবাহ করা ফরজ। রাসূল (সা.)-এর বাণী–

عَنْ عَلْقَمَةَ ... قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ..... الخ-

"আলক্বামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ..... রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম, তারা যেন বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন ক্ষুধাকে অবদমিত রাখে।"[২৮৯]

আর ইসলাম দু'টি কারণ ব্যতীত সর্বাবস্থায় বহুবিবাহ সমর্থন করেছেন। সেগুলো হলো–

(১) সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অনিশ্চয়তা।

(২) সুবিচার কায়েমের অনিশ্চয়তা।

সুতরাং এগুলোর আশঙ্কা না থাকলে "বহুবিবাহ করতে" কারো নিকট কারণ দর্শানোর কোন বিধান শারী'আ সম্মত নয়।[২৯০]

আর বিবাহের মূল কারণ জৌবিক, যা অন্যের নিকট বর্ণনা করা কারো মানসিকতাই রায় দেবে না।[২৯১]

৬ নং ধারার ৩ নং উপধারা : উক্ত ধারাটি বিশ্লেষণ করলে দু'টি বিষয় পাওয়া যায়।

১. সালিশী পরিষদ গঠন।

২. শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি।

---

২৮৮. ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৮৯. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, (খ. ৭), পৃ.৩, হাদীস নং : ৫০৬৫।

২৯০. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন সাম্ভলী, *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫), পৃ. ৮৯।

২৯১. কাযী ছানাউলণ্যাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭), খ. ২, পৃ. ৬২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সালিশী পরিষদের কোন মূলনীতি ইসলামে পাওয়া যায় না এবং শর্তসাপেক্ষ বহুবিবাহের অনুমতি দানের বিষয়টিও ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

মূলত মুসলিম সমাজে এ ধারাটি এসেছে পাশ্চাত্য সমাজ থেকে যারা মনে করে– দ্বিতীয় বিবাহ করার সাথে সাথেই সে নিশ্চিতভাবে জুলুম মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর এ কারণেই সালিশী পরিষদ জুলুম না করতে বিধি-নিষেধ শর্তারোপ করে বিবাহ করার অনুমতি দেবে। যা নিছক একটি ভুল ধারণা।

৬ নং ধারার ৪ নং উপধারা : পূর্বে উল্লেখিত ধারা ৩টি শরী'আ আইনের পরিপন্থি হওয়াতে এ ধারার কোন কার্যকরণ নেই।

৬ নং ধারার ৫ উপধারার ক ও খ : উপরিউক্ত ধারাসমূহ লঙ্ঘনের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিবাহের সাথে সাথে প্রথম স্ত্রীর মহর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ইসলাম বলেছে– মহর আদায়যোগ্য, এটি কখনই রহিত হয় না। আর মহর আদায় না করলে সে তো আখিরাতে ব্যভিচারীদের কাতারে শামীল হবে। মহরের বিষয়ে আল কুরআনের বিধান :

وَاٰتُوْا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً-

" আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও।"[২৯২]

হাদীসের বিধান :

اَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ اَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ اَنْ يُؤَدِّيَ اِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ اِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ -

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে পরিশোধের নিয়ত ছাড়া প্রতারণার উদ্দেশ্যে কম অথবা বেশি মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে এবং তার পরিশোধ না করেই ইন্তেকাল করে তবে কিয়ামেতের দিন ব্যভিচারী হিসেবে মহান আল্লাহর সাথে তার দেখা হবে।"[২৯৩]

এক্ষেত্রে আরো প্রণিধানযোগ্য যে, বিবাহবন্ধন অটুট থাকাকালে স্ত্রী নির্ধারিত মহরের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। বালেগা স্ত্রী তার মহরের আংশিক বা সম্পূর্ণটাই হেবা (দান) অথবা মাফ করিয়া দিতে পারে।[২৯৪]

আলোচনার সারসংক্ষেপ

---

২৯২. আল কুর'আন, ৪ : ৪।

২৯৩. ইমাম বায়হাকী, *সুনানুল সুগরা* (বৈরুত : মাকতাবা ইসলামী, ১৪০৫ হি), খ. ১, পৃ. ৮৪, হাদীস নং : ১১১।

২৯৪. সংকলকমন্ডলী, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫) খ. ১ , পৃ. ৪৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আইনে মূলত দুটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়,

প্রথমত, বহু বিবাহসংক্রান্ত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১নং ধারায় উল্লিখিত যে, সালিশী পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির একটি বিবাহ বলবৎ থাকলে আরেকটি বিবাহ করতে পারবে না এবং পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করে এ জাতীয় কোন বিবাহ হলে তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ অনুসারে রেজিস্ট্রি হবে না। আইনে উল্লিখিত ধারায় সালিশী পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি ইসলামের বিধান বহির্ভূত।

দ্বিতীয়ত, সমাজের মধ্যে দ্বিতীয় বা একাধিক বিয়ের সুযোগ থাকা উচিত প্রচলিত কুসংস্কার তথা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য। সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখী করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিবাহের সময় প্রথমা স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত। তাহলে আর কোন সন্দেহ ও ভুল-বুঝাবুঝি থাকবে না।

ইসলামী শারী'আহ মূলনীতিসমূহ যথাযথ উপলব্ধি না করার কারণেই মূলত উক্ত আইনের সৃষ্টি। কারণ ইসলাম বহুবিবাহের ক্ষেত্রে দু'টি শর্তারোপ দিয়েছেন। সেগুলো বাস্তবায়ন সাপেক্ষে বহু বিবাহ বৈধ। করে বহুবিবাহ করা পুণ্যের কাজ। তবে এ অধিকার প্রয়োগের শর্তগুলো হলো–

(ক) প্রয়োগের বিশেষ কারণ থাকা এবং কারণটি শারী'আত সম্মত কী না এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা।

(খ) প্রয়োগ যেন যুলুম বা বৈষম্যে অথবা ন্যায়বিচারের পরিপন্থি না হয়।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً -

"আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি বিবাহই যথেষ্ট।"[২৯৫]

সুতরাং বহুবিবাহ বৈধ; তবে এক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ফরয। হানাফী ফিকহ্‌বিদ আলাউদ্দিন কাসানী (রা.) বলেন– যদি কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে তবে আদল তথা তাদের খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান ও রাত্রিযাপন এমনকি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা তার জন্য ওয়াজিব। সকল ক্ষেত্রে কোন প্রকার পার্থক্য ও তারতম্য ছাড়াই সমঅধিকার প্রদান করতে হবে।[২৯৬]

---

২৯৫. আল কুর'আন, ৪ : ৩।

২৯৬. মওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা :

প্রথম প্রস্তাব : শর্ত পালনের অঙ্গীকারের পরও যদি কোন স্বামী সেটা লঙ্ঘন করে বা নারীর ক্ষতি সাধন করে, অথবা নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর দণ্ড বিধান কার্যকর করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : বিয়ে, তালাক ইত্যাদির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ জন্য মুসলিম পারিবারিক আদালত গঠন করা দরকার। যার অধীনে বিয়ে ও তালাক এবং এ জাতীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে। আইনের এক নম্বর উপধারায় উল্লিখিত সালিশী পরিষদটি ঐ আদালতের অধীনে করে দিলে এ সম্পর্কি শারী'আতের বিধানটি সঠিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে।

৭. তালাক

(১) কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাহিলে, তিনি যে কোন পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে নোটিশ দিবেন এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি (নকল) প্রদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি (১) উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) নিম্নের (৫) উপধারার বিধান অনুসারে প্রকাশ্যে বা অন্য কোনভাবে তালাক, আগে প্রত্যাহার করা না হইয়া থাকিলে, (১) উপধারা মোতাবেক চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না।

(৪) উপরিউক্ত (১) উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি সালিশী পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত সালিশী পরিষদ এই জাতীয় পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) তালাক ঘোষণার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে, (৩) উপধারায় বর্ণিত সময়কাল অথবা গর্ভাবস্থা, যেটি পরে শেষ হয়, অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হইবে না।

(৬) অত্র ধারা অনুযায়ী কার্যকর তালাক দ্বারা যে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সেই স্ত্রী, এই জাতীয় তালাক তিনবার এইভাবে কার্যকরী না হইলে, কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়া পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭ নং ধারার পর্যালোচনা

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ **১৯৬১**-এর তালাকসংক্রান্ত সপ্তম ধারার অধীনে উল্লিখিত প্রায় সকল উপধারা কুর'আন ও হাদীসের সরাসরি বিরোধী।

তালাকসংক্রান্ত ৭নং ধারার উপধারাগুলোতে কুর'আন-হাদীসের মোট সাতটি সুস্পষ্ট হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে প্রত্যেকটি লঙ্ঘনের বিপক্ষে কুর'আন-হাদীসের দলীল নিম্নরূপ :

১. কারো অবগতির উপর তালাকের শর্তারোপ : ইসলামী শারী'আত কিছু শর্তসাপেক্ষ পুরুষকে একচ্ছত্র তালাকের অধিকার দিয়েছে। কাউকে অবগতি কিংবা কারো অনুমতির উপর নির্ভরশীল করেনি। পক্ষান্তরে মুসলিম পারিবারিক আইনে পুরুষের তালাকের অধিকারকে চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে। কুর'আন মাজীদের যত স্থানে তালাকের বিবরণ এসেছে সব স্থানেই তালাকের হুকুমকে পুরুষের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং পুরুষের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا

"যদি সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্য রাজায়াত করা (যথাযথ সম্মতির মাধ্যমে আবার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা) দোষণীয় হবে না।"[২৯৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

"তোমাদের জন্য দোষণীয় নয় যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে।"[২৯৮]

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) বলেন,

الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ ـ

"তালাকের অধিকারী পুরুষ, আর ইদ্দত হলো মহিলার।"[২৯৯]

---

২৯৭. আল কুর'আন, ২ : ২৩০।

২৯৮. আল কুর'আন, ২ : ২৩২।

২৯৯. ইমাম মালেক, *আল মুয়াত্তা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৪৪, হাদীস নং : ১৬৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. মীমাংসার সময় কী তালাকের আগে না পরে : মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে তালাকের পর সালিশী কাউন্সিলকে অবহিত করবে, অতঃপর সালিশী কাউন্সিল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করবে। অথচ কুর'আনে মহান আল্লাহ তালাকের আগেই সালিশী তথা বিরোধ মীমাংসা করতে বলেছেন।

কুর'আনের বাণী,

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۔

"আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন।"[৩০০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۔

"যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর।"[৩০১]

এ আয়াতের তাফসীরে প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন–

قَالَ الْفُقَهَاءُ: اِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، اَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ اِلٰى جَنْبِ ثِقَةٍ، يَنْظُرُ فِي اَمْرِهِمَا، وَيَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْهُمَا مِنَ الظُّلْمِ، فَاِنْ تَفَاقَمَ اَمْرُهُمَا وَطَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، بَعَثَ الْحَاكِمُ ثِقَةً مَنْ اَهْلِ الْمَرْاَةِ، وَثِقَةً مِنْ قَوْمِ الرَّجُلِ، لِيَجْتَمِعَا وَيَنْظُرَا فِي اَمْرِهِمَا ۔

'ফিক্হবিদগণ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিচারক একজন ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ সালিশের সামনে তাদেরকে হাযির করবেন। তিনি তাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনে চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি তাদের বিরোধ আরো জটিল আকার ধারণ করে তখন বিচারক

---

৩০০. আল কুর'আন, ৪ : ৩৫।

৩০১. আল কুর'আন, ৪ : ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে নিষ্ঠাবান সালিশ তাদের নিকট প্রেরণ করবে। যারা তাদের সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখবে।[৩০২]

৩. তালাক কার্যকর : মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে, ইদ্দত (৯০ দিন) অতিবাহিত হওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা হয়ে গেলে সালিশী কাউন্সিল তাদেরকে মিলিয়ে দিতে পারে। স্বামী নিজেও স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিতে পারে। অর্থাৎ, চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের দিন হতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হবে না। অথচ কুর'আন মজীদে তালাক প্রদানের সাথে সাথে কার্যকর হয়ে যাওয়ার কথা এসেছে :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

"তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়।"[৩০৩]

উক্ত আইনে এটিও এসেছে যে, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী যার সাথে এখনো নির্জনবাস হয়নি তাকেও তালাক দিলে ৯০ দিনের আগে কার্যকরী হবে না। ৯০ দিনের আগে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অথচ কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে যে, যে স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি তাকে তালাক দেয়ার সাথে সাথেই সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং তাকে (অন্যত্র বিবাহের জন্য) ইদ্দত পালন করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ـ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিবাহ করবে অতঃপর তাদের স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেবে, তাহলে তাদেরকে তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে না।"[৩০৪]

৪. ইদ্দত গণনার সময়সীমা : উক্ত আইনে চেয়ারম্যানের নিকট নোটিস পৌঁছার দিন থেকে ইদ্দত গণনা শুরু করে। অথচ কুর'আন-সুন্নাহর বিধান হলো, তালাকের সময় থেকেই ইদ্দত গণনা শুরু হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ـ

---

৩০২. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর, *তাফসীরে কুরআনুল আযীম* (বৈরূত : দারু তাইয়্যেবাহ লিল নসর, ১৪২০ হি.), খ. ২, পৃ. ২৯৬।

৩০৩. আল কুর'আন, ২ : ২৩০।

৩০৪. আল কুর'আন, ৩৩ : ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

"হে নবী! যখন আপনি আপনার কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে মনস্থ করবেন, তখন তাকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন।"[৩০৫]

এ আয়াতে যেমন পবিত্রতার সময় তালাক দেয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়, তেমনিভাবে এটাও বুঝে আসে যে, তালাকের পরপরই ইদ্দত শুরু হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ـ

'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরু' (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনে) অপেক্ষা করবে।[৩০৬]

৫. ঋতুবতী মহিলার ইদ্দত : তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ঋতুবতী হলে তার ইদ্দত তিন ঋতুস্রাব। যা ৯০ দিনের অনেক বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অর্ডিন্যান্সে ব্যাপকভাবে ৯০ দিন ধার্য করা হয়েছে, যা সরাসরি কুর'আন বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরু (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনে) অপেক্ষা করবে।[৩০৭]

হযরত আতা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

تَعْتَدُّ اَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ اَوْ تَبَاعَدَتْ ـ

"ঋতুমতী মহিলা পূর্ণ তিন হায়েয (মাসিক) ইদ্দত পালন করবে। চাই তা স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী।"[৩০৮]

৬. অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর ইদ্দত : স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলে বর্তমান অর্ডিন্যান্স ৯০ দিন অথবা গর্ভপাত যেটি বিলম্বে হবে সেটিকে ইদ্দত হিসাবে গণ্য করছে। অথচ কুর'আনুল কারীম সুস্পষ্টভাবে সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসবকে ইদ্দত হিসেবে গণ্য করেছে। চাই তা ৯০ দিনের কম বা বেশি হোক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ

"আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[৩০৯]

---

৩০৫. আল কুর'আন, ৬৫ : ১।

৩০৬. আল কুর'আন, ২ : ২২৮।

৩০৭. আল কুর'আন ২ : ২২৮।

৩০৮. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, *আল মুসান্নেফ* (বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি), খ. ৬, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং : ১১১১৪।

৩০৯. আল কুর'আন ৬৫ : ৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম নববী রহ. বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।[৩১০]

৭. পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ : বর্তমান আইন বলে, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর এ জাতীয় তালাক তিনবার একইভাবে কার্যকরী না হলে তৃতীয় কোন ব্যক্তিতে বিবাহ না করেই প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। চাই একত্রে তিন তালাক দেয়া হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

"অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে মহিলা যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার (প্রথম স্বামী) জন্য হালাল হবে না।"[৩১১]

আর হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ সহীহ হবে না।

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: اِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ رَادُّهَا اِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ اَحَدُكُمْ، فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَة ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَاِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢] ، وَاِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ اَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَاَتُكَ ـ

'হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের নিকট ছিলাম। সেখানে একজন লোক এসে বললো, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। . . . . .তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। আমি তোমার কোন পথই দেখছি না। তুমি তোমার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পরিপূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে।"[৩১২]

প্রস্তাবনা

---

৩১০. লেখকমন্ডলী, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৩১১. আল কুর'আন, ২ : ২৩০।

৩১২. ইমাম আবু দাউদ, *আস সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬০, হাদীস নং : ২১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. কেউ তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে সালিশী কাউন্সিলকে নোটিশ করতে হবে।

২. সালিশী কাউন্সিল নোটিশ পাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আপোস করাতে চেষ্টা করবে।

৩. স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কাউন্সিলে কমপক্ষে দু'জন বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ন আলেমের অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। তারা উভয় পক্ষের অভিভাবকের মনোনীত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. সালিশী কাউন্সিলকে অবহিত করার আগেই যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হয়ে যাবে। যদি তালাক দেয়াটা শারী'আতের দৃষ্টিতে যথাযথ হয়ে থাকে।

৫. কেউ স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিতে পারবে না। কেননা একসাথে তিন তালাক দেয়া শারী'আ সম্মত নয়।

৬. উপরিউক্ত প্রস্তাবনার আলোকে প্রণীত আইনের কোনো প্রকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শারীরিক ও আর্থিক শাস্তির বিধান থাকবে।

৭. উপরিউক্ত আইন অনুসরণ ব্যতিরেকে কোনো প্রকার তালাক সংঘটিত হলে রেজিস্ট্রার তা রেজিস্ট্রেশন করবেন না; বরং তিনি এ ব্যাপারে বাধা দেবেন।

৮. তালাক ছাড়া অন্যভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ

যেক্ষেত্রে তালাক দেওয়ার অধিকার যথাযথভাবে স্ত্রীকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং স্ত্রী সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক বা স্ত্রী তালাক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে চাহে, সেক্ষেত্রে ৭ ধারার বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৮ নং ধারার পর্যালোচনা

এ ধারায় তিন ধরনের তালাকের বৈধতা দেয়া হয়েছে :

ক. তালাকে তাফঈদ

১৯৬১ সালের পরিবারিক আইনের আলোকে স্ত্রীকে যে অধিকার দেয়া হয়, স্ত্রী সে অধিকার যেকোনো সময় বাস্তাবায়ন করতে পারে। কিন্তু ইসলামে আইনে এটা সমর্থন করে না। নিম্নে ইসলামী শারী'আ আইনের আলোকে তালাকে তাফঈদের নীতিমালা তুলে ধরা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

আরবী তাফঈদ (التفويض) শব্দের আভিধানিক অর্থ- অর্পণ করা, ন্যস্ত করা, সমর্পণ করা, সোপর্দকরণ, দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি।[৩১৩] ইলমে ফিকহের পরিভাষায় তাফঈদ (التفويض) হলো, স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা।

কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকারে ভাষায়– هو ان يفوض الزوج الي الزوجة امر طلاقها من جهته অর্থাৎ স্বামী তার নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাকের দায়িত্ব অর্পণ করা।

ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকারের মতে– تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه অর্থাৎ, স্ত্রী তার নিজেকে তালাক প্রদানের মালিকানা লাভ করা।

তাফঈদ (التفويض)-এর হুকুম : ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে, তাফঈদ (التفويض) এর হুকুম নিম্নরূপ–

১. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এরূপ তালাকের ক্ষমতা অর্পণ বৈধ।

২. এ ক্ষমতা যে মজলিসে দেয়া হয় তা মজলিসের শেষ পর্যন্ত থাকবে। তার মধ্যে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।

৩. যদি মজলিস শেষ হয় বা স্ত্রী মজলিস থেকে উঠে যায় তাহলে তাফঈদ (التفويض) রহিত বা বাতিল হয়ে যাবে। হাদীসের বাণী,

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ـ

"হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে খিয়ার দেয়, এ খিয়ার মজলিশ শেষ হওয়ার পর আর অবশিষ্ট থাকবে না।"[৩১৪]

৪. তাফঈদ (التفويض) এর ক্ষমতা একবার প্রদান করলে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।[৩১৫]

খ. খুলা তালাক

---

৩১৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০।

৩১৪. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, *আল মুসান্নেফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫২৪, হাদীস নং : ১১৯৩০।

৩১৫. শায়খুল ইসলাম বুরহান ইদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল-ফাহানী আল-মারগীনানী (রহ.), *আল-হিদায়া* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭), পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আইনের ব্যাখ্যার দ্বারা খুলা তালাক বৈধতা পায়, যা ইসলামী শারী'আ আইন দ্বারাও বৈধ প্রমাণিত। কিন্তু ১৯৬১ সালের এ আইনে খুলা তালাকের ক্ষেত্রে নীতিমালা কী হবে, তার সুস্পষ্ট বিবরণ নেই; ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় মানুষ ইসলামী শারী'আ আইনে ব্যত্যয় ঘটিয়ে খুলা তালাক করে থাকে। নিম্নে শারী'আ আইনের আলোকে খুলা তালাকের বিবরণ তুলে ধরা হলো–

খুলা خلع শব্দটি আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ হলো- নিক্ষেপ করা, বের করা, দূর করা বা খুলে দেয়া, তথা দূরীভূত করা ইত্যাদি।[৩১৬]

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন, নিজ সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদান করা। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে যদি ফাটল ধরে আর উভয়ে এমন আশঙ্কা করে যে, (পারস্পরিক হক আদায়ের ক্ষেত্রে) আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তারা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর আত্মমুক্তি অর্জনে কোনো বাধা নেই। এ অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে খোলা করে দেবে।[৩১৭]

স্বামী স্ত্রী থেকে বিনিময় নিয়ে বিচ্ছেদ করার নাম হলো খুল'আ তালাক। সাধারণভাবে তালাক প্রদানের সকল ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের। তবে স্ত্রী নির্যাতিতা হলে অথবা বিবাহের পর স্বামী যদি চিররুগ্ন, পুরুষত্বহীন হয়ে যায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে, আর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয়। তাহলে স্ত্রী কর্তৃক অর্পিত তালাকের পদ্ধতি গ্রহণ করে পৃথক হতে পারবে। এমতাবস্থায় কুর'আন কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রীকে খুল'আ এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

৩১৬. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-২৮০।

৩১৭. আল-মারগীনানী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

"এ তালাক দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয় যদি আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর তোমরা যদি ভয় কর যে, তারা উভয় আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কারো কোন পাপ নেই। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। সুতরাং তা লঙ্ঘন কর না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তারাই জালিম।"[৩১৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ـ

"সাবিত ইব্ন কায়েস রা.-এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামে কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাবিত ইবনে কায়েসের চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি চাই না যে, তার সাথে ঘর সংসার করতে গিয়ে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরীর মধ্যে নিপতিত হই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : তোমার স্বামী তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তাকে তা ফিরিয়ে দিতে রাজী আছ? সে বলল : হ্যাঁ, আমি রাজী আছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাবিত ইবনে কায়েস রা.-কে বললেন : তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।"[৩১৯]

পরিশেষে বলতে পারি, ইসলামী আইনের ন্যায় প্রচলিত আইনেও খোলা তালাকের বিধান রাখা হয়েছে।

গ. আদালতের মাধ্যমে তালাক

---

৩১৮. আল কুর'আন, ২ : ২২৯।

৩১৯. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬, হাদীস নং : ৫২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত **১৯৬১** সালের ৮নং ধারানুযায়ী স্ত্রী তালাক ব্যতীত অন্য যেকোনো উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, এ ক্ষমতাবলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে আদালতে গিয়ে তালাক নিতে দেখা যায়; অথচ ইসলাম কেবল নির্দিষ্ট সমস্যার প্রেক্ষাপটে আদালতের মাধ্যমে তালাক নেয়ার অনুমতি নেয়। নিম্নে ইসলামী শারী'আ আইনের আলোকে আদালতের মাধ্যমে তালাক নেয়ার প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতি আলোচনা করা হলো–

ইসলামী শারী'আর মূলনীতি হলো, দীর্ঘদিন ধরে নিরুদ্দেশ, ইন্নীন বা নপুংসকের, মাজবুব (পুরুষাঙ্গ কর্তিত), খুনসা, ধবল রোগ কিংবা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীর তালাক অথবা যেকোনো কারণে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সালিশী পরিষদ (বর্তমান আদালত)-এর মাধ্যমে তালাক হতে পারবে।[৩২০] আদালতের মাধ্যমে তালাকের অুনমতি প্রসঙ্গে কুর'আনী ঘোষণা–

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا ـ

"যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর।"[৩২১]

সুতরাং যথাযথ কারণ ব্যতীত আদালতের মাধ্যমে তালাক নেয়ার অনুমতি থাকা ইসলামী শারী'আ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

৯. ভরণ-পোষণ

(১) কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ভরণ-পোষণ বা খোরপোষ দানে ব্যর্থ হইলে বা একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সমভাবে খোরপোষ না দিলে, স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্ত্রীগণের কেহ, অন্য কোন আইনানুগ প্রতিকার প্রার্থনা ছাড়াও চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। এইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য সালিশী পরিষদ গঠন করিবেন এবং ঐ পরিষদ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ভরণ–পোষণ বাবদ প্রদানের জন্য টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া সার্টিফিকেট জারী (ইস্যু) করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্বামী বা স্ত্রী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট ফিস প্রদানপূর্বক ঐ ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটখানা পূনর্বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মুন্সেফের নিকট

---

৩২০. এ সম্পর্কে বিস্ড়রিত জানতে দেখুন, আল-মারগীনানী (রহ.), *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-২০০।

৩২১. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন আদালতে এই সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) উপরের (১) অথবা (২) উপ-ধারা মোতাবেক দেয় কোন টাকা যথাসময়ে বা সময়মত পরিশোধ করা না হইলে তাহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা চলিবে।

৯ নং ধারার পর্যালোচনা

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৯ নং ধারা উক্ত আইনের, ১ নং উপধারায় খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ করে সালিশী পরিষদ কর্তৃক সার্টিফিকেট ইস্যু; ২ নং উপধারায় খোরপোষ প্রসঙ্গে মুন্সেফের মীমাংসা; ৩ নং উপধারায় রাজস্ব আধায়ের ন্যায় খোরপোষ অদায় করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। অথচ ইসলাম খোরপোষ নির্ধারণ ও খোরপোষ প্রদানে ব্যর্থ হলে এর সমাধান প্রভৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যা উক্ত আইনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈপরীত্য। যেমন- অসমর্থ স্বামীর খোরপোষের বিধান এবং ভূমি রাজস্বের ন্যায় আদায় ইত্যাদি। নিম্নে খোরপোষের ইসলামী বিধান আলোচনা করা হলো–

'আরবী শব্দ نفقة 'নাফাকা' এর বহুবচন হলো نفقات। এর আভিধানিক অর্থ- الزاد তথা পাথেয়। অর্থাৎ দিরহাম বা অন্য যা কিছু খরচ করা হয়। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়।[৩২২] **শরহে বেকায়া ব্যাখ্যাকার** বলেন, ما يفرض للمرأة علي زوجها من طعام وكسوة وسكني "নাফকা বলা হয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করা, যা স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর আবশ্যক।" **সাইয়্যিদ আবু জাবির** বলেন, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও ক্রীতদাস বা চাকর বাকরের অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করাকেই নাফাকা (ভরণ-পোষণ) বলে।[৩২৩] **বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলিমুজ্জামান** বলেন, ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসবাসের সংস্থানকে বুঝায়।[৩২৪] মোটকথা,

---

৩২২. মুহাম্মদ আমীন ইব্ন 'আবিদীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৬২৮।

৩২৩. সাইয়্যিদ আবু জাবির, *আল-কামুছ আল-ফিকহি* (করাচী : ইদারাতুল কুর'আন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়্যা, তাবি), পৃ. ৩৫৯।

৩২৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভরণ-পোষণ হলো, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করা তথা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

ইসলামে পরিবারে স্ত্রীর ভরণপোষণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিবারের জন্য ব্যয় এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা উত্তম সাদাকাহ তুল্য।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ -

"ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : একজন ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে সেটি যা সে তার পরিবারবর্গের জন্য খরচ করে। এরপর যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্য। এরপর যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্য।"[৩২৫]

এ হাদীসে প্রথমেই পরিবারবর্গ তথা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকেই সর্বোত্তম অর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে পরিবার ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ একটি উত্তম কাজই নয় বরং একটি উত্তম ইবাদতও বটে।

نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ)-দেয়া ওয়াজিব : স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। স্ত্রী মুসলমান হোক বা কাফির হোক। তবে শর্ত হলো, স্ত্রী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর কাছে সমর্পণ করতে হবে। আর স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থাকুক অথবা পিতার বাড়ি থাকুক স্বামীর উপর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হয়। কিন্তু বিবাহের পর যদি স্ত্রী স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও অবস্থান করে তাহলে স্বামী ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য নয়।

---

৩২৫. ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯১, হাদীস নং-১৬৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম কুদূরী (রহ.) বলেন স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আবশ্যক– স্ত্রী মুসলমান হোক কিংবা কাফির। স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামীগৃহে সমর্পণ করবে তখন স্বামীর উপর স্ত্রীর খোর-পোশ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে।

এ বিষয়ে **কুর'আনের দলীল,**

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।'[৩২৬]

হাদীসের দলীল, আর বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "তোমাদের উপর স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো সদাচারের সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা।"[৩২৭]

ইজমার দলীল, স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান করা ওয়াজিব এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের ইজমা রয়েছে। এর বিপক্ষে কেউ কোনো মত প্রদান করেননি।

কিয়াসের দলীল, ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হচ্ছে আবদ্ধ থাকার প্রাপ্য। আর যে- কোনো ব্যক্তি অন্য কারো হক আদায় করার জন্য আবদ্ধ থাকবে, তার ভরণ-পোষণ ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে। এর আসল হলো কাজি ও জাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তি। এরা মুসলমানদের সেবায় আবদ্ধ থাকার কারণে তাদের জীবিকা বায়তুলমাল হতে আদায় করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত প্রমাণগুলোতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম স্ত্রী এ বিষয়ে সমান।

যাদের জন্য نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ) ওয়াজিব

নিম্নোক্তগণকে نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ) দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। যথা–

১. নাবালেগ স্বামীর স্ত্রীকে, যদিও স্বামী সহবাসে অক্ষম ও স্ত্রী সক্ষম হয়।

২. যে স্ত্রী পিতৃগৃহে অবস্থান করে, আর স্বামী তাকে তালাক না দেয়।

৩. যে স্ত্রী মাহর আদায়ের দাবিতে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে অবস্থান করে।

৪. যে স্ত্রী সঙ্গত কারণে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে।

৫. হজের সফরে স্বামী স্ত্রীর সাথে থাকলে নিজগৃহের ন্যায় ভরণপোষণ দিতে হবে।

৬. যে স্ত্রী স্বামীগৃহে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৭. যে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালনরতা অবস্থায় আছে।

৮. এমন অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে, যে সহবাসের অযোগ্য আর স্বামীও সহবাসে অনুপযুক্ত।

---

৩২৬. আল কুর'আন, ৬৫ : ৭।

৩২৭. ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং : ১২১৮/১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯. স্বামী বিত্তশালী হলে স্ত্রীর একজন দাসীর ভরণপোষণ দেবে।

উল্লেখ্য, এ نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ) স্বামীর আর্থিক অবস্থানুযায়ী নির্ধারিত হবে।

যাদের জন্য نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ) ওয়াজিব নয় : নিম্নবর্ণিত অবস্থায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ) প্রদান ওয়াজিব নয়। যেমন–

১. যে স্ত্রী বিনা কারণে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে।

২. যে স্ত্রী হয়ে স্বামীর বাড়ি হতে বের হয়ে গেছে।

৩. এমন ছোট স্ত্রীকে, যে সহবাসের অযোগ্য।

৪. যে স্ত্রী ঋণগ্রস্ত হয়ে বন্দি অবস্থায় আছে।

৫. যে স্ত্রী মুহরিম ছাড়া অন্য কারো সাথে হজে গমন করে।

৬. যে স্ত্রী স্বামীর অসম্মতিতে পিত্রালয়ে অবস্থান করে।

৭. এমন স্ত্রী যে নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

৮. স্ত্রী অবাধ্য হলে।

৯. যে স্ত্রী জোরপূর্বক অপহৃতা হয়েছে।

نفقة 'নাফাকা' (ভরণ-পোষণ)-এর পরিমাণ

ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ার পন্থা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (রহ.) বলেন, আর এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা হবে।

ইমাম খাস্‌সাফ (রহ.)-এর অভিমত। উভয়ে যদি সচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতাপূর্ণ ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে অসচ্ছল হলে অসচ্ছলতা অনুপাতে ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রী অসচ্ছল হয় এবং স্বামী সচ্ছল, তাহলে তার খোর-পোশ হবে সচ্ছল নারীদের চেয়ে নিম্নমানের এবং অসচ্ছল নারীদের চেয়ে উঁচুমানের।

আর ইমাম কারখী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করা হবে। এটাই ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর অভিমত।

সর্বোপরি ভরণ-পোষণের মান ও পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং উভয়ের অবস্থার ভিত্তিতেই সচ্ছল মানের খাবার পোশাক ও বাসস্থান দিতে হবে। যদি উভয়েই গরিব হয় তাহলে গরিবানা মাপের খাবার পোশাক ও থাকার ঘর পাবে না। যদি উভয়েই মাঝামাঝি অবস্থার হয় তাহলে স্বামীকে মধ্যম মানের খোরপোষ দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।'[৩২৮]

খোরপোশ প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়াজিব হয়। আর সচ্ছল নারীদের জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট সে পরিমাণ দরিদ্র স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে না। সুতরাং অতিরিক্ত ধার্য করার কোনো কারণ নেই। আর উল্লিখিত আয়াতের দাবিতে আমরা বলব যে, স্বামীকে তার সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করতে বলা হবে এবং সামর্থ্যের অবশিষ্ট পরিমাণ তার দায়দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকবে। আর আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত সদাচারের সঙ্গে-এর অর্থ হলো মধ্যম পন্থা। যেমন– ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সচ্ছল ব্যক্তির উপর দুই মুদ্দ [অর্ধ সা'বা পৌনে দুই সের] এবং অসচ্ছল ব্যক্তির উপর এক মুদ্দ এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উপর দেড় মুদ্দ ধার্য হবে। কেননা, যা পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়, তা মূলত শারী'আত অনুযায়ী নির্ধারিত হয় না।

ভরণ-পোষণ প্রদানে অসমর্থ স্বামীর হুকুম : স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে অসমর্থ হয় তবে তার হুকুম কি, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে।

আহনাফের অভিমত : আহনাফের মতে, বিবাহ বিচ্ছেদ করানো যাবে না; বরং স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়া যাবে, যাতে সে স্বামীর পক্ষে কর্জ করে ব্যয় বহনের কাজ চালিয়ে যায়। এ শর্তে যে, স্বামী সচ্ছল হলে তা পরিশোধ করবে। **আহনাফের দলীল :** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) দলীলরূপে আলাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী পেশ করেন– وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "স্বামী যদি শূন্যহস্ত হয়, তাহলে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী প্রতীক্ষা করবে।"[৩২৯] তবে আহনাফের মতে, যদি বিবাহ বিচ্ছেদ করা ছাড়া উপায় না থাকে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবে।

ইমাম শাফি'ঈর অভিমত : ইমাম শাফি'ঈ র.-এর মতে, বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। কেননা, স্বামী ভরণ-পোষণ প্রদানে অক্ষম হয়েছে। তার অপর দলীল হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর হাদীস, রাসূল (সা.) বলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর ভরণপোষণ বহন কর, অন্যথা তাকে ছেড়ে দাও।" এ ছাড়া তার বাহ্যিক যুক্তি হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষে অন্যের থেকে কর্জ করা সম্ভব নয়। আর স্বামীর ভবিষ্যতে ধনী হওয়াও অনিশ্চিত।

---

৩২৮. আল কুর'আন, ৬৫ : ৭।

৩২৯. আল কুর'আন, ২ : ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা স্ত্রীর আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় ভরণপোষণ স্বামী বহন করবে। এটাই ইসলামী শারী'আতের নির্দেশ। তবে দরিদ্র হলে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর পক্ষে ঋণ করে ব্যয় বহনের কাজ চালিয়ে যাবে। এ শর্তে যে, স্বামী সচ্ছল হলে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

কাজি যদি স্ত্রীর জন্য অসচ্ছল অবস্থার খোরপোশ নির্ধারণ করে দেয়, অতঃপর স্বামী সচ্ছল হয়ে যায়, আর স্ত্রী দাবি উত্থাপন করে তাহলে কাজি সচ্ছল ব্যক্তির অনুপাতে খোরপোশ পূর্ণ করে দেবেন। কেননা, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা হিসেবে খোরপোশের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর ইতঃপূর্বে যে ফয়সালা করা হয়েছিল, তা ছিল এমন খোরপোশ নির্ধারণ, যা বর্তমানের জন্য সাব্যস্ত হয়। সুতরাং স্বামীর অবস্থা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সে আপন হক পূর্ণ করার দাবি জানাতে পারে। আর যদি কিছুকাল এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, এর মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়নি এবং এরপর স্ত্রী তা দাবি করে, তাহলে কোনো কিছু তার প্রাপ্য হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কাজি স্ত্রীর জন্য খোরপোশ নির্ধারণ করে থাকেন। কিংবা যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে খোরপোশের একটি পরিমাণের সম্পর্কে সমঝোতা করে থাকে তবে কাজি স্ত্রীকে বিগত সময়ের খোরপোশ আদায়ের নির্দেশ দেবেন। কেননা, আমাদের মতে খোরপোশ হচ্ছে সৌজন্য দান, বিনিময় নয়। যেমন ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং আদালতের ফয়সালা ব্যতীত তা ওয়াজিব হওয়া দৃঢ় হবে না। যেমন– হেবা সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছাড়া মালিকানা সাবেত করে না। আর তা হলো কাজা হাসিল হওয়া। আর সমঝোতা আদালতের ফয়সালার সমতুল্য। কেননা, স্বামীর নিজের উপর নিজের অধিকার কাজির অভিভাবকত্বের চেয়ে শক্তিশালী। মহরানার বিষয়টি ভিন্ন। [সেটা সর্বাবস্থায় অবশ্য আদায়যোগ্য]। কেননা, সেটা হচ্ছে। [সম্ভোগ-অঙ্গের] বিনিময়।

১০. দেনমোহর

নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে দেনমোহরের সমগ্র অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য (দেয়) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

১০ নং ধারার পর্যালোচনা

এ ধারায় দেনমোহর প্রদানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ্য থাকার কথা বলা হয়েছে, অথচ দেনেমোহর প্রদানের বিষয়টি ফরজ এবং স্বামী-স্ত্রীর একান্ত বিষয় তা এ আইনের ধারায় অস্পষ্ট। তাছাড়া এ আইন দ্বারা বিলম্বে দেনমোহরের টাকা প্রদানকে উৎসাহিত করে, যা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শারী'আ আইন সমর্থন করে না। নিম্নে ইসলামী শারী'আ আইন অনুসারে মোহরের বিধিমিালা উল্লেক করা হলো–

ইসলামী আইন অনুসারে মোহরানা ওয়াজিব। নিম্নে শারী'আ আইনের আলোকে মোহরানা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো–

মূল আরবী শব্দ মাহ্র, যাবে হিব্রু ভাষায় 'মোহর' এবং সিরীয়তে 'মাহ্রা' বলা হয়, এবং বাংলা শব্দার্থ হচ্ছে বিয়েতে কন্যার প্রাপ্ত অর্থ। এর অন্য অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্ব, উপহার বা চুক্তির মাধ্যমে নয়; বরং স্বেচ্ছাকৃত দান, যা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য।[৩৩০]

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে المهر-এর অর্থ করা হয়েছে 'স্ত্রীর মোহর'। বিবাহ বন্ধনের প্রেক্ষিতে স্বামী তার স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মাহর বলে। এর বহুবচন — مهورة যেমন বলা হয়, مهرت المرأة مهرا 'আমি মহিলাটিকে মাহর প্রদান করেছি।' উল্লেখ্য যে, কুর'আন হাদীস বা ফিকহগ্রন্থে 'মাহর' অর্থে আরও ৯ টি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় ১. المهر-মাহর ২. الصداق-সাদাক ৩. الصدقة-সাদাকাহ ৪. النحلة-নিহলা ৫. الفريضة-ফারীযা ৬. الاجر-আজর ৭. العلائق-আলাইক ৮. العقر-উকর ৯. الحباء-হিবা।[৩৩১] মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, صدَاق الْمَرْاَة مَا يَدْفَعهُ الزَّوْج اِلى زَوجته بِعقد الزواج "বিবাহ চুক্তি সম্পাদনের বিনিময়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যে অর্থ দেয়া হয়, তাই মাহর।"[৩৩২] মুজামুল লুগাতুল ফুকাহা প্রণেতা বলেন,

ما يجعل للمراة في عقد النكاح او بعده مما يباح شرعا من المال معجلا او مؤجلا

"বিবাহ চুক্তির ফলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ অথবা বাকিতে পরিশোধযোগ্য যে অর্থ পায়, তাই মাহর।"[৩৩৩]

ইসলামী বিশ্বকোষ ভাষ্যানুসারে, "মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের চুক্তিকালে বর কর্তৃক কন্যাকে যে অর্থ দেয়া হয়, তাহাই মাহর এবং উহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গণ্য হবে।"[৩৩৪]

---

৩৩০. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৯-২৫০।

৩৩১. আবু মুহাম্মদ মুওয়াফিক উদ্দিন আব্দুলণ্ঢাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবন কুদামা, *আল মুগণি*, (বৈর্ত : দার্ল কিতাবিল আরাবি, ১৯৭২), খ. ৬, পৃ. ৬৭৯।

৩৩২. ইবরাহীম মোস্ড়্ফা, *মুজামুল লুগাতুল আরাবীয়া কাহেরাহ*, (করাচী : দার্দ দাওয়াহ, তাবি), খ. ২, পৃ. ৮৮৯।

৩৩৩. ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী, *মুজামুল লুগাতুল ফুকাহা*, (করাচী : ১৪০৮ হিজরী), পৃ. ৪৬৬।

৩৩৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫), খ. ১৮, পৃ. ৭৫২।

Dhaka University Institutional Repository

আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন, هو المال الذي تستحقه المرأة علي زوجها بالعقد عليها او بالدخول بها حقيقة "নারীর সঙ্গে যৌন-মিলন তথা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে নারী যে অর্থ-সম্পদের অধিকারী হন তাকে মাহর বলে।"

মহরের বিধান

ইসলাম মোহরানা প্রদানের বিধান বাধ্যতামূলক করেছে এক্ষেত্রে কোন তালবাহানা করা যাবে না। প্রত্যেক বিবাহে মাহর প্রদান করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا -

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্টচিত্তে তারা মাহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।"[৩৩৫]

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ـ

"এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এটা আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাহাদের নির্ধারিত মাহ্র অর্পণ করবে। মাহ্র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩৩৬]

মাহর ত্বরান্বিত ও বিলম্বিতকরণে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হানাফী ও শাফিয়ী মাযহাবের মত হলো : "পুরো মাহর নগদ আদায় করা যেমন জায়েয,

৩৩৫. আল কুর'আন, ৪ : ৪।

৩৩৬. আল কুর'আন, ৪ : ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

পুরোটাই পরে আদায়ের জন্য রেখে দেয়াও জায়েয। আবার কিছু অংশ নগদ এবং কিছু অংশ পরবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য রেখে দেয়াও জায়েয।"

মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে : পুরো মাহর নগদ প্রদান করাই মুস্তাহাব।

১১. বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য সরকার বিধিমালা (নিয়মকানুন) প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারায় বিধিমালা প্রণয়নের সময় সরকার এইরূপ বিধান রাখিতে পারেন যে, বিধিমালার কোনটি ভঙ্গের জন্য একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে।

(৩) অত্র ধারা অনুসারে প্রণীত বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং অতঃপর তাহা এই অধ্যাদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১-ক. বিচারের স্থান : বর্তমানে প্রচলিত অন্য যেকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধের বিচার হইবে সেই আদালতে, যে আদালতের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে–

ক) অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে; অথবা

খ) অভিযোগকারী (বাদী) অথবা আসামি (বিবাদী) বসবাস করেন অথবা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছিল।

১২. ১৯২৯ সনের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের সংশোধন

১৯২৯ সনের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের–

(১) ২ ধারায়–

ক) (ক) দফায় "চৌদ্দ" শব্দটির স্থলে "ষোল" শব্দটি বসিবে;

খ) (খ) দফায় "এবং" শব্দটি বাদ যাইবে; এবং

গ) (ঘ) দফার শেষের দিকে দাঁড়ির পরিবর্তে কমা বসিবে এবং ইহার পর নিম্নলিখিত নতুন দফা (ঙ), (চ) এবং (ছ) যোগ হইবে। যথা–

(ঙ) **"মিউনিসিপ্যাল করর্পোরেশন"** বলিতে ১৯৮২ সালের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫ নং অধ্যাদেশ), অথবা ১৯৮৩ সনের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) বা ১৯৮৪ সনের খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৪ সনের ৭২ নং অধ্যাদেশ)-এর অধীনে

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে বুঝাইবে, যাহার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে;

(চ) **"পৌরসভা"** বলিতে ১৯৭৭ সনের পৌরসভা অধ্যাদেশের (১৯৭৭ সনের ২৬নং অধ্যাদেশ) অধীনে গঠিত পৌরসভাকে বুঝাইবে, যাহার এখতিয়ারে মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ হইয়াছে বা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে;

(ছ) **"ইউনিয়ন পরিষদ"** বলিতে ১৯৮৩ সনের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৫১নং অধ্যাদেশ) অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ, যাহার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

(২) ৩ ধারাটি বাদ যাইবে।

(৩) ৪ ধারায় 'একুশ' শব্দের পরিবর্তে 'আঠার' শব্দটি বসিবে।

(৪) ৯ ধারায় "অত্র আইনানুসারে" শব্দগুলোর পর "ইউনিয়ন পরিষদ; অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা না থাকিলে সরকার কর্তৃক উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ব্যতীত কোন অবস্থায় এইরূপ মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করা যাইবে না শব্দগুলো যুক্ত হইবে; এবং

(৫) ১১ ধারাটি বাদ যাইবে।

১২ নং ধারার পর্যালোচনা

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ১২ নং ধারায় ১৯২৯ সনের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের সংশোধন আনা হয়– এতে করে, আইনের ধারাটি দাঁড়ায়– "বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। আর বাল্যবিবাহে শিশু বলতে বুঝাবে যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বৎসর ও নারী হলে ১৮ বৎসরের কম। কিন্তু ইসলামী শারী'আতে বিবাহের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট বয়সসীমা বেঁধে দেয়া হয়নি।

এ সম্পর্কে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ -

"তোমরা ইয়াতীমদের (জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ) যাচাই করতে থাকো যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য হয়" (সূরা নিসা : ৬)

Dhaka University Institutional Repository

আইনের মাধ্যমে বয়সসীমা নির্ধারণ করা এবং সে বয়সের পূর্বে বিবাহ করলে তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা ইসলামী শারী‘আতের সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ যে কোন বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শারী‘আতে কোন অপরাধ নয়। অতএব নিরাপরাধ কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করা যায় না। ইসলামী শারী‘আতে অপ্রাপ্ত বয়সে ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দিতে হুকুম করা হয়নি কিংবা সে জন্য উৎসাহও দেয়া হয়নি। কিন্তু কোন পিতা বা অভিভাবক যদি সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বার্থে এ কাজ করেই ফেলেন, তাহলে এটা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমে লোকজনকে বাল্য বয়সে বিবাহ করার কুফল সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে। আইনের দণ্ডের চেয়ে সচেতনতার দণ্ড অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহসংক্রান্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ -

“হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাকে নবী (সা.) বিবাহ করেছেন আমার ছয় বছর বয়সে এমতাবস্থায় যে, আমার বয়স ছয় বছর এবং আমাকে তাঁর সংসারে নিয়েছেন আমার বয়স নয় বছর বয়সে।”[৩৩৭]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন- “উলামা কেরাম একমত যে, পিতার জন্য তাদের ছোট কন্যাদেরকে বিবাহ দেয়া বৈধ, যদিও তারা দোলনায় থাকে, তবে তাদের স্বামীদের জন্য তাদেরকে নিয়ে ঘর-সংসার করা জায়েয নেই যতক্ষণ না তারা সহবাস যোগ্য হয়।”[৩৩৮]

সুতরাং বলা যায়, নবী করীম (সা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-র এই বিবাহ থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, ইসলামে ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য কোন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি, যে কোন বয়সের ছেলেমেয়েকে যে কোন সময় বিবাহ দেয়া যেতে পারে।

বালেগ হওয়ার বয়স

ইমাম মালিক, আহমদ, শাফিঈ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আবূ হানীফা (রহ.)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী ছেলে হোক মেয়ে হোক ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে বালেগ হিসেবে ধরা হবে, এ মতের উপরই ফাতওয়া।[৩৩৯]

হাদীসের বাণী,

---

৩৩৭. ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৩৯, হাদীস নং : ১৪২২।

৩৩৮. লেখকম্লী, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্ত্মাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৩৩৯. মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর বয়স-সীমা : সমস্যা ও সমাধান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৯), পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاَجَازَهُ

"হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেশ করা হলো। তখন তার বয়স ১৪ (চৌদ্দ) বছর। তিনি তাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর খন্দকের দিন তাকে পেশ করা হলো তখন তার বয়স ১৫ (পনের) বছর। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দিলেন।"[৩৪০]

নির্দিষ্ট কোন বয়সের পূর্বে বিবাহ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। কেননা বিষয়টি অভিভাবক ও সমাজের সাধারণ অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। তবে যদি কোন পিতা বা দাদা তার মেয়ে বা নাতনিকে বালেগা হওয়ার পূর্বেই বিবাহ দেয় আর বালেগা হওয়ার পর যদি সে এ বিবাহে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তাহলে সে তা প্রত্যাখ্যাত করতে পারে।

১৩. ১৯৩৯ সনের মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সংশোধন

১৯৩৯ সনের মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের (১৯৩৯ সালের ৮নং আইন) ২ ধারায়

(ক) দফা (২)-এর পর নতুন উপ-দফা (২ক) যুক্ত হইবে;

(২ক) যেহেতু স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ব্যবস্থাবলী লঙ্ঘন করিয়া একজন অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে" এবং

(খ) দফায় **পনের** শব্দটির পরিবর্তে **ষোল** শব্দটি বসিবে।

৫.২.৫ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪[৩৪১]

মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেকরণ সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যেপ্রণীত আইন

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রয়োগ :

(১) এই আইন মুসলিম বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের উপর প্রযোজ্য হইবে, তাহারা যেখানে থাকুক না কেন।

২. সংজ্ঞাসমূহ :

এই আইনে, যদি না প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুতে বিপরীত কোন কিছু, থাকে, তাহা হইলে-

---

৩৪০. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৭, হাদীস নং : ৪০৯৭।

৩৪১. ১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' এবং 'রেজিস্ট্রার' বলিতে যথাক্রমে তেমন অফিসারদের বুঝাইবে যাহাদের ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯০৮) সনের ১৬ নং আইন) অনুসারে উক্ত পদে অভিহিত ও নিযুক্ত করা হয়;

(খ) "নির্ধারিত" অর্থ হইতেছে এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

৩. বিবাহ রেজিস্ট্রারগণ :

কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও, মুসলিম আইন অনুসারে সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

৪. নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ :

এই আইন অনুসারে বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণের উদ্দেশ্যে সরকার যেমন আবশ্যক মনে করিবেন তেমন সংখ্যক ব্যক্তিকে তেমন এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করিবেন, এবং তেমন ব্যক্তিদের নিকাহ রেজিস্ট্রার বলা হইবে:

তবে শর্ত এই যে, কোন এক এলাকার জন্য একজনের বেশি নিকাহ রেজিস্ট্রারকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

৫. নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় নাই এমন বিবাহ সম্পর্কে তাহাদের নিকট সংবাদ দিতে হইবে :

(১) নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় নাই এমন প্রতিটি বিবাহ এই আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করার জন্য তাঁহার নিকট সেই ব্যক্তি কর্তৃক সংবাদ দিতে হইবে, যিনি বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান যিনি লঙ্ঘন করিবেন তিনি তিনমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬. তালাকসমূহ রেজিস্ট্রিকরণ :

(১) একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকার মুসলিম আইন অনুসারে কার্যকরকৃত তালাক রেজিস্ট্রিকরণের জন্য তাঁহার কাছে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রি করিতে পারিবেন।

(২) তালাক রেজিস্ট্রি করার জন্য দরখাস্ত মৌখিকভাবে তেমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক করিতে হইবে, যাহারা তালাক কার্যকরী করিয়াছেন :

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত এই যে, যদি মহিলা পর্দানশীল হন, তবে তেমন দরখাস্ত তাহার নিকট হইতে যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল করিবেন।

(৩) নিকাহ রেজিস্ট্রার তালাক-ই-তাফয়িজ নামে পরিচিত ধরনের তালাক রেজিস্ট্রি করিবেন না, যদি না ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯০৮ সনের ১৬নং আইন) অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত এমন দলিল দাখিল করা হয়, যাদ্বারা স্বামী তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন বা বিবাহ রেজিস্ট্রার অন্তর্ভুক্ত দলিলের কোন সত্যায়িত প্রতিলিপি দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন করিবে যে, তেমন ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে।

(৪) যেক্ষেত্রে নিকাহ রেজিস্ট্রার কোন তালাক রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকৃতি জানান, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা অস্বীকৃতির ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল করিতে পারেন এবং তেমন আপিলে রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশই চুড়ান্ত হইবে।

৭. রেজিস্ট্রিকরণের পন্থা :

নিকাহ রেজিস্ট্রার একটি বিবাহ বা তালাক নির্ধারিত পন্থায় রেজিস্ট্রি করিবেন।

৮. রেজিস্ট্রার :

প্রত্যেক নিকাহ রেজিস্ট্রার নির্ধারিত ফরমে বিবাহ এবং তালাকের পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন; এবং তেমন প্রতিটি রেজিস্টারে প্রতিটি অন্তর্ভুক্তিই ধারাবাহিক ক্রমিকে নম্বরযুক্ত করিবেন এবং প্রত্যেক বছরের শুরুতে নূতন ক্রমিক শুরু করা হইবে।

৯. অন্তর্ভুক্তির অনুলিপি পক্ষসমূহকে দেওয়া হইবে :

যে কোন বিবাহ বা তালাকের রেজিস্ট্রিকরণ সম্পন্নের পর নিকাহ রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে রেজিস্ট্রার অন্তর্ভুক্তির সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিবেন এবং তেমন অনুলিপির জন্য কোন খরচ দাবি করা হইবে না।

১০. তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ :

(১) প্রত্যেক নিকাহ রেজিস্ট্রার তাঁহার দফতরের কর্তব্যসমূহ রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদন করিবেন।

(২) 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করিবেন।

১১. লাইসেন্স রদকরণ বা সাময়িক রদকরণ :

Dhaka University Institutional Repository

যদি সরকার মনে করেন যে, একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার তাঁহার কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে কোন অসদাচরণের দোষে দোষী বা অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন বা তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে দৈহিকভাবে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তবে লিখিত আদেশ দ্বারা তাঁহার লাইসেন্স রদ করিতে বা লাইসেন্স সাময়িকভাবে রদ করিতে পারিবেন, অবশ্য তেমন সাময়িক রদের মেয়াদ দুই বছরের বেশি হইবে না, এবং তাহা আদেশে নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ থাকিতে হইবে ঃ তবে শর্ত এই যে, তেমন কোন আদেশ প্রদান করা হইবে না, যদি না, কেন তাঁহার বিরুদ্ধে তেমন আদেশ প্রদর্শন করা হইবে না, উহার কারণ প্রদর্শনের জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হয়।

১২. রেজিস্ট্রারসমূহের হেফাজত :

প্রত্যেক রেজিস্ট্রার ৮ ধারা অনুসারে তৎকর্তৃক রক্ষিত প্রতিটি রেজিস্ট্রার দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত হেফাজতে রাখিবেন এবং যদি তিনি ইহার পূর্বে জিলা ত্যাগ করেন বা তাহার লাইসেন্স আর না থাকে, তবে নিরাপদ হেফাজতের জন্য তাহা রেজিস্ট্রারের নিকট প্রদান করিবেন।

১৩. রেজিস্ট্রারসমূহের পরিদর্শন :

নির্ধারিত ফী জমা দেওয়ার পর যে-কোন ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্ট্রারের দফতরের রক্ষিত যে-কোন রেজিস্ট্রার পরিদর্শন করিতে বা তাহাতে সন্নিবেশিত যে কোন অন্তর্ভুক্তির অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

১৪. বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা :

(১) সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি-প্রচারের মাধ্যমে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) সাধারণভাবে পূর্বোক্ত ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না করিয়া বিশেষভাবে উপরিউক্ত বিধিমালায় নিম্নরূপ বিধান করা যাইতে পারে-

(ক) ৪ নং ধারা অনুসারে যাহাদের লাইসেন্স দেওয়া হইবে, তাহাদের আবশ্যকীয় যোগ্যতাসমূহ সম্পর্কে;

(খ) বিবাহ বা তালাক রেজিস্ট্রিকরণের জন্য একজন নিকাহ রেজিস্ট্রারকে দেয় ফী সম্পর্কে;

(গ) অপর যেকোন বিষয়, যাহার জন্য বিধি প্রণয়নের আবশ্যক হইতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ১৯৬১ সনের মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ (১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ) সংশোধন : ১৯৬১ সনের মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ হইতে–

(ক) ধারা ৩ উপধারা (১) এর কমা এবং নিম্নোক্ত শব্দাবলী "এবং শুধু উপরোক্ত বিধানাবলী অনুসারেই মুসলিম বিবাহসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ সম্পন্ন হইবে" বাদ যাইবে।

(খ) ধারা ৫ বাদ যাইবে ;

(গ) ধারা ৬-এর উপধারা (১)-এ এই অধ্যাদেশ অনুসারে শব্দের পরিবর্তে "১৯৭৪ সনের মুসলিম বিবাহ এবং তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন অনুসারে" শব্দাবলী, কমা, সংখ্যা এবং ব্রাকেটসহ বসিবে (১৯৭৪.....)।

১৬. বাতিল :

১৮৮৬ সনের মুসলিম তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

১৭. বর্তমান নিকাহ রেজিস্ট্রারদের সম্পর্কে বিধান :

এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ অনুসারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারকে এই আইন অনুসারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ১৯৭৫[৩৪২]

সংক্ষিপ্ত শিরনামা : এই বিধিমালা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।

এ বিধিমালায় মোট ৩৫টি ধারা রয়েছে। এ আইনে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স বাতিল ও সাময়িক বাতিলকরণ, লাইসেন্স ফরম, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির আওতা, অফিস, তার পদত্যাগ, অফিস পরিবর্তন ও ছুটি, রেজিস্ট্রেশনের ফী, বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রিকরণের পদ্ধতি, রেজিস্ট্রি করার স্থান, নিকাহ রেজিস্ট্রারকরণ কর্তৃক রেজিস্ট্রার সংরক্ষণসংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম ইত্যাদি বিষয়াদি বর্ণিত আছে।[৩৪৩]

---

৩৪২. এস, আর, ও ১৮৫-এল/৭৬ তারিখ ২১শে জুন, ১৯৭৬ এবং এস, আর, ও , ৮৯-এল/৮২ তারিখ মার্চ ১, ১৯৮২।

৩৪৩. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩-৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিবাহ ও তালাক [নিবন্ধন] বিধিমালা, ২০০৯[৩৪৪]

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এই বিধিমালা মুসলিম বিবাহ ও তালাক [নিবন্ধন] বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

এ আইনে মোট ৪১টি ধারা রয়েছে, এ আইনে মূলত বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের নিয়মনীতি, তথা নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রার লাইসেন্স মঞ্জুরির জন্য উপদেষ্টা কমিটি, নিকাহ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি, রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব পালন, নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক আদায়যোগ্য ফি, নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ পদ্ধতি, নিকাহ ও তালাকের উপাত্ত সংগ্রহ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট অনুমোদিত রেজিস্ট্রারগণের পক্ষ থেকে বাৎসরিক রিপোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কে বিষদ বর্ণনা রয়েছে।[৩৪৫]

পর্যালোচনা

বিবাহ হলো শারী'আ আইনের আওতায় একটি সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তি মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে হতে পারে। উপরিউক্ত চুক্তিবলে একজোড়া নারী-পুরুষ আইনানুগভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এবং তাদের সন্তানগণ বৈধ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিবাহ চুক্তির ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কতগুলো অবশ্য পালনীয় সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও অধিকার সৃষ্টি হয়। যেমন স্বামীর নিট থেকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা প্রাপ্তি, খোরপোষ ও বাসস্থান প্রাপ্তি এবং যে কোন একজনের মৃত্যুতে অপরজনের ওয়ারিসি স্বত্ব প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টি হয়। আজকাল নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে স্বার্থতাড়িত হয়ে একপক্ষ অপর পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নির্দ্বিদায় অস্বীকার করে বসে। তাতে প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (স) বলেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "ক্ষতি করাও যাবে না এবং সহাও যাবে না"[৩৪৬]

এছাড়াও পারস্পরিক চুক্তির ক্ষেত্রে লিখে রাখার ব্যাপারে কুর'আনী নির্দেশনাও রয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।"[৩৪৭]

---

৩৪৪. এস.আর.ও নং ২০১-আইন/২০০৯। Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 194) এর section ১৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন, ২৬ শ্রাবণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১০ আগস্ট ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩৪৫. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭-৪২৩।

৩৪৬. ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস নং : ২৩৪০।

৩৪৭. আল কুর'আন, ২ : ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব পক্ষবৃন্দের ক্ষতিরোধকল্পে এবং পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য করার জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ চুক্তি সরকারি দপ্তরে নিবন্ধিত হওয়া একান্ত জরুরি।

এ রেজিস্ট্রেশন আইনের আলোকে রেজিস্ট্রেশন ফরমে উল্লিখিত কতিপয় শর্তের পর্যালোচনা–

১. সাক্ষীদের সংখ্যা : বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে, তথা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ২৭ (১) (ক) অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্টার বহির ১১ নং কলামের বিবাহের সাক্ষীর নাম :

"১" ও "২" উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সাক্ষী দু'জন তবে এখানে সাক্ষী ক্ষেত্রে "নারী' ও "পুরুষ" কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। তবে এখানে বহুল প্রচলিত "ইসলামী সাক্ষ্য" আইন অনুসরণেই অধিকাংশ বিবাহ সম্পন্ন হয়। সাক্ষ্য সম্পর্কিত কুর'আনের বাণী,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ -

"দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে, যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।"[৩৪৮]

২. সাক্ষীদের উপস্থিতি : বাংলাদেশের আইনে এ সম্পর্কিত বর্ণনা নেই। ইসলামী শারী'আ আইন অনুসারে আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে "ইজাব-কবুলের সময় বিবাহের বৈধতার শর্ত হিসেবে সাক্ষীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।"

৩. সাক্ষীদের যোগ্যতা : বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীকে অবশ্যই, স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক, পরিণত বয়স্ক ও মুসলমান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত আইনে এ সম্পর্কিত কোনো বিধান বর্ণিত নেই।

৪. তাফবীজের অধিকার অর্পণ : মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯-এর ফরম 'ঘ' অনুসারে রেজিস্টার বহিতে ১৮ ও ১৯ নং কলামে তালাকে তাফবীজ এর উল্লেখ রয়েছে। যাতে স্বামী অধিকাংশ সময় স্ত্রীকে তালাকে অধিকার প্রদানের বাধ্য থাকেন। কিন্তু ইসলামী শারী'আ আইন অনুসারে তালাকে তাফবীজের অধিকার দিতে স্বামী বাধ্য নয়; এতদসম্পর্কিত সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের ৮ নং ধারা পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৩৪৮. আল কুর'আন, ২ : ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৬ অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০[৩৪৯]

প্রস্তাবনা : অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য সম্পর্কিত আইন একত্রিকরণ ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য সম্পর্কিত আইন একত্রিকরণ ও সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :

উক্ত আইনের বিশেষ দিকসমূহ

এ আইনে মোট ৫৫৩টি ধারা রয়েছে।

⇨ এ আইনের প্রথম পরিচ্ছেদে ১ থেকে ৪ নং ধারা পর্যন্ত শিরোনাম পূর্ববর্তী আইনের কতিপয় ধারা বিলোপ ও বিশেষ শব্দাবলীর সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে।

⇨ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৫ থেকে ১৯ নং ধারায় অভিভাবক নিয়োগ ও ঘোষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান উল্লিখিত হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে নাবালকের অভিভাবকত্ব নিয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও সম্পত্তির অভিভাবকত্ব ও পিতা-মাতা এবং অন্যান্যদের অভিভাবকত্ব লাভের শর্তাবলি বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

⇨ তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২০ থেকে ৫১ নং ধারায় অভিভাবকের দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রতিপাল্যের জীবন, দেহ ও সম্পদের নিরাপত্তা, অভিভাবকত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এলাকা হতে প্রতিপাল্যের অপসারণ, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও অভিভাবকের দায়িত্বে অবহেলা, তার উপর মামলা, মামলার সমাধান ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে।[৩৫০]

পর্যালোচনা

শিশুর লালন-পালন ও পরিচর্যা করা শারী'আতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। কেননা শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করা বর্জন করার কারণে অনেক সময় সে মৃত্যুবরণ করে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তাকে মৃত্যু ও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার লালন-পালন ও দেখাশোনা করা শারী'আতের দৃষ্টিকোণে ফরজ। সুতরাং শিশুকে লালন-পালন

---

৩৪৯. ১৮৯০ সালের ৮নং আইন, ২১শে মার্চ ১৮৯০।

৩৫০. গাজী শামছুর রহমান, *মুসলিম আইনের ভাষ্য* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১০), পৃ. ১১৬-১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করা হলো ফরজে আইন যদি লালন-পালনকারী একাধিক না পাওয়া যায়। আর যদি লালন-পালনকারী একাধিক পাওয়া যায় তাহলে শিশুকে প্রতিপালন করা ফরজে কেফায়া।

ইসলামে অভিভাবকের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি কাউকে বিয়ে করতে হলেও অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে বিয়ে করতে হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ -

"তোমরা মেয়েদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিবাহ কর এবং প্রচলিত পন্থায় তাদের মাহরানা দাও, যেন তারা তোমাদের বিবাহের সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে যৌন চর্চায় লিপ্ত না হয়। আর গোপনে প্রেম না করে এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপতিত না হয়।"[৩৫১]

৫.২.৭ হিবা বা দান (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২)

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ এর ১২২ ধারায় দানকে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এতে বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ও কোন প্রকার প্রতিদান গ্রহণ না করে কোন অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা হলে এবং সে ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কেউ উহা গ্রহণ করলে তাকে বলা হয় 'দান'। যে ব্যক্তি অনুরূপভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করে তাকে বলা হয় দানকর্তা এবং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তাকে বলা হয় দানগ্রহীতা।"

যে কোনো ধরনের হেবা বা দান করতে হলে, তা নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন আইন ১৯০৮-এর ১৭ ধারায় এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, নাতি-নাতনি, সহোদর ভাই-ভাই, সহোদর বোন-বোন এবং সহোদর ভাই ও সহোদর বোনের মধ্যে যে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র দলীল রেজিস্ট্রি ফি দিতে হবে মাত্র ১০০ টাকা। তবে উল্লিখিত সম্পর্কের বাইরের ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পাদিত দানপত্র দলীল রেজিস্ট্রির ফি হবে কবলা দলিল রেজিস্ট্রির জন্য প্রযোজ্য ফি'র মতো।

উক্ত আইনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

---

৩৫১. আল কুর'আন, ৪ : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

১. বিভাজন করা যায় না বা সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি বিভাজন করা যায় না এমন সম্পত্তি একাধিক ব্যক্তিকে দান করা যায় না। ২. ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি একটি সম্পত্তি দান করলেন এবং শর্ত যুক্ত করে দিলেন যে, ভবিষ্যতে গ্রহীতা সম্পত্তিটি বিক্রি করতে পারবেন না বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছে ভাড়া দিতে পারবেন না এবং এমন অন্য কোনো শর্ত যুক্ত করে দিলেন। এ ক্ষেত্রে দানটি সম্পন্ন হয়েছে, তবে শর্তগুলো বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। ৩. দখল হস্তান্তর করা হয়নি, কিন্তু যদি দানকারী এই দান পরে স্বীকার করেন, তবে দানটি অকার্যকর বা অবৈধ হবে না। ৪ দখল হস্তান্তরের আগে যে কোনো সময় দান বাতিল করা যায়। ৫. বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কের ব্যক্তি বরাবর করা দান দখল হস্তান্তরের পর বাতিল করা যাবে না। দখল হস্তান্তরের পর শুধু কোর্টের ডিক্রির মাধ্যমে দান বাতিল হতে পারে। ৬. গ্রহীতার সম্মতি প্রয়োজন এমন নির্দেশনা দানের দলীলে থাকা সত্ত্বেও গ্রহীতা সম্মতি দেননি, তবে দানকারীর সম্মতিতে দানকৃত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন; দানটি বৈধ। ৭. দানকৃত সম্পত্তির দখল তাৎক্ষণিক হস্তান্তরের নিয়ম থাকলেও দানকারী দানকৃত সম্পত্তিতে তার জীবনকালে ভোগদখলের শর্ত যুক্ত করলে দান অবৈধ হবে না। ৮. নাবালকের পক্ষে তার অভিভাবকের কাছে দখল হস্তান্তরিত হলে দান সম্পন্ন হবে। নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক হচ্ছে তার বাবা। বাবার অবর্তমানে বাবা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি, তাদের অবর্তমানে দাদা বা দাদা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি। বাবা বা অভিভাবক কর্তৃক নাবালককে দান করলে দখল হস্তান্তরের প্রয়োজন নেই। দান করার ইচ্ছা এবং ঘোষণাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। ৯. মৃত্যুশয্যাকালে দান উইলের নিয়ম অনুযায়ী দাফন-কাফনের খরচ ও ঋণ বাদে বাকি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি করা যাবে না এবং কোনো উত্তরাধিকারীকে করা যাবে না। তবে দাতার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা এক-তৃতীয়াংশের বেশি বা উত্তরাধিকারী বরাবর এরূপ দানে সম্মতি দিলে তা বৈধ হবে। ১০. দান বা হেবার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে দানকৃত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করতে হয়। যার জন্ম হয়নি, তাকে যেহেতু তাৎক্ষণিক হস্তান্তর করা সম্ভব নয়, কাজেই জন্ম হয়নি এমন কাউকে হেবা করা যায় না। তবে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুসারে দান করা সম্ভব, তবে এ ধরনের শিশুর জন্ম পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে হতে হবে। ১১. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে দানে আইনগত কোনো বাধা নেই। তবে তা হবে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীনে। একজন মুসলমান ইসলামী শারী'আত মোতাবেক অন্য একজন মুসলমানকে যে দান করেন, তা হচ্ছে হেবা; এই হেবা শুধু দুজন মুসলমানের মধ্যেই হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যলোচনা

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই ইসলামে একের সম্পদে অন্যের হক রয়েছে। এখানে কেউ ইচ্ছা করলে তার নিজের সম্পত্তি বিনা প্রতিদানে কাউকে দান করতে পারে। আর এটি হতে পারে অন্যের দরিদ্রতা, অসহতা দূরীকরণের লক্ষ্যে। এ মর্মে মহান আল্লাহ কুর'আনে ঘোষণা করেন-

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে?"[৩৫২]

কাদের জন্য ব্যয় করা হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ـ

"লোকেরা কী ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন যে ধন-সম্পদই তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য (ব্যয় করবে)।"[৩৫৩]

এছাড়াও কাউকে খুশি হয়ে কোনো কিছু দান তথা যাকে আমরা পুরস্কার বলি, এমন দানও ইসলামে বৈধ। ইসলাম এমন দানকে পরস্পরের সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (ضـ)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا ـ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমারা হাদিয়া দাও, নিজের মাঝে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে।"[৩৫৪]

৯. ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩[৩৫৫]

---

৩৫২. আল কুর'আন, ২: ২১৯।

৩৫৩. আল কুর'আন, ২ : ২১৫।

৩৫৪. আবু আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ* (বৈর"ত : দার" বাশায়িরিল ইসলামী, ১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৩০৮, হাদীস নং : ৫৯৪।

৩৫৫. (২০১৩ সনের ৫ নং আইন) [২৪ ফেব্র"য়ারি, ২০১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

এ আইনে মোট ২৬টি ধারা রয়েছে। তন্মেধ্যে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি হলো–

সম্পত্তি হস্তান্তরে সাধারণ সীমাবদ্ধতা

৫। (১) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ কিংবা উক্ত ওয়াক্‌ফের স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা যাইবে; এবং অনুরূপ হস্তান্তর ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে।

(২) অধ্যাদেশ এর ধারা ২(৯) মতে ওয়াক্‌ফে আগন্তুক (stranger) এমন কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং তাহার স্বার্থে বা প্রয়োজনে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৩) ওয়াক্‌ফ কিংবা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে অনিবার্যভাবে আবশ্যক বিবেচিত না হইলে, কোনো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় বা চিরস্থায়ী ইজারামূলে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৪) এই আইনের অধীন হস্তান্তরের জন্য বিবেচ্য কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, যদি ওয়াকিফ তাহার ওয়ারিশগণ, পরিবারের সদস্যগণ বা নির্ধারিত ব্যক্তিগণের উপকারার্থে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

মোতাওয়াল্লী বা ওয়াক্‌ফ প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর

Dhaka University Institutional Repository

৭। (১) অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর অধীন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট মোতাওয়াল্লীর লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্‌ফের প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে এবং ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর অধীন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্‌ফের প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে এবং ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোতাওয়াল্লী বা ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বিশেষ কমিটির সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয়, দান বিনিময়, বন্ধক বা ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, উক্তরূপ সুপারিশ ও অনুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হইলে অনুরূপ হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিশেষ কমিটির সুপারিশ যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেই কেবল সরকার অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন ৫(পাঁচ) বছরের কম মেয়াদের জন্য ইজারামূলে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে কোনরূপ স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

দানের মাধ্যমে হস্তান্তর

১১। (১) ধারা ৫ এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অন্য কোন ওয়াক্‌ফ এস্টেট বা মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত নয়, এমন কোন ধর্মীয়, শিক্ষা বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে দান করা যাইবে।

(২) এই ধারার অধীন দান এর প্রস্তাব কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি দান এর মাধ্যমে প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকিলে উক্ত উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করা যাইবে না।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর

১২। (১) কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হস্তান্তর বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী ভূমি-মালিক ও ডেভেলপার এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত মোতাওয়াল্লী বা ক্ষেত্রমত, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ভূমি-মালিক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) একজন ভূমি-মালিক নিজ ভূমির ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া যেরূপ শর্তে ডেভেলপারের সহিত চুক্তি করেন, এই ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লী বা ক্ষেত্রমত, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক সেরূপ শর্তে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) স্বার্থ রক্ষা করিয়া ডেভেলপারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং চুক্তিতে তাহা উল্লিখিত থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তির উন্নয়ন হইতেছে কিনা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইতেছে কিনা ওয়াক্‌ফ প্রশাসক তাহা নিশ্চিত হইবেন ।

(৬) এই ধারার অধীন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অন্যান্য বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) এই ধারার অধীন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর কেবল তফসিলে বর্ণিত কোন এলাকায় অবস্থিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

এছাড়াও ওয়াক্‌ফ আইনে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের পদ্ধতি, স্বীয় উদ্যোগে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন, ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, অবৈধভাবে ওয়াকফ্‌কৃত সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার অপরাধ ও তার দণ্ড এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

পর্যালোচনা

এ আইনটি ইসলামী শারী'আ আইনের আলোকে প্রণীত, তাই এ আইন নিয়ে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না। তবে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো–

'ওয়াক্‌ফ' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-আটকিয়ে রাখা, বেঁধে রাখা, স্থগিত করা, নিবৃত্ত রাখা জনকল্যাণে দানকৃত সম্পত্তি ইত্যাদি।[৩৫৬] ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে শারী'আতের পরিভাষায়, কোন বস'কে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উৎপাদন ও উপযোগকে গরিবদের মধ্যে কিংবা যেকোনো কল্যাণকর খাতে দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলা হয়।

ওয়াক্‌ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলাম ধর্মে ওয়াক্‌ফ কেবল বৈধ রীতিই নয়, বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম এ কাজে উৎসাহ প্রদান করে। ওয়াক্‌ফ এমন একটি পুণ্যের কাজ যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াক্‌ফ হচ্ছে সমাজসেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতার মৃত্যুর পরও তার সে দান মানবতার কল্যাণে বহাল থাকে। হাদীসের বাণী,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ـ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি আমল ছাড়া তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, আমল তিনটি হচ্ছে– সাদাকায়ে জারিয়া, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।"[৩৫৭]

৫.৩ শারী'আ আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য যাচাই

৩৫৬. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৭।

৩৫৭. ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস নং : ১৬৩১/১৪।

Dhaka University Institutional Repository

শারী'আ আইন বাস্তবায়নের পক্ষে একটি বড় প্রমাণ হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আইন বিশেষজ্ঞদের রায়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের অভিমত উল্লেখ করা হলো :

১. আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য

বিংশ শতাব্দিতে ইউরোপ ও আমেরিকার আইনজ্ঞদের নেতৃত্ব দানকারী প্রখ্যাত ফরাসী আইনজ্ঞ প্রফেসর লামবীর ১৯৩২ ইং সনে লাহাই শহরে আন্তর্জাতিক আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইসলামী শারী'আতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "আমি আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে ইসলামী শারী'আতের দিকেই প্রত্যাগমন করছি। ইসলামী শারী'আতে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা সুন্দরভাবে সাজানো হলে এমন সব থিউরি ও ধারা পাওয়া যাবে যা উন্নতি, ব্যাপ্তি ও বিবর্তনের পাশাপাশি চলতে পাশ্চাত্যের আধুনিক আইনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ থিউরির চেয়ে কিছুতেই কম হবে না।"[৩৫৮]

মিসরের আইন কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর ড. আলী বাদাবী 'আইন ও অর্থনীতি' নামক সাময়িকীর প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় ইউরোপীয় আইনের প্রথম উৎস রোমান আইনও ইসলামী আইনের মধ্যে তুলনা করার পর বলেন, "অনুরূপভাবে ফৌজাদারি আইনের ক্ষেত্রে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফিকহ ইসলামীর ফৌজাদারি দণ্ডবিধি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরং এ আইন অন্যান্য পুরাতন ও আধুনিক অনেক আইনের ওপর নানান দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।"[৩৫৯]

ড. শফিক শাহহাতা তার 'আন্ নাযরিয়াতুল আম্মা লিল ইলতিযামাত ফিশশারী'আহ' নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২০১ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "আইন ব্যবস্থার মূলের দিক দিয়ে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী শারী'আত মূলনীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রোমান আইনের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। যেমন তার একটি মূলনীতি হলো, 'ঐকমত্য হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা পরিবর্তন হওয়া', দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, 'ইচ্ছার ক্ষমতা' সংক্রান্ত আর তৃতীয় মূলনীতি হলো, 'চুক্তিগত প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত।'[৩৬০]

উল্লেখ্য যে, ড. শফিক শাহ হাতা একজন মিসরীয় খ্রিষ্টান আইনবিদ।

সিরিয়ার প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও আইনজ্ঞ প্রফেসর ফারেস আল খাওরী (যিনি প্রথমত খ্রিষ্টান পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছেন) বলেন, "এটাই আমার ঈমান, আমি ইসলামে বিশ্বাসী,

---

৩৫৮. আলণ্ঢামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্ড়বায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২ ও ১১৩।

৩৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৩৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বিশ্বাস করি ইসলাম আরব সমাজের অবস্থা সুশৃঙ্খল করতে পারবে। আরো বিশ্বাস করি যে, বিদেশ থেকে আগত নানান থিউরি ও মতবাদ বিশ্বাসীদের শক্তি যাই থাকুক না কেন ইসলাম তাদের সকলের মোকাবিলা করার শক্তি রাখে। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি কমিউনিজম ও সোসালিজমের সঠিক মোকাবিলা করা একমাত্র ইসলাম দ্বারাই সম্ভব। একমাত্র ইসলামই এসব মতবাদ নিশ্চিহ্ন ও খতম করে দিতে পারে।[৩৬১]

২. ইসলামী শারী'আর বিষয়ে পাশ্চাত্যের ন্যায়পরায়ণ চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মুল্যায়ন

পাশ্চাত্যের ন্যায়পরায়ণ ও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ শারী'আ আইনের বাস্তবতাকে অকপটে স্বীকার করেছেন। নিম্নে কয়েকজন পণ্ডিতের অভিমত উল্লেখ করা হলো :

ক. ড. আয়েযকো ইনসাবাতু বলেন,

ইসলামী শারী'আ অনেক দিক দিয়ে ইউরোপীয় আইনের ওপর প্রাধান্য রাখে বরং ইসলামী শারী'আত বিশ্বকে দিতে পারে সর্বাধিক শক্তিশালী আইন ব্যবস্থা।[৩৬২]

খ. ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন 'প্রফেসর শিবরল' ১৯২৭ ইং সনে এক আইন সম্মেলনে বলেন, "মানবজাতি মুহাম্মাদ (স.) কে নিয়ে গর্ব করতে পারে, কারণ তিনি অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও চৌদ্দশ বছর পূর্বে এমন এক আইন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে আমরা ইউরোপবাসীরা দুই হাজার বছর পরও যদি তার শীর্ষে পৌঁছতে পারি তাহলে অতি সৌভাগ্যবান হতে পারতাম।"[৩৬৩]

গ. হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ড. হোকেঞ্জ তার "আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাৎপর্য" নামক গ্রন্থে বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের উন্নতির পথ সেক্যুলার ব্যবস্থা গ্রহণে নয়, যা বলে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন, আইন ও রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে ধর্মের কিছুই বলার নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে তাদের দ্বীনের মধ্য হতেই উন্নতি, অগ্রগতির উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, কখনো কখনো কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, ইসলামী ব্যবস্থা কি আধুনিক যুগের চাহিদানুযায়ী নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা জন্ম দিতে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধিবিধান জারি করতে সক্ষম?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা বিদ্যমান। ক্রমোন্নতি লাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলতে হয়, ইসলামী

---

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৩৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৩৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা তার অনুরূপ অন্যান্য অনেক ব্যবস্থা হতে অনেক উত্তম। ইসলামী শারী'আতে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের উপায় উপকরণ না থাকার কারণেই সমস্যা সৃষ্টি হয়নি; বরং তা সৃষ্টি হয়েছে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ইচ্ছা না থাকার ফলে।[৩৬৪]

ঘ. প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিশ্ব সাহিত্যের যাদুকর 'বার্নাড শো' বলেন, আমি সব সময় দ্বীন ইসলামকে অত্যন্ত সম্মান করি, কারণ এতে উজ্জীবনী শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যা আমার মতে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে এবং সর্ব যুগে মানবজাতির কল্যাণ করে যেতে পারে।[৩৬৫]

ঙ. ইংরেজ ঐতিহাসিক 'ওয়েলজ' তার 'মানব ইতিহাসের ধারা নামক গ্রন্থে বলেন, ইউরোপ তার প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক আইনের জন্যে ইসলামের কাছে অনেক ঋণী।[৩৬৬]

৩. আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনের সাক্ষ্য

শারী'আ আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও বাস্তবায়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ। নিম্নে কয়েকটি সম্মেলনের উল্লেখ করা হলো :

লাহাই শহরে ১৩৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৭ ইং সনে তুলনামূলক আইনের ওপর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন প্রখ্যাত আলিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্মেলনে তারা দু'টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার একটি হলো 'ইসলামী শারী'আতের 'ফৌজদারি ও দেওয়ানি দায়িত্ব' অপরটি হলো ফিকহে ইসলামীর পূর্ণ স্বকীয়তা ইসলামী শারী'আতের সাথে রোমান আইনের কাল্পনিক সম্পর্ক নিরসন। উক্ত সম্মেলনে পাশ্চাত্যের আইজীবীদের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাতে বলা হয় :

ক. ইসলামী শারী'আতকে সাধারণ আইনের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

খ. ইসলামী শারী'আত জীবন্ত ও ক্রমোন্নতিযোগ্য।

গ. ইসলামী শারী'আত স্বাধীনভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছে, অন্য কোন আইন থেকে গৃহীত হয়নি।[৩৬৭]

উক্ত লাহাই শহরে ১৯৪৮ সালে ৫৩টি দেশের অংশগ্রহণে এক আন্তর্জাতিক আইনজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তুলনামূলক আইন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির

---

৩৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৩৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।

৩৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৩৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব এবং ইসলামী শারী'আত সম্বন্ধে পূর্বোক্ত তুলনামূলক আইন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ইসলামী শারী'আতের গতিময়তা এবং তার গুরুত্ব ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক আইনজীবী সমিতির কর্তব্য হলো ইসলামী শারী'আতের তুলনামূলক আলোচনা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা এবং তা অধ্যয়নের জন্য লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করা।[৩৬৮]

১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক আইন সংঘের 'প্রাচ্য আইন বিভাগ' ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ইসলামী ফিকাহ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। তাতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় :

"ইসলামী ফিকহের বুনিয়াদী নীতিমালার আইন ও শারী'আগত যথেষ্ট মূল্য রয়েছে, এ বিষয়ে কোন রকমের সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

এর বিরাট আইন ভাণ্ডারে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতদ্বন্দ্বের ফলে অনেক মূল্যবান জ্ঞান ও মতামত এবং আইনগত মূলনীতি পাওয়া গেছে যা আশ্চর্য হবার মতো। এর দ্বারা ইসলামী ফিকহ আধুনিক জীবনের যাবতীয় চাহিদা পূরণে এবং জীবনের সমগ্র প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।"[৩৬৯]

বিশ্বজুড়ে শারী'আ আইন সম্পর্কে দিনে দিনে জনমত বৃদ্ধি হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ব্রিটেনের প্রচলিত বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি সীমিত আকারে শারী'আ আইন ও শারী'আ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। শারী'আ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধান বিচারপতি Lord Phillips বলেন, "Sharia law should be used in Britain." ২০০৮ সালে ইস্ট লন্ডন মসজিদে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ব্রিটেনে মুসলিম কাউন্সিলের সদস্য জনাব Inayat Bunglawala বলেন, We support these triburals. If the Jewish courts are allowed to flourish, so must the sharia ones.[৩৭০]

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব ও শারী'আ আইন

---

৩৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৩৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৩৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্যের মদদপুষ্ট মুসলিম নামধারী শাসকরা পাশ্চত্যের ধ্যান-ধারণায় শাসন করেছে আরব জাহানকে। তারা পাশ্চাত্যের আইন, কৃষ্টি-কালচার ও অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছিল আরব জনগণের উপর। শারী'আ আইনের পরিবর্তে শাসক গোষ্ঠি চালু করেছিল পাশ্চাত্যের আইনে। ইসলামী জনতা কোন দিনই তাদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। বিন্দু বিন্দু ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে এক সময় রূপ নেয় মহা সিন্ধুতে। জনগণের বিক্ষোভে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সে বিক্ষোভে দেশ ছেড়ে পালালেন তিউনেশিয়ার বেন আলী। ক্ষমতাচ্যুত হলেন মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক, লিবিয়ার গাদ্দাফী। তিউনেশিয়ায় আন নাহডা পার্টি সে দেশে শারী'আ আইন চালু করেছে। মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড সরকার গণভোটে শারী'আ আইনের পক্ষে রায় দেয় সে দেশের জনগণ। যদিও বর্তমানে ব্রাদারহুড সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। ইরাকের জনগণ শারী'আ আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে গণভোট রায় দিয়েছে। লিবিয়ার বর্তমান সরকার শারী'আ আইনে দেশ চালানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। সিরিয়ায় আসাদ বিরোধী যুদ্ধরত ফ্রটগুলো শারী'আ আইনে দেশ চালানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আবরবিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণজাগরণের অন্যতম কারণ ছিল শারী'আ আইন চালুর দাবি।

সম্প্রতি নাইজেরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে জনগণের চাহিদার আলোকে শারী'আ আইন জারি হয়। এবং ঐ সকল প্রদেশে শারী'আ আইনের আলোকে সমকল বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্ল্যেখযোগ্য প্রদেশগুলো হলো– Kano, Zamfara, Sokoto ও Niger.[৩৭১] সম্প্রতি ব্রুনাইয়ের সুলতান সে দেশে ইসলামী শারী'আ আইন জারি করেন। সে দেশের জনগণ এ আইনকে সর্বসম্মতিতে গ্রহণ করে।[৩৭২]

৫. বিশ্বব্যাপী শারী'আ আইনের পুণর্জাগরণ

বিশ্বব্যাপী শারী'আ আইন দিন দিন আবারো জনপ্রিয় উঠেছে। প্রচলিত বিচারব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ন্যায় বিচারকে বাধাগ্রস্ত করেছে। উদাহরণ সরূপ সমকামী আইন, ব্যাভিচারের সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিবাহ তালাক আইন, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের স্বীকৃতিমূলক আইন এসব আইনের অসারতা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তাই আইনের প্রকৃত স্বাধীনতা সাম্য ন্যায়-নীতি, ইনসাফ পূর্ণ সুখী, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে শারী'আ আইনের প্রতি

---

৩৭১. মুহাম্মদ নূর-উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২২।

৩৭২. দৈনিক সংগ্রাম, ১ মে ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঝুঁকছে মুসলিম বিশ্বের জনগণ। বর্তমানে শারী'আ আইনের অধিকাংশ ধারা কার্যকর রয়েছে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, সুদান, মিশর, বাহরাইন, ইয়ামেনসহ মধ্যপ্রাচ্যের ও আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে। আফগানিস্তানের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে শারী'আ আইনের প্রতি রায় নিয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, লিবিয়া, মরোক্ক, ওমান ইন্দোনেশিয়া, তুরষ্ক, ব্রনাই, জর্ডান, নাইজার, আলজেরিয়া, কেনিয়া, কাতার, জিবুতি, চেচনিয়া, সিরিয়া ও মৌরতানিয়াসহ আফ্রিকাও আরো এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে আংশিক শারী'আ আইন চালু রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ শারী'আ আইনের প্রতি ঝুঁকছে এসব দেশের জনগণ।

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের আবার উত্থান ঘটছে। এ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ও বিস্তৃতি কেবল ত্রুটিবিচ্যুতি বা অনিয়ম চিহ্নিত করার মধ্যে সীমিত নয়; এর ভূমিকা আরো গভীরে। যেমন সউদী আরবের কথা বলা যায়। সউদী আরব দাবি করে, প্রাচীন ইসলামী সংবিধানই তারা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করছে। অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহের সরকারগুলো ক্রমবর্ধমান হার বিপ্লবের মাধ্যমে নিজেদেরকে ইসলামী বলে ঘোষণা করছে; যেমন ইরানের কথা বলা যায়। আবার ইরাক ও আফগানিস্তানের কথা বলা যায়, যারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে গণভোটের মাধ্যমে রায় নিয়েছে। এসব দেশে সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে গত শতকের সেক্যুলার ব্যবস্থার পরিবর্তে কোনো না কোনোভাবে শরী'আভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র মুসলিম দেশগুলোর জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশই বছে শারী'আ তাদের নিজ নিজ দেশের আইনের অন্যতম উৎস হওয়া উচিত। আবার গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যাবহুল দেশ, যেমন, মিসর ও পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশ বলছে তাদের দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন একমাত্র উৎস হওয়া উচিত। মুসলিম দেশগুলোর যেখানেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানেই জনগণের একটি বৃহৎ অংশ শারী'আভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোট দিচ্ছে, যাদেরকে ইসলামপন্থী হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। এসব দলের কর্মসূচি এক দেশ থেকে আরেক দেশে খুব বেশি ভিন্ন নয়। তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও মৌলিক অধিকারগুলোকে গ্রহণ করে। তারা অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্গীকার

Dhaka University Institutional Repository

করে; তারা দুর্নীতি নির্মূল করার কথা বলে। সবচেয়ে বড় কথা, তারা শারী'আকে আইনের অন্যতম অথবা একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলে।[৩৭৩]

সম্প্রতি Centre for Social Cohesion এর জরিপে দেখা গেছে, ব্রিট্রেনের ৪০% মুসলিম ছাত্র ব্রিটেনে ইসলামী শারী'আ আইন চায় এবং ৩৩% ছাত্র সারাবিশ্বে ইসলামী শারী'আহ পরিচালিত সরকারব্যবস্থা চায়।[৩৭৪]

সম্প্রতি ভারতের মুসলিম নারীরা তাদের সমস্যা সমাধান ও পবিত্র কুর'আনের নির্দেশিত অধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং সামাজিকভাবে তাদের অধিকার সংরক্ষণে শারী'আ আইন পাসের জন্য ভারত সরকারকে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের (বি এম এম এ) প্রেসিডেন্ট নাইশ হাসান হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পবিত্র কুর'আনে নারীদের অসংখ্য অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেশের আইনে তার প্রতিফলন অথবা বাস্তবায়ন নেই। (দৈনিক সংগ্রাম, ২০১৪)

৬. ব্রিটেনে শারী'আ আইন

ব্রিটেন ইউরোপের অগ্রসরতম রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। ব্রিটেন সরকার কয়েকটি বিষয় শারী'আ আইনে বিচার করার জন্য বিচারকদের ক্ষমতা প্রদান করেছে। ইতোমধ্যেই ব্রিটেনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে শারী'আহ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

Forced Marriages

Domestic Violence

Family Disputes

Force Marriage (Civil Protection Act, 2007)

Notes to the Forced Marriage (Civil protcetidyl Act, 2007)

Commercial and Dept Disputes

Ilnheritance Disputes

Mosque Disputes. [৩৭৫]

---

৩৭৩. নোয়াহ ফেল্ডম্যান, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৪), ১৮-১৯।

৩৭৪. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, *দেশে দেশে ইসলামী আইন* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০০৯), পৃ. ১২২।

৩৭৫. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ব্রিটেনে শারী'আ আইনের অগ্রগতি

আরবিট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৯৬ অনুযায়ী মুসিলম আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল (ম্যাট) বৈধতা পেয়েছে যুক্তরাজ্যে। বর্তমান ব্রিটেনের লন্ডন, বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড, ইডেনবার্গ, ম্যানচেস্টার ও ওয়ার ইউকশায়ারে মোট ৮৫ টি শারী'আহ কাউন্সিল রয়েছে। দিন দিন শারী'আহ কাউন্সিলের সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. ব্রিটেনে শারী'আহ আদালতের প্রতি অমুসলিমদের আগ্রহ

বর্তমানে UK-তে অমুসলিম নাগরিকরা শারী'আহ আইনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। শুধু ধর্ম সম্পর্কিত মামলাই নয় বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সাধারণ মামলার নিষ্পত্তিতে ও মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমরা শারী'আ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। ম্যাটস জানায় তারা যে সব মামলা পারিচালন করেছেন তার পাঁচ ভাগে হলো অমুসলিমদের।[৩৭৬]
এভাবে বিশ্বব্যাপী শারী'আ আইনের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

৩৭৬. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, শারী'আ আইন মানব জাতির জন্য উৎকৃষ্ট একটি আইন ব্যবস্থা। প্রায় চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে সে বিষয়টি প্রমাণীত হয়েছে। মানব জীবনের আইনগত বিষয়গুলোর সমাধান শারী'আ আইনে বিদ্যমান। ন্যায় বিচার, সাম্য, মানবতাবোধ, মূল্যবোধ, মানবাধিকারের মত বিষয়গুলো শারী'আ আইনের মূলনীতি। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি জবাবদিহিতা, অবিচল আস্থা, পরকালীন জীবনে বিচারের সম্মুখীন হওয়া, আমল তথা কর্মের জবাবদিহিতা, জাহান্নামের অবধারিত শাস্তির ভয় বিচারককে ন্যায় বিচারের প্রতি বাধ্য করার ফলে শারী'আ আইনে জনকল্যাণ পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে। শারী'আ আইনের উৎস, এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব, বর্তমান বিশ্বে শারী'আ আইনের গ্রহণযোগ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত এ আইনকে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে বিবেচিত করেছে। এ আইনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, নতুন সৃষ্ট সমস্যায়' শারী'আর ইজতিহাদি সমাধান শারী'আ আইনকে আইনের উৎকৃষ্ট মানদণ্ডে উপনীত করেছে। আধুনিক আইনের মোকাবিলায় শারী'আ আইনের কার্যকারিতা অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুদৃঢ়, যা এ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আল্লাহ প্রদত্ত আইন। সঙ্গত কারণে এ আইন যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত ও অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয়তঃ এর দ্বিতীয় প্রধান উৎস সুন্নাহ যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, তার যাবতীয় কর্ম ও তার যাবতীয় সমর্থন। কিন্তু এ উৎসও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত ও পরিচালিত। আল কুরআনে এসেছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى -

"আর তিনি নিজের প্রবৃত্তির ছলে কোন কথা বলেন না; বরং উহা হলো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪)

ইসলামী শারী'আর অন্য প্রধান দুইটি উৎস ইজমা ও কিয়াস কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর মানব বিবেকলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে রচিত আইন। অন্য উৎসগুলোও মানব বিবেকলব্ধ কিন্তু সেগুলোর ভিত্তিও কুর'আন ও সুন্নাহ।

Dhaka University Institutional Repository

মাকাসিদে শারী'আহ তথা শারী'আ আইনের মূল্য লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ। এ আইন মানব জাতির কল্যাণের একমাত্র গ্যারান্টি হতে পারে। পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞ অনেক আইনবিশারদ, বিচারপতি ও দার্শনিকগণ শারী'আ আইনের গ্রহণযোগ্যতাকে এক ও অকাট্য বাক্যে মেনে নিয়েছেন। এ অভিসন্দর্ভটির মধ্যে সে সব প্রমাণ যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শারী'আ আইনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তা মূলতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব, মিডিয়ার মাত্রাতিরিক্ত অন্যায় বাড়াবাড়ি ও প্রোপাগান্ডা। এ সব সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হলে শারী'আ আইন সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা দূর করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শারী'আহ আইনের অল্প কিংবা ব্যাপক ধারা চালু রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশী পৃথক শারী'আ আইনে বিচার ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্র না হয়েও যদি বাংলাদেশে সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার পাশাপাশি পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমাব্যবস্থা চালু থাকতে পারে; সে ক্ষেত্রে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি পৃথক শারী'আ আইন চালু থাকতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। জনগণ সাধারণ কোর্ট কিংবা শারী'আ কোর্ট যে কোনো কোর্টে বিচার প্রার্থী হতে পারে।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বর্তমানে শারী'আ আইনের ধারা শুধু মাত্র দেওয়ানি ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়, যা সংশোধিত ও সীমিত আকারে কার্যকর রয়েছে। এতে ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসরণ করা হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে জারিকৃত বিভিন্ন অধ্যাদেশ ও ধারা বর্তমানে স্বাধীনতা পরবর্তীতে ও কার্যকর রয়েছে। এসব অধ্যাদেশ ও ধারাকে ব্যক্তিগত শরিয়ত আইন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হলোও তা মূলতঃ শরিয়তি আইন নয়। এ অভিসন্দর্ভটিতে সে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলাম। বিশ্বাসগত বা আকিদাগত কারণে তারা শারী'আ আইনের মুখাপেক্ষী। শারী'আ আইনের গুরুত্ব বুঝাতে আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ :

Dhaka University Institutional Repository

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির।"

(আল কুরআন, ৫ : ৪৪)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা জালিম (অত্যাচারী)।"

(আল কুরআন, ৫ : ৪৫)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা ফাসিক (পাপাচারী)।"

(আল কুরআন, ৫ : ৪৭)

এই আয়াতগুলো নৈতিকভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ প্রদত্ত আইন তথা শারী'আহ আইন মানার প্রতি বাধ্য করেছে। তাই মুসলমানগণ ধর্মীয়, বিশ্বাসগত, বৈষয়িক ও পারলৌকিক বিষয়ে শারী'আ আইনের প্রতি মুখাপেক্ষী। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে শারী'আ আইনকে আইন হিসেবে মেনে নিতে কোনো নৈতিক বাধা নেই। যা এ অভিসন্দর্ভতে প্রমাণ করা হয়েছে। পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবী।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুর'আন

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, *তাফসীরে ইবনে আব্বাস* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫)।

৩. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর, *তাফসীরে কুরআনুল আযীম* (বৈরুত : দারু তাইয়্যেবাহ লিল নসর, ১৪২০ হি.), খ. ২।

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.)।

৫. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, *আল মুসান্নেফ* (বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি) ।

৬. আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মূসা বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা* (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি)।

৭. আবুল কাসেম
হুসাইন বিন মুহাম্মদ মা'রুফ বির রাগেব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুর'আন,* (দামেশক : দারুল কালাম, ১৪১২ হি.) ।

৮. আবু নাঈম মোঃ মফিদুল ইসলাম, *মানব রচিত আইন বনাম ইসলামী শরীয়াত* (ঢাকা : ইফাবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০২), পৃ. ২৯-৩০।

৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন* (বৈরূত : দারু ইহয়িয়ায়িত্ তুরাছ আল-আরবী, তাবি)।

১০. আলী ইবন আহমদ আল-জুরজানী, *আত-তা'আরিফাত* (ইস্তাম্বুল : মাতবা'আহ আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি.)।

১১. আবু ইসহাক
ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-মুআফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ* (মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, তাবি)।

১২. আহমদ মোল্লাজিউন, *নুরুল আনওয়ার* (দিল্লী : রশিদীয়া কুতুবখানা, তাবি)।

১৩. আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮)।

১৪. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল* (আল কাহিরা, তা.বি)।

১৫. আলী ইব্ন আহমদ ইবন হাযম, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম* (কায়রো : দারুল হাদীস, ১৪০৪হি)।

১৬. আবূ বকর আহমদ আল খাতীব আল বাগদাদী, *আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* (রিয়াদ : মাতাবিউল কাসীম, তাবি)।

১৭. আবু মুহাম্মদ মুওয়াফিক উদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ
বিন মুহাম্মদ ইবন কুদামা, *আল মুগণি*, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৯৭২)।

১৮. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি)।

১৯. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামী শারীয়া কি? কেন? কিভাবে?* (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১০)।

২০. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন*, অনু. ড মাহফুজুর রহমান (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২)।

২১. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০০৫)।

২২. আলহাজ বদিউল আলম, *ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা : 'প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫)।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *আস সহীহ* (দামেশক : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.)।

২৪. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত : দারু বাশায়িরিল ইসলামী, ১৪০৯ হি.)।

২৫. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী, *আস সহিহ* (বৈরুত : দারে এহইয়া আত তুরাস আল আরাবী, তাবি)।

২৬. ইমাম মালেক বিন মালেক বিন আনাস বিন আমের মাদানী, *আল মুয়াত্তা* (বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, তাবি)।

২৭. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫ হি.)।

২৮. ইমাম আবু দাউদ
সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.)।

২৯. ইমাম আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, (হিন্দ : দারে সালাফিয়্যা, ১৪২৩ হি.)।

৩০. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল আইয়ান* (আল-কাহেরা : ১৮৮১)।

৩১. ইমাম আলাউদ্দিন আবূবকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারাঈ* (কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৩৭৮ হি)।

৩২. ইবন বাদরান হাম্বালী, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ* (মিসর : আল-মাতবাআতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৯২৭)।

৩৩. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন* (আল কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০১)।

৩৪. ইবন ইসফুর আল-ইশবিলী, *আল-মুমাত্তা ফীত তাসরীফ* (বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদ, ১৯৭৮ ইং)।

৩৫. ইউসুফ আল কারযাভী, *শরী'আতুল ইসলাম খুলুদুহা ওয়া ছালাহুহা লিততাতবিক ফি কুল্লি যামান ওয়া মাকান* (বৈরূত : আল মাকাতাবুল ইসলাম, তাবি)।

৩৬. ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল গাযালী, *আল মুসতাসফা ফী উসূলিল ফিক্হ* (বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি)।

৩৭. ইমাম আবু বকর আহমদ ইব্ন আলী আল জাসসাস, *আল ফুসুল ফিল উসূল* (লাহোর : মাকতাবায়ে ইলমিয়া, তাবি)।

৩৮. ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদুবী, *কাশফুল আসরার আলা উসূল আল-বযদুবী* (দিল্লী : তাবি)।

৩৯. ইবরাহীম মোস্তফা, *মুজামুল লুগাতুল আরাবীয়া কাহেরাহ*, (করাচী : দারুদ দাওয়াহ, তাবি)।

৪০. ইমাম বায়হাকী, *সুনানুল সুগরা* (বৈরুত : মাকতাবা ইসলামী, ১৪০৫ হি), খ. ১, পৃ. ৮৪, হাদীস নং : ১১১।

৪১. ইমাম আহমদ, *আল মুসনাদ* (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪২১ হি), খ. ৬, পৃ. ৮৪, হাদীস নং : ৩৬০০।

৪২. এম মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ২০১২)।

৪৩. এম পি জৈন, *আউটলাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টরী* (নিউ দিল্লী : মানোহার পাবলিশার্স, ১৯৯৩)।

৪৪. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০), পৃ. ১৩৯-১৪০।

৪৫. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭), খ. ২।

৪৬. গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

৪৭. গাজী শামছুর রহমান, *মুসলিম আইনের ভাষ্য* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১০)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. জামালউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৯ ইং)।

৪৯. ড. জামাল উদ্দীন আতীয়া, *ইসলামী শরীয়ত ও বিচার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগাল এইড সেন্টার, ২০১২)।

৫০. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : দারুল হিকমা বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ৪৮৪।

৫১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯)।

৫২. ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, *আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ : আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, ১৪১৫ হি.)।

৫৩. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ* (আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ ইং)।

৫৪. ড. গালিব আলী আদ-দাওআদী, *আল-মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন*, (আম্মান : দারু ওয়াঈল লিত্ তিবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ২০০৪ ইং)।

৫৫. ড. আহমাদ সান্বাতী, *তরজুমাতুল মা'আনিল কুর'আনিয়্যাহ* (কাতার : মাতাবি'আদ দা'ওয়াতুল হাদীছাহ, তাবি)।

৫৬. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুর'আন* (মিশর : দারুর ইলম, ২০০০)।

৫৭. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩ ইং) ।

৫৮. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ*, (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, তাবি)।

৫৯. ড. ওয়াহাব আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক : দারুল ফিকর, তাবি)।

৬০. ড. আনাওয়ার শুআইব আবদুস সালাম, *শার'উ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া নাআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া* তাতবীকাতুহু (কুয়েত : প্রকাশনা কমিটি, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ ইং)।

৬১. ড. মোহাম্মদ আবূ যোহরা, *উসূল আল-ফিকহ আল-সামী* (বাগদাদ : আল-আনী প্রেস, ১৪০৬ হিজরী)।

৬৪. ড. আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দাওয়াহ* (মিসর : দার উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৭৫)।

৬৫. ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী, *মুজামুল লুগাতুল ফুকাহা*, (করসী : ১৪০৮ হিজরী)।

৬৬. ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি* (ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮)।

৬৭. ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম, *ইসলামী শরীয়তের তাৎপর্য ও উৎস* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫)।

৬৮. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুঁইয়া (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪)।

৬৯. ড. মো. মাসুদ আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, বর্ষ ৬, সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০)।

৭০. ড. মুসতাফা হুসনী আস্-সুবায়ী, *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, অনু. এ,এম,এম সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

৭১. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, *মাযহাব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (সেলাংগর, মালেশিয়া : সিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪)।

৭২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা*, (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার গবেষণামূলক পবিত্রা, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩)।

৭৩. ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রি. ২০০৭ ।

৭৪. ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *বহু বিবাহ ও বর্তমান সমাজ*, (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, বর্ষ : ২, সংখ্যা : ৫)।

৭৫. তকী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাইমিয়াহ, *বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল* (রিয়াদ : মাকতাবাতু লীনা লিননাশরি ওয়াত তাওযী, তাবি)।

৭৬. তারিক রামাদান, *মুসলিমের ইউরোপ* (ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০৮)।

৭৭. নোয়াহ ফেল্ডম্যান *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান*, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৪)

৭৮. প্রফেসর ড. মুহা. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী শারী'আতে ইজতিহাদের স্বরূপ* (কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক কল এণ্ড রিসার্চ, ২০০৭)।

৭৯. ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আর-রাযী, *আল-মাহসূলু ফী উসুলিল ফিকহ* (বৈরূত : মুআসসাসাতুল রিসালাহ, ১৯৯২)।

৮০. ফিলিফ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯)।

৮১. বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী* (বৈরুত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৬)।

৮২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬)।

৮৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), *তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (সৌদি আরব : তাবি)।

৮৪. মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত* (বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া তুরাসিল আরাবী, ২০০৩) ।

৮৫. মান্না বিন খলীল আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী* (দামেশক : মাকতাবাতু ওহবিয়্যাহ, ১৪২২ হি.)।

৮৬. মাহমুদ শালতুত, *আত-তাফসীর আল ওয়াদেহ্* (মিশর : মাতবা'আতুল ইন্তিকলাল আল-কুবরা, তাবি)।

৮৭. মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুর'আন* (মিশর : মাকতাবাতুল মাআরেফ, ১৪২১ হি)।

৮৮. মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ফাতওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), খ. ১, ২য় ভাগ।

৮৯. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন সাম্ভলী, *পারিবারিক সংকট নিরোসনে ইসলাম* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫)।

৯০. মুহাম্মাদ রশীদ রেদা, *তাফসীরুল মানার* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তাবি)।

৯১. মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন রাযী, *আত-তাফসীর আল কাবীর* (তেহরান : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি)।

৯২. মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন* (হালব : মাতবাআতু ইশা আলবালী, তাবি)।

৯৩. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল লি তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল* (রিয়াদ : দারুল ফাদীলাহ, তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিক্‌হ* (দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো, তাবি)।

৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূবকর ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন* (কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৬৮)।

৯৬. মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *আল-রিসালা* (হালব : মুস্তফা আল-হালাবী প্রেস, ১৩৫৮ হিজরী)।

৯৭. মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন 'আবিদীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি.)।

৯৮. মুহাম্মদ রহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩)।

৯৯. মুহাম্মদ সিদ্দিক, *নাস্তিকের যুক্তি খন্ডন*, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০২)।

১০০. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪)।

১০১. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, *দেশে দেশে ইসলামী আইন* (ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০০৯)।

১০২. মোহাম্মদ বিন আল-হাছান আল-হাজবী, *আল-ফিকাহ আল-সামী* (আল-রিয়াদ : মাকতাবা আল-রিয়াদ, ১৩৯৮ হিজরী)।

১০৩. মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০)।

১০৪. মোঃ মফিজ উদ্দিন, *ইসলামী আইন তত্ত্বের ইজতিহাদ, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১)।

১০৫. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি*, (ঢাকা : হলি প্রকাশনী, ১৯৯৬)।

১০৬. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* (ঢাকা : আমিন ল' বুক সেন্টার, ২০১০)।

১০৭. মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর বয়স-সীমা : সমস্যা ও সমাধান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৯)।

১০৮. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা : ইফাবা, ২০১১), খ. ১।

১০৯. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা : ইফাবা, ২০১২), খ. ৩।

১১০. লেখকমণ্ডলী, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব* (ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৭)।

১১১. শামসুদ্দীন মাহমুদ ইবন আবদুর রমান ইবন আহমদ আল-ইস্পাহানী, *বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখতাসারি ইবনুল হাজিব*, (মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি)।

১১২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, *উকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ* (কায়রো : আল মাতবাআতুস সালাফিয়া, ১৩৫৮ হি.)।

১১৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, *আল-মুসাফফা*, (দিল্লী : আল-মুসাওয়া, তাবি)।

১১৪. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ আস সারাখসী, *উসূল আল সারাখসী*, (হায়দারাবাদ, তাবি)।

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, (অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১)।

১১৬. শায়খুল ইসলাম বুরহান ইদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল-ফাহানী আল-মারগীনানী (রহ.), *আল-হিদায়া* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭), ।

১১৭. সাইফুদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদী, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম*, (রিয়াদ : দারুল মামীয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযী, ২০০৩)।

১১৮. সাইয়্যিদ আবু জাবির, *আল-কামুছ আল-ফিকহি* (করাচী : ইদারাতুল কুর'আন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়্যা, তাবি)।

১১৯. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), খ. ২।

১২০. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), খ. ১।

১২১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫), খ. ১৮।

১২২. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩), খ. ৫।

১২৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.)।

১২৪. সংকলকমণ্ডলী, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫) খ. ১, পৃ. ৪৫৯।

১২৫. স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফেড গিল্‌ম, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, অনু. নুরুল ইসলাম পাটোআরী (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭)।

১২৬. হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ১৯৯৫)।

১২৭. Mouluvi Nur Ahmed, captain k. M. A. Rab. *Islam and is holy pronhet as fudged by the non Muslim world*, (Dhaka : Islami foundation, 1994).

১২৮. Sir George Rankin, *Background of Indian Law* (Cambridge: University Press, 1946).

Dhaka University Institutional Repository